# সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

## প্রথম খণ্ড

( প্রথম ভাগ )

দুর্গাকিঙ্কর

প্রথম প্রকাশ :

১লা আষাঢ়, ১৩৬৭, ১৩৭৭

প্রকাশক :

শ্রীমতী উমারাণী মিত্র

১১০/সি, আমহার্স্ট স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ

পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স

৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

বাঁধাই :

ইনকোর বাইণ্ডার্স

৪৮সি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান :

ফারমা, কে, এল, মুখোপাধ্যায়

৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,

কলিকাতা-১২

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মহেশ লাইব্রেরী

২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

শ্রীগুরুচরণে

প্রণত:

—দুর্গাকিঙ্কর

*To be had of* :

FIRMA K. L MUKHOPADHYAY
6/1A, Bancharam Akrur Lane
Calcutta-12

DAS GUPTA & COMPANY Pv. Ltd.
54/3, College Street
Calcutta-12

MAHES LIBRARY
2/1, Shyama Charan Dey Street
Calcutta-12

PUBLISHER
110/1C, Amherst Street
Calcutta-9

SABHYATA O DHARMER KRAMABIKASH
BY Durgakinkar

# গ্রন্থকারের নিবেদন

সভ্যতার সঙ্গে ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ। মানবসভ্যতার মূলে ভাষা এবং ভাষা ও ধর্ম্ম পরস্পর একই সঙ্গে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়।

প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর পক্ষেই ভাষা হচ্ছে তার সভ্যতার মূল। ভারতীয় ভাষা এই বিষয়ে আরো একটু অগ্রসর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভারতীয় সভ্যতা তথা ভাষার মূলে রয়েছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অর্থ যেখানে মানব জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের জীবন যাপনের সঙ্গে একার্থবাচক হয়, সেখানে ধর্ম্ম ও সভ্যতার দিগ্‌নির্ণয় করতে হলে সমগ্র মানবজীবনটিকে তথা মানব সমাজকে সামগ্রিকভাবে যাচাই করা দরকার হয়। বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার চরম পর্যায়ে গিয়ে ভারতীয় বৈদিক ঋষিগণ আবিষ্কার করেছেন মানুষের সামগ্রিক সমাজজীবনের ধারা এবং বিশ্বজগতের মূলসূত্র—শব্দব্রহ্মতত্ত্ব।

ভারতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম শব্দতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শব্দতত্ত্ব ইহজীবনে ভাষা এবং চিরন্তন জীবনে সর্ব্বোচ্চ সত্যলাভের পথ নির্দেশ করে। এইজন্য ভারতীয় সভ্যতা নির্ণয়ে ধর্ম্মকেও যাচাই করা উচিত।

মানব জীবন শুধু বর্ত্তমান নিয়েই নয়। মানবের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত কর্ম্মধারা ও তার ফলশ্রুতির উপর তার অস্তিত্ব এবং ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের ক্রমবিকাশের বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে ধর্ম্ম, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, ও সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের সীমার মধ্যে যা দেখা যায়, তাতে এই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্ম্মের সঙ্গে ইতিহাসের, সমাজতত্ত্বের বা নৃতত্ত্বের প্রধান বিষয়গুলির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। আবার প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের ও ইতিহাসের সাক্ষ্যগুলিও নানাপ্রকার পরস্পর বিরোধী অনুমান এবং গোঁজামিলে জড়িয়ে আছে এবং তা নিয়ে বাগ-বিতণ্ডা চলছে যথেষ্ট। এর ফলে সত্য নিরূপণের উপায় নেই। তেমনি আবার নীতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং ধর্ম্মের মধ্যে অসংখ্য প্রকার বিরোধ দেখা যায়।

ইহার কারণ—বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক এবং সংকীর্ণ চিন্তাধারার অনুসরণ।

চিন্তার রাজ্যে এই বিশৃঙ্খলার জন্য বর্তমানের শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ আরও লক্ষ্যহারা হয়ে বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন করে চলেছে এবং মানব সভ্যতাকে করছে বিড়ম্বিত।

মানব সভ্যতার পক্ষে এই মানসিক বিশৃঙ্খলার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই চেষ্টায় সাফল্যলাভ না করলে মানব সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটময় পর্য্যায়ের অবসান হবার আশা নেই।

জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলি আমাদের সামগ্রিক জীবনদর্শনেরই অঙ্গ। জীবনের পথে প্রতি পদক্ষেপে এই সমস্ত বিভাগের বিরোধ মানুষের মনকে অস্থির এবং বিপথগামী করে তোলে।

সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করতে হলে মানব সভ্যতার প্রথম ধাপ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মানবের জীবনদর্শনের খাতার পাতাগুলিকে সঠিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মানব সভ্যতা এবং ধর্মের ক্রমবিকাশ-এর বর্ণনায় এই বিশ্লেষণেরই প্রচেষ্টা।

আলোচ্য এই বিষয়টি সমুদ্রের মত অতল। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে এই কাজ অসাধ্য। এই ব্যাপারে আমি আমার পূর্ব্বগামী সুধীজনের পথ নির্দেশও তেমন পাইনি। এই প্রচেষ্টায় অনেক বাধা বিঘ্ন রয়েছে, তবুও সাধু সঙ্কল্পের ক্ষুদ্র আরম্ভও ভবিষ্যতে বৃহৎ কল্যাণ বরণ করে—এই ভরসায় এই দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি।

আমার আশা, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বৃহত্তর কল্যাণ সাগরের মধ্যে অন্ততঃ একবিন্দু বারি প্রক্ষেপের মত সার্থকতা খুঁজে পাবে।

আমি প্রায় বিশ বছরের অধিক কাল থেকে এই সমস্ত চিন্তা, গবেষণা ও আলোচনায় নিযুক্ত আছি। বিভিন্ন পত্রিকাদিতে এই প্রসঙ্গে আমার প্রবন্ধ নানা সময়ে বার হয়েছে। বিশেষ ক'রে, গত ১৯৫০ সাল থেকে হিমাদ্রি পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে এই বিষয় সংক্রান্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যে কিছুদিন আমি এই কাজে বিরত ছিলাম, কিন্তু আমাকে যাঁরা বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাঁদের মধ্যে হিমাদ্রির সুবিজ্ঞ সম্পাদক এবং বহু প্রশংসিত উপাদেয় গ্রন্থমালা "ভারতের সাধক"-এর লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাশয় অন্যতম—তাঁর নির্দ্দেশ এবং নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, আবার প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ "অধ্যাত্ম-সাধনার ক্রমবিকাশ" নামে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্ত্তমানে তাঁরই নির্দ্দেশ এবং বন্ধুবর্গের বিশেষ আগ্রহের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ করা হয়েছে। ইহার বিষয়বস্তু বিরাট। তবুও যতটা সংক্ষেপ করা সম্ভব, তা করে, এই গ্রন্থটিকে তিনখণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থা থেকে ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিকাশের আলোচনায় সিন্ধুসভ্যতার নাগরিক স্তরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়টি সুবৃহৎ, এক খণ্ডে অনেক বড় হয়ে যায় বলে দুই ভাগে প্রকাশিত করা হচ্ছে। বর্ত্তমানে প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ প্রকাশিত করা হ'ল।

এতে তিনটি অধ্যায়ে গ্রাম্য সভ্যতার ধর্ম্মের বিকাশ থেকে পারসিক সভ্যতার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সময়ের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্বন্ধে এই তিন অধ্যায়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির দোষ ও ক্রটি সংশোধন করার জন্য নানাপ্রকার প্রমাণ ও যুক্তি দেখানো হয়েছে। উপক্রমণিকায় ও প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের মানুষের অজ্ঞতা, বিমুখতা ও বিতৃষ্ণার খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের মতের এবং পণ্ডিত মোক্ষমূলের সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ও ধর্ম্মের বিকাশের সঙ্গে মন্ত্রবাদের সম্বন্ধ যে অচ্ছেদ্য তা দেখান হয়েছে।

পণ্ডিত মোক্ষমূলের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের কাছে পাশ্চাত্ত্যের ঋণ অস্বীকার করেছেন—ঐ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য সিন্ধুসভ্যতা থেকে আরম্ভ করে পারস্য সভ্যতার শেষ পর্য্যন্ত অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মনীষিদের মতামত আলোচনা আমরা করেছি। অবশ্য এর পরবর্ত্তী প্রত্যেক প্রসঙ্গেই এই ভ্রান্তমত খণ্ডনের যুক্তি পাওয়া যাবে। পারসিক সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক নূতন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পারসিক সংস্কৃতি এবং ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি একই সিন্ধু তথা প্রাগ্বৈদিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। পারসিক সংস্কৃতিটি আদিবৈদিক সংস্কৃতি। এই আদি সংস্কৃতির পরবর্ত্তী বৈদিক সংস্কৃতিটিই ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি। প্রধানতঃ যজ্ঞপ্রকরণ ও মন্ত্রের বিশুদ্ধতায়

পরিশেষে সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই রকম বৃহৎ প্রচেষ্টার পক্ষে আমার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি খুবই অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে যে অনেক ভুলভ্রান্তি অনিবার্য্য হয়ে পড়ছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সহৃদয় বিদ্বজ্জনের কাছে এজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি এবং ভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে আমাকে জানিয়ে ভবিষ্যতে উহা সংশোধিত করার অবকাশ দিলে, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। একটি ক্ষুদ্র শুদ্ধিপত্র এই সঙ্গে সংযোজিত করা হল। নিবেদন ইতি।

বিনীত—

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

৩১১ ; বেথশানের মহাকাল মন্দির ৩১২-৩১৩ ; হিকশোসেরা আর্য্য ৩১৩-৩১৪ ; উরারুতু বা আর্মেনিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতি ৩১৪ ৩১৬ ; ইলাম, হিকশোস, হিট্টাইট, মিটান্নী, কাসসাইট, হুরাইট একই সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা ৩১৬-৩২০ ; মিটান্নী সংস্কৃতি ৩২০-৩২২ ; কাসসাইট ৩২৩-৩২৫ ; আর্য্য জাতির রাজনীতি গণতান্ত্রিক ৩২৫-৩২৬ ; হুরিয়ান সংস্কৃতি ৩২৬-৩২৯ ; ট্রকভেলের হুররী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ৩২৯-৩৩০ ; পারসিক ভাষা ও লিপি ৩৩০-৩৩৩ ; সিন্ধু লিপির বিবর্ত্তন ৩৩৩-৩৩৬ ; সিন্ধু ভাষার বিবর্ত্তন ৩৩৬ ৩৩৭ ; সিন্ধু ভাষার মৌলিক রূপ ৩৩৭-৩৩৮ ; স্বর ভেদের সূত্রে জাতিনির্ণয় করা যায় না ৩৩৮-৩৩৯ , ডাঃ ডিরিঞ্জারের অযাচিত উপদেশ ৩৩৯-৩৪৬ ; পারস্যেই ব্রাহ্মীলিপির বিস্তার হয় ৩৪৬-৩৪৯ ; খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী ৩৪৯-৩৫১ ; বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সন্তান ৩২১ ; লৌহ ও অশ্ব সিন্ধুযুগের পরবর্ত্তী ৩৫১-৩৫২ ; হিট্টাইটাদি বৈদিক আর্য্য ৩৫২-৩৫৩ ; হিট্টাইটাদি বৈদিক আর্য্য ৩৫২-৩৫৩ ; বৈদিক ভাষা ও লিপি, সিন্ধুর ক্রমবিকাশ ৩৫৩-৩৫৪, ফিনিসিয়গণ বেদের সমসাময়িক ৩৫৪, যজ্ঞসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রমাণ ৩৫৪ ; ধর্ম্মসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রমাণ ৩৫৪ ; সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের প্রমাণ ৩৫৫ ; মহাদেবের সংস্কৃতির ধারা ৩৫৬-৩৫৭ ; ননা বা নানী মাই এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতা ৩৫৭-৩৬০ ; আদিপিতা ও আদিমাতা গ্রাম্য-স্তরের দেবতা ৩৬০-৩৬১ ; গ্রাম্য সভ্যতায় বিনাঅগ্নিতে বলিদান ৩৬১ ; মাতৃতন্ত্র ৩৬১-৩৬৮ ।

# গ্রন্থপঞ্জী


অতীন্দ্রনাথ বসু—Cross Roads to Science and Religion.

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—T. A. A. Mysticism.

Fraser—Worship of Nature, Dying God.

Encyclopedia of Science.

Encyclopedia of Religion and Ethics.

S. C. Ray—Man in India Vol. 15.

D. N. Mazumder—Races and Culture.

Maxmuller—Vedanta Philosopy 1st Part., Chapter one, chieps from a German Workshop, Max, Vol. 3

Pratyagatmananda Saraswati—Japasutram 1st Part.

Woodroffe.—Garland of letters.

Pattison—Hibbert Lectures, Studies in phil & Religion.

Apros Morris—Heckel's Contribution to Religion.

Radhakrishnan—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ।

Scoffield—Religious Back ground of the Bible.

Sachindranath Chattopadhyaya—প্রাচীন মিশর, ইরাণের ইতিকথা, প্রাচীন ইরাক।

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ "শিব"।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতবর্ষ ১, ২, ৩, ৪ খণ্ড।

Sudhangsukumar Ray—Prehistoric India and Ancient Egypt.

D. A, Mackenzie—Egyptian Myths and Legends, Myths of of Babylonia and Assyria.

M. A. Muri—The Splendour that was Egypt.

Swami Sankarananda—Hindu states of Sumeria.

Col·Todd—Rajasthan Vol. II

তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি—প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য।

ঋগ্বেদ, মহাভারত, মনুসংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ব বেদ ইত্যাদি।

S. B. Ray Chowdhury—Ethnic settlements in Ancient India.

Leonard King—History of Sumer & Akkad.

Heinz Mode—Harappa Culture and the West.

কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী—প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো।

Bhupendradath Dutta—Studics in the Social polity, Dialectics of Hindu Ritualism.

Radha Kumud Mukherjee—Hindu Civilisation, 1st Part.

Grierson—Linguistic Survey of India. Vol 4, Vol Home of literary Pali, Bhandarkar Commemoration Vol.

Krishna Menon—J· A. S. B. 190.

Richards—Some Dravid Affinities.

Kanak Savai—Tamils 1800 years Ago.

Bombay Gazettere—

Ep—India Vol. 1.

Malabar Gazetteer—

H. C. Rai Chowdhury—Study in Ind. Antequities.

Prjulisky—Pre Dravadian or Proto-Dravidian I. H. Vol. 4.

Bhandarkar—Early Hist. of Deccan.

Pravakar Chatterjee—হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বশিষ্ঠ—ধনুর্ব্বেদ সংহিতা।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য।

জয়শোয়াল—India as known to Panini.

উপেন্দ্রনাথ দাস—ভারতীয় শক্তি সাধনা।

হরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য—Language and Scripts in Ancient India.

Winternitz—History of Sanskrit Language Vol. II.
History of Ind. Literature.

Nagendranath Basu—J. A. S. B. 1896.
ক্ষিতিমোহন সেন—জাতিভেদ।
Wilson H. H. Descriptive Account of Afganistan.
যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি—বৈদিক সৃষ্টির কাল নির্ণয়।
পঞ্চানন মিত্র—J. O. L. Cal. University.
Replay—Races of Europe.
Hutton—Caste in India.
Briffault—Mothers Vol. I
মুরারিমোহন সেন—ভাষার ইতিহাস ১ ম খণ্ড।
Ottly. R. L. Religion of Isriel.
রজনীকান্ত গুহ—সক্রেটিস ১ম খণ্ড।
আয়েঙ্গার—এজ অব মন্ত্রস্, ভাণ্ডারকার ভলিউম পার্ট ২।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—যজ্ঞকথা।
গায়ত্রী রহস্য—বামদেব চট্টোপাধ্যায়।
সন্তোষকুমার দাস—Educational System of the Hindus.
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ১ম খণ্ড।
Sarwan Gazetteer—
Lasbela Gazetteer—
অবধূত—মরুতীর্থে হিংলাজ
প্রবোধচন্দ্র বাগচি—ভারত ও মধ্য এসিয়া।
অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়—অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী।
রমাপ্রসাদ চন্দ—মূর্ত্তি ও মন্দির।
Encyclo Americana, Language.
Diringer David, Alphabet.
Sibi District Gazetteer.
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—All Ind. Oriental. Conf. Pres. Address.
Bolan Pass Gazetteer,
Prehistoric Culture of India
—Jones Com Vol—K. P. Chattopadhyaya.

# সংশোধন

মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য কয়েকটি ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্যভাবে গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশ করেছে, সতর্ক পাঠকবৃন্দ ইহা সহজেই বুঝতে পারবেন, কিন্তু যেগুলি সরলভাবে পড়ার সময় দুর্বোধ্য হয়েছে, সেগুলিই এইখানে উল্লেখ করা হল। ভ্রমবশতঃ ৭১ পৃষ্ঠার পরিবর্তে ৮১ পৃষ্ঠা থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

| পৃষ্ঠা ও পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ | পৃষ্ঠা ও পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১।১২ | মক্ষমূলর | মোক্ষমূলর | ১৭৬।৩ | বরেন্দ্র | হরেন্দ্র |
| ২।২৫ | পূর্ব্ব | পশ্চিম | ১৭৮।১৬ | বরেন্দ্র | হরেন্দ্র |
| ৩।২৯ | Woodrof | Woodroffe | ১৮৫।৪ | Sometrine | Sametime |
| ১৩।২২ | ইন্দ্র | × | ১৮৫।২৫ | Ohina | China |
| ১৩।২৩ | × | ইন্দ্র | ১৮৬।২৩ | Entorprise | Entire price |
| ২৩।২১ | হিন্দু | সিন্ধুর | ১৯০।৮ | খেরালী | খেয়ালী |
| ৩১।১২ | যোগসকুই | বিহিস্তান | ১৯০।২৫ | ইহারাই | ইহারই |
| ৩২।১২ | গণ | পণ | ১৯৩।২৩ | ফিনিসিয় | স্থানীয় |
| ৩২।২০ | ষ্ট্রীপলিশ | ট্রিপলিশ | ১৯৭।১ | বরেন্দ্র | হরেন্দ্র |
| ৩৩।১৪ | ইল | হল | ১৯০।২ | ধব্যান | ধ্বনি |
| ৪২।৮ | যহীন্দ্রনাথ | যতীন্দ্রমোহন | ১৯০।১৫ | Liquiid | Liquid |
| ৫৭।১১ | বিরোধী | বিরোধী আর | ১৯৮।৪ | Dety<br>Saere | Deity<br>Sacra |
| ৬৫।১ | সর্ব্বশ্বরবাদ | সর্ব্বেশ্বরবাদ | ১৯৮।ফুট | Reason | Religion |
| ৮৯।৪ | যায় | যার | ২০১।২১ | পারকি | পারসিক |
| ৯২।৮ | কবিলোনীয়া | ব্যাবিলোনীয়া | ২০৫।১৭ | সাহায্য | সাহিত্য |
| ৯৬।৬ | ইউফেতীয় | ইউফ্রেতীয় | ২০৫।১৮ | জান্ত্রিক | মান্ত্রিক |
| ১০০।৬ | পরে | আগে | ২১৫।২০ | অত্যাবশ্যক | অনুমেয় |
| ১০১।৪ | গ্রীকজাতি | গ্রীক প্রভৃতি | ২১৫।১১ | নিশ্চয়ই | সম্ভবতঃ |
| ১০১।২৪ | প্রকৃতির | সংস্কৃতির | ২১৬।৮ | তবে | তবে মন্ত্রের |
| ১২৭।২ | মুনজ | মুনডা | ২৩০।১০ | ব্যাকরণে | ব্রাহ্মণে |
| ১২৭।১৬ | দাক্ষিণাত্য | দাক্ষিণাত্যে | ২৪৪।১৫ | স্থষ্টির | স্বরের |
| ১৪৩।২ | প্রয়োজনীয় | প্রয়োজনীয়তা | ২৬৪।১০ | Lax | Lexico |
| ১৪৬।১<br>১৪৬।২ | অন্ন্যাধ্যান | অগ্ন্যাধান | ২৯৩।১৫ | পূর্ব্ব | মধ্য |
| ১৪৭।২০ | তৈত্তরীয় | তৈত্তিরীয় | ২৯৩।২২ | থেকে | এবং |
| ১৪৯।১৮ | বরেন্দ্র | হরেন্দ্র | ৩০২।১৫ | বাক্যবাণী | রাজধানী |
| ১৪৯ | ফুটনোট বরেন্দ্র | হরেন্দ্র | ৩১৬।২৩ | ইনাম | ইলাম |
| ১৫১।৬ | বেবতা | দেবতা | ৩৫৯।১১ | সুমার | সুসার |
| ১৬৫ | ফুটনোটHisory | History | ৩৫৯।১১ | আর্টেসিস | আর্টেমিস |
| ১৬৭।২ | এই বিষয়ে | এবং বাহিরে | | | |

ওঁম্

# সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

## উপক্রমণিকা

সভ্যতার মূলে ভাষা। ভাষার মূলে চেতনাযুক্ত শব্দ। চেতনাযুক্ত সূক্ষ্ম শব্দই মন্ত্র। মন্ত্রই ধর্ম্মের মূল কাঠামো।

চেতনাযুক্ত শব্দ বা স্বরই জীবের মধ্যে সুর ও ভাষারূপে প্রকাশিত। চেতনাযুক্ত শব্দই সূক্ষ্মশব্দ। ইহা বোধ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া-রূপে ত্রিগুণ আশ্রয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রকাশের কারণ। সুতরাং চেতনা সংযুক্ত সূক্ষ্ম শব্দই বিশ্বের সার বা মূল। ইহাই বেদের "বাক্"।

এই বাক্ সূক্ষ্মতমরূপে চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাকারণ, আর স্থূলরূপে ইহা ছন্দোবদ্ধ সুর ও ভাষা। বাকই মন্ত্র। বাকের স্থূল জগৎরূপী বিকাশের ধারার মধ্যে মানবের ধর্ম্ম ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ অনুসরণ করলে "যাঁকে পেলে আর কিছু পাওয়া বাকী থাকে না" —তাহা লাভ হয়।

বেদ মন্ত্রশাস্ত্র। এইজন্য বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়; কারণ ইহা বাকের জাগতিক প্রকাশ। মন্ত্রকে আধুনিক পণ্ডিতেরা যাদু ও কুহকের পর্য্যায়ে ফেলেছেন। ইহার কারণ, অনেক তথ্য যাহা পূর্ব্বে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক মনে করা হোত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উহা প্রকৃতির চেতনাহীন নিয়ম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানবাদ জড়বাদের জন্ম দিয়েছে।

বর্ত্তমানে এই চিন্তাধারার মোড় ফিরেছে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যার কর্ণধারগণ এখন মনে করেন যে জ্ঞানই সৃষ্টির মূলে এবং জড়বস্তু জ্ঞান থেকেই জন্ম গ্রহণ করেছে। বাহ্যজগতের ঘটনাকে তারা "ধারণার" সমশ্রেণী বলে মনে করেন এবং যেমন জড় রিলেটিভিটি মতবাদ কতকগুলি ঘটনাতে পরিণত করা যায়, তেমনি এখন জ্ঞানকে সকল ঘটনার সার বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এইভাবে এডিংটন

মনে করেন বিশ্বের উপকরণ মন; কিন্তু এই মন সাধারণ ব্যক্তিগত মনের চেয়ে বিস্তৃততর যদিও ইহার প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের পক্ষে অপরিচিত। মনের উপকরণ "স্থান ও কালে" বিস্তৃত নয়। ইহা এক প্রকার আবৃত্তিশীল প্রতিষ্ঠানের অংশ।" T. A. A. Mysticism, R. K. Mukherjee, p. 314 and 315.

অতীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,—"Matter is known through its qualities like shape, size, colour; heat, hardness, solidity, sound, smell and taste." These are at bottom nothing, but electric motions or energy acting on our nerves with a particular concious effect. Upon these nervious experiences or qualities the idea of matter grows.

So there is no substance in matter. It is only mobile energy. ** But Heisenburg, Schrodinger, and Eddington see free will and indeterminacy at the basis of matter." —Cross Roads of Science and Philosophy, p. 29 and 30.

মন্ত্রবাদ যে যাদু ও কুহকের নামান্তর—এ সিদ্ধান্ত যাঁরা করেছেন, তাদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিকগণ অগ্রণী। এ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তাঁরা স্বীকার করেন যে যাদুমন্ত্র থেকেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন যে ধর্ম্ম বা ঈশ্বর উড়িয়ে দিলেও প্রকৃতি যে সাধারণ ভাবে দৈব শক্তির আকর, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক মন উহা ত্যাগ করতে পারে নাই।

ফ্রেজার বলেন, "যাদু মন্ত্র থেকে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্ম্মের মধ্যে যে চিন্তাধারা আছে, তাহা উচ্চতর শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে—ইহা একাধিপতি রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার নিকট বাধ্যতা স্বীকারের অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গণতান্ত্রিক শাসন থেকে একাধিপত্য অবস্থার উৎপত্তি যেমন হয়, ঠিক সেই সঙ্গে এ একই সমাজে যাদু মন্ত্রের অবস্থা থেকে ধর্ম্মের অবস্থায় পরিবর্তন এসে পড়ে।" ১

আত্মার বিশ্বাস থেকেই হয় মন্ত্রবিশ্বাসের উৎপত্তি। ব্যাপক আত্মার ধারণা থেকে কিভাবে দেবতার কল্পনা এল, সে সম্বন্ধে ফ্রেজারের আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করছি, "আদিম মানুষ প্রকৃতির

১ গোল্ডেন বাউ; টোটেমিজম্ এ্যাণ্ড একসোগেমি; ফ্রেজার পৃঃ ১৮।

ক্রিয়াকে এবং মানব জীবনের কার্য্যকে বহু দেবতা বা ভূতপ্রেতের কার্য্য বলে মনে করে। উহারা আকাশে, বাতাসে, সাগরে, কান্তারে, ঝরণাতে, নদীতে বাস করে; ইহাদের কার্য্য বহুবিধ —যাহা বস্তুতান্ত্রিক দর্শনে, ব্যক্তিত্বহীন শক্তির কর্তৃত্ব বলে উল্লেখ করা হয়। এই অসংখ্য আত্মা ও দেবতাসকলকে সাধারণে চালু করে নেওয়া হয় এবং ক্ষুদ্রতর সংখ্যাতে নামিয়ে আনা হয়। এইভাবে এনিমিজম থেকে বহুদেববাদের বিকাশ হয়ে থাকে। এইভাবে কালক্রমে বহু দেবতার স্থানে একদেববাদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্তু তান্ত্রিকতাও আধ্যাত্মিকতা উভয় মতবাদেরই বোধশক্তির অতীত জগতের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য।" [১]

ফ্রেজার অন্যত্র বলেছেন, "তারপর কালক্রমে মানুষ বহুদেববাদ ত্যাগ করে, উহা যে প্রকৃতির শক্তি এই কথা বলে উহার ব্যাখ্যা দেয়। ঐ শক্তিকে কতকগুলি গুণবাচক অর্থে ব্যবহার করে, যথা আকাশ, অনুপরমাণু প্রভৃতি—যদিও তারা দেবতার ধারণাকে প্রকৃতির শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেয়, তবুও তারা প্রকৃতি যে সাধারণ ভাবে এই শক্তির আকর এই ধারণাটিকে ত্যাগ করতে পারে নাই"। [২]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স বলেন, "ধর্ম্ম প্রথমে ভৌতিক আত্মার ধারণা থেকে আরম্ভ হয় এবং শেষে ঈশ্বরে যেয়ে শেষ হয়। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল অথবা বলা যায় যে ভৌতিক আত্মাই ঈশ্বর প্রস্তুতের আদিম কাঠামো। ভৌতিক আত্মাগুলিতে বিশ্বাসের মূলে রয়েছে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত আত্মাগুলির মৃত্যুর পরে, তাদের ক্রমাগত অস্তিত্ব থাকার বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য আত্মার অস্তিত্বও থাকে—যে সকল আত্মা উঁচুদরের শক্তিশালী দেবতার শ্রেণীভুক্ত। আত্মার ধারণা থাকলে, অন্যান্য

১ ওয়ারশিপ অব নেচার; ফ্রেজার; পৃ ১৬।

২ ডাইং গড; ফ্রেজার পৃ ২০।

বিশ্বাসগুলি যুক্তির পর্য্যায়ক্রমে এসে যায়। আত্মা, দৈত্য, দেবতা বা অন্যান্য আত্মা সংক্রান্ত জীবের সম্বন্ধে ধারণা প্রকৃত পক্ষে একই রকম ধারণা সম্ভূত, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে আত্মার বিশ্বাসটী কেন্দ্রস্থলে থাকে।"[১]

এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস্ বলেন, "দর্শনের ভাষায় শরীর থেকে পৃথক শক্তিকে মানসিক ও শারীরিক জীবনের মধ্য থেকে উৎপন্ন ব'লে,—যে মতবাদ আছে, তাকে এনিমিজম বলে। ইহা সকল ঐতিহাসিক পূজা আরাধনার মূলে উৎপন্ন আমাদের জীবনের ব্যক্তিত্ব এবং যৌন সম্বন্ধের সঙ্গে প্রকৃতির শক্তির যে মূলগত সম্বন্ধ আছে—ইহা যে আমাদের মনের ক্রিয়ার মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহার সাক্ষ্য আমাদের ভাষা। এখনও পর্য্যন্ত এমন কোন জাতি দেখা যায় নাই, যারা মানুষের, আত্মার মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব থাকা এবং উহার দ্বারা জীবিত ব্যক্তির কার্য্যকে প্রভাবান্বিত করাকে স্বীকার না করে অথবা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়। এই সম্পর্কটী পৃথিবীর সকল স্থানেই একরকমভাবে হয়। ঠিক উহারা জীবিত অবস্থায় যে সকল জিনিষ ভালবাসিত, তাহা তাহাদিগকে নিবেদন করা দ্বারা অথবা ওঝাগিরির দ্বারা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি আয়ত্ত করা দ্বারা, প্রকাশ করে থাকে। পূর্ব্ব পুরুষ পূজার গুরুত্ব পরিবার বা জাতির দানা বাঁধবার পক্ষে বড় অংশ গ্রহণ করেছে বলে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার দেখিয়েছেন। এই সংস্কৃতিক মূল নিশ্চিত ভাবে সন্তান বাৎসল্যের সঙ্গে যুক্ত ভূতের কৃষ্টির মূলে ও পিতৃ পূরুষের আশ্রয়ের মঙ্গল কামনার মধ্যে নিহিত আছে। একবার যখন স্বীকার করা হল যে মৃত্যু দ্বারা মানুষের সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না; ইহা অনুমান করা যুক্তি সঙ্গত যে মৃত্যুর পর পিতা তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে; তাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলকর কার্য্য করবে; তাহাদিগকে বাড়ীর বা বাড়ীর বাহিরের বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব সায়েন্স—, "এনিমিজম"।

সন্তানেরাও তাদের দিক থেকে তাঁর অনুগ্রহ পাবার জন্য, তাঁর জীবিত কালের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, ক্রমাগত আনুগত্য ও চেষ্টা দেখাবে। তারা পারিবারিক বংশক্রমটী অবশ্য রক্ষা করবে এবং বাড়ীর শাশ্বত ধারাটি বজায় রাখবে, যাতে এই সংস্কৃতিটী ব্যাহত না হয়।" [১]

এস, সি, রায় লিখেছেন, "আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে মানা মনোভাবটীর মূলে যাহা আছে তাহা বেদে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ শব্দটীর ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারের মধ্যেই। বেদের এই ব্যবহারটী ঠিক অস্ট্রিক সংস্কৃতির বোঙ্গা বা আত্মা বস্তুর ধারণার সঙ্গে একার্থবাচক। [২]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বেদ কবিতা বা সাহিত্যগ্রন্থ। কিন্তু, ইহা সাহিত্য নয়—ইহার প্রত্যেকটী শব্দই মন্ত্র। আদিম সমাজে মন্ত্রের আরম্ভ এবং বৈদিক মন্ত্রশাস্ত্রে ইহার পূর্ণ বিকাশ।

"ভেরিয়ার এলউইন দেখিয়েছেন, "আদিমদের ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্ম অথবা এনিমিজম ও হিন্দু ধর্ম্মে যে পার্থক্য করা হয় তার কোন মানে হয় না। আদিমরা আরও অধিক সংখ্যায় দেবতার পূজা করতে ইচ্ছুক যদি তারা ইহাতে বৈষয়িক কোন সুখসুবিধা লাভ করতে পারে। অপর পক্ষে হিন্দুরাও তার বহু দেব গোষ্ঠীর মধ্যে দু চারিটী আদিম দেবদেবীকে অন্তর্ভুক্ত করায় কোন আপত্তি নাই। আদিমদের ধর্ম্মের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে, যাদুমন্ত্র ও ধর্ম্মের মাঝামাঝি কোন অবস্থায় এরা আছে বলে মনে হয়।" [৩]

এই মন্ত্রবাদ শুধু হিন্দু জাতির কেন, পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্ম্মাচরণের অঙ্গ হয়ে আছে। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি

---

১ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড এথিকস, এনিমিজম।

( সাম রিফ্লেকসনস্ অব ইণ্ডিয়ান কাষ্ট ; এস, সি, রায়, ম্যান ইন ইণ্ডিয়া ; ভল ; ১৫ ; পৃ ২০ )

২ রেসেস এ্যাণ্ড কালচার অব ইণ্ডিয়া ; ডি, এন মজুমদার পৃ ১৮।

জাতির মধ্যে এই আদিম সংস্কৃতিজাত মন্ত্রবিশ্বাস, তথা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাদের সকল ধর্ম্মাচরণের মূলেই বর্ত্তমান আছে।[১]

মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রেরণ, পূর্ব্ব পুরুষের মূর্ত্তি বা চিত্র বা স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা, পুষ্প, ভোজ্যাদি উৎসর্গ, কবরের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা, মৃতের সম্মানের জন্য কটিবস্ত্র, বা শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান, পাদুকা ত্যাগ প্রভৃতি—আত্মার অস্তিত্ব ও মন্ত্র বিশ্বাসেরই নিদর্শন।

খৃষ্টানদের খৃষ্টমাস উৎসব. কুমারী মেরী পূজা সকল আত্মার দিন পূজা, খৃষ্টমাসের সময় ইউলগুড়ি পোড়ান, নেসল ডালের নিম্নে চুম্বন, প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার প্রথা—যাদুমন্ত্রে ও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ফল।

ব্যাপ্টিজমের জল, রুটী কাটা, খ্রীষ্টের রক্তপান, ক্রুশ এবং ক্রুশিফিক্স, সৌহার্দ্দের করমর্দ্দন, অনুমোদিত উপাসনার সময় নিঃশব্দতা বা বাক্য ব্যবহার, মৌখিক ধর্ম্মসূত্র উচ্চারণ—এ সমস্ত আনুষ্ঠানিক আচার—যাদু মন্ত্রবিশ্বাসেরই পরিচয়। এমন কি যেখানে উহা লক্ষ্য করা যায় না যেমন—রাজদ্বারে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বা আইন সভায় সভ্য হওয়ার সময় বা মন্ত্রী হওয়ার সময় শপথ গ্রহণ, বিবাহের সময় গীর্জ্জার যে সমস্ত সংকল্প পাঠ হয়, অন্ত্যেষ্টির সময় যে সমস্ত পবিত্র শব্দ পাঠ হয়, এমনকি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি পবিত্রতার ধারণা ও সম্মান প্রভৃতি আধুনিক সভ্য সমাজে প্রচলিত মন্ত্রবিশ্বাসের পরিচয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড এথিকস্ পৃঃ ৪৫৫তে "ট্রিজ এড প্লান্টস" শীর্ষক তথ্যে আছে, "ইহা সত্য—আজও এনিমিষ্টদের ধর্ম্মের মত, ঈশ্বরকে ভয় করা—জ্ঞান লাভের সুরু বলিয়া মনে করা হয়।

হিন্দুদের মন্ত্রবাদ, এই সমস্ত জাতির মন্ত্রবাদের মত—মন্ত্রবাদের আদিমস্তর, যাহা প্রেতাত্মায় বিশ্বাসের ধারণা বা ভয় থেকে

১ আদিম মন্ত্র বিশ্বাসের ক্রমবিকাশই বৈদিক মন্ত্রবাদ—এই বিষয়ে হিমাদ্রি কাগজে, "বাঙালীর জাতি তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৩৬৪ সাল, আশ্বিন মাসে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

উদ্ভুত, তাহা নয়। হিন্দুদের মন্ত্রবাদের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে শব্দব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে।

শব্দব্রহ্মতত্ত্ব বললে, মোটামুটি এই রকম বোঝা যায়ঃ—

চৈতন্যময়ী মহাকারণ—ব্রহ্মশক্তি বিশ্বচরাচরে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। জগতের সকল বস্তুই এই শক্তির স্বরূপ—এই শক্তির পরিণাম, জগতে প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে অস্ফুট অবস্থা থেকে স্ফুটতত্ত্বে, প্রকাশ স্থিতি এবং বিলয়ের মাধ্যমে "প্রধান" বা ব্যক্তশক্তি বা ঈশ্বর বা "বিরাট" বা "হিরণ্যগর্ভরূপে" প্রকাশিত হন। ইহাই জাগতিক স্থূল শব্দের সূক্ষ্ম অবস্থা বা কারণ। ইহাকেই শব্দব্রহ্ম বা প্রণব বা সূক্ষ্মশব্দ বলা যায়। এই সূক্ষ্ম শব্দ থেকেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও পঞ্চপ্রাণ সহযোগে এই স্থূল বা পরিচ্ছিন্ন, সীমিত অর্থাৎ খণ্ডিত দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত। "বিরাট" বা এই সূক্ষ্মশক্তি চিত্তের এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কারের স্বরূপ কারণ। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শব্দের সূক্ষ্মশক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত। মানব দেহস্থিত সূক্ষ্ম আকাশতত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বায়ুতত্ত্ব সহযোগে স্থূলশব্দরূপ, কণ্ঠে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই সূক্ষ্মশক্তি মানব দেহের অন্তরে ও বাহিরে ওতঃপ্রোত ভাবে রয়েছে। আর এই সূত্র ধরেই স্থূল শব্দ মাধ্যমে এই মহাকারণ শব্দ শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তি লভ্য হয়ে থাকেন।

শব্দশক্তি বা প্রণবের চঞ্চল, ব্যক্ত গতিশীল অবস্থাই সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়, তথা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রবাহ দ্বারা বিশ্বচরাচর আবর্ত্তিত হচ্ছে। এই আবর্ত্তনের উর্দ্ধে থাকেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিস্তরঙ্গ, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মতম ও সম্পূর্ণ। ব্যক্তশব্দশক্তি গুণের দ্বারা সীমিত, সুতরাং ব্রহ্মের পরিণাম স্বরূপ, অতএব খণ্ডিত। শব্দ সাধনার মাধ্যমে শব্দশক্তি বা ঈশ্বর এবং শব্দব্রহ্ম উভয়কেই লাভ করা যায়। ঈশ্বরকে বা শব্দশক্তিকে সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্ম অব্যক্ত—

তাঁকে উপলব্ধি করতে পারলেও বিশ্বে সে সংবাদ দেওয়ার ব্যক্তিত্ব কোথায়? বৈদিক ঋষিরা এই শব্দব্রহ্মকে ভূমানন্দময় এবং পূর্ণ বলেছেন; ইহাকে লাভ করলে আর কিছু অলব্ধ থাকে না। ইহাই সংক্ষেপে শব্দ ব্রহ্মতত্ত্ব।

বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে দেবতার সাধনা ছিল মন্ত্র বা শব্দশক্তির মাধ্যমে। তখন মন্ত্রই ছিল দেবতার স্বরূপ। মন্ত্র দেবতা বৈদিক প্রথম স্তর থেকেই বাবিলন, মিশর ও গ্রীসে বিস্তৃত হয়। ভারতীয় উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে, প্রথমে গ্রীসে—তারপর সমস্ত পশ্চিম এসিয়ায় ও রোমে-ষ্টোয়িক দর্শনের এবং ফিলোর দর্শনের মাধ্যমে। ভারতীয় উপনিষদের সর্ব্বাত্মবাদের ভিত্তি হইতে বৈদিক দ্বিতীয় স্তরের বিস্তার। এই বিস্তার সম্ভব হয়েছিল প্রথমতঃ আলেকজেন্দ্রিয়ার বিপুল বিদ্যাচর্চ্চার চেষ্টার জন্য; দ্বিতীয়তঃ অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মের পশ্চিম এসিয়ায় ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশের ফলে। ফিলোর, জেনোর বা প্লোটিনাসের মূলে সর্ব্বাত্মবাদ থাকলেও উহা সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাদ নহে। উহা ছিল ঈশ্বর দেবতাবাদের সমর্থক। পশ্চিম এসিয়ায় ব্রহ্মবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। দেবতাবাদের ধারণা ছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় তাত্ত্বিক ধর্ম্মের স্থান ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মও সর্ব্বাত্মবাদী এবং ব্রহ্মবিহারের আদর্শবাদী হলেও দেবতাতত্ত্বের বিরোধী ছিল না। বিশ্বপ্রেমবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বর সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী হওয়ায় এই জন্য পশ্চিম এশিয়ায় বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্যান ও তপস্যার সংস্কৃতিও শব্দব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তারের সহায় হয়েছিল। এই স্তরে বৌদ্ধ সর্ব্বাত্মবাদ—প্রভাবিত ষ্টোয়িক ও ফিলোর দর্শনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পুষ্ট হয়ে সেণ্টপল, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

এই গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে এই বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

শব্দব্রহ্ম, বা প্রণব বা ওঙ্কার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

উক্ত "শব্দতত্ত্ব" এবং "ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত শব্দই ঈশ্বর" ব'লে যে অন্যান্য ধর্ম্মে কথিত হয়েছে—এই দুইটী তত্ত্ব এক জিনিষ নয়। বৈদিক শব্দতত্ত্বের অর্থাৎ প্রণবের শব্দ দ্বারা সাধনায়, বিশ্বের মহাকারণরূপ আদি অব্যক্ত ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা যায়, আর অন্যান্য জাতির "শব্দই ঈশ্বর" বলতে ইহাই বুঝায় যে ঈশ্বরের বাক্য ব'লে, যাহা কথিত হয়েছে তাহা ঈশ্বরের তুল্যই পবিত্র। পবিত্রতার ভাবটি মনের একটী অবস্থা মাত্র, আর শব্দব্রহ্মতত্ত্ব মন ও স্থূলবুদ্ধির অতীত সত্য। এই তথাকথিত ঈশ্বরের বাক্যগুলি ছন্দোবদ্ধ জপ বা আবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ বা ঈশ্বরত্ব লাভ হবে—একথা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ইহা চিন্তা করাও এদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

এই রকম "শব্দই ঈশ্বর" তত্ত্বটী বেদের প্রথম অবস্থায় ছিল। প্রথম স্তরের ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি, যাহা কেবল মন্ত্রশক্তি ও দেবতাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তার ভাবনা এসে গিয়েছিল বাবিলনে, মিশরে, এসিয়া মাইনর প্রভৃতিতে খৃঃ পূঃ ১৭ শত হইতে হিকশোস, হিট্টাইট্ট, মিটান্নী, কাসসাইট প্রভৃতি জাতির আগমনের দ্বারা; আবার এদের কাছ থেকে নিয়েছিল গ্রীক, ইহুদী এবং খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি।

বৈদিক প্রথম স্তরের ধর্ম্ম সম্পদ নিয়েই এই সমস্ত জাতির কারবার; দ্বিতীয় স্তরের খবর এদের বহুকাল পরের কথা। প্রণবের শব্দব্রহ্মতত্ত্ব বৈদিক দ্বিতীয়স্তরের সংস্কৃতি। এখানে ঈশ্বরের ধারণাটি প্রাথমিক বৈদিক স্তরের বিপরীতগামী। প্রথমস্তর শব্দ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃতবস্তু। এখানে শব্দ সসীম, সগুণ, এবং ব্যক্তিগত স্তরের বস্তু। ইহাকে শব্দব্রহ্মবাদের সঙ্গে তুলনা করা যুক্তিহীন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সত্যটীকে বুঝতে পারেন নাই বলে বৈদিক মন্ত্রবাদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। বেদের অনুবাদক পণ্ডিত মোক্ষমূলার প্রণবকে "বাজে" বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[১] তিনি আরও বলেছেন—গ্রীক প্রভৃতি জাতি শব্দ সম্বন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে ঋণী নয়। এ বিষয়ে ভালভাবে

আলোচনা করে উত্তর দিতে হলে, পশ্চিম এসিয়ার জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ইতিহাসের বিষয়গুলির অবতারণা করা দরকার। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই বিষয়ে যতটা সম্ভব চেষ্টা করার ইচ্ছা করি।

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ স্বরস্বতী তাঁর লেখা জপসূত্রমে বলেছেন, "এটা বিলক্ষণ জানা আছে যে ভারতের ত্রিশ কোটী হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই বলিতেছি) জীবনে, মরণে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, ক্রিয়াকর্ম্মে ও নিত্যনৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য করিতেছে, সেটা আমরা দু'পাঁচজন বাচাল, কূপমণ্ডুক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও সেটার চেয়ে বেশী কেজো কথা কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে।"[২] সুতরাং এরূপ প্রয়োজনীয় বস্তুকে অকেজো বলাতে বৈদিক সভ্যতা তথা মানবের ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত বর্ত্তমান সভ্যতাকে বাজে বলা হয়েছে। সুতরাং এই ভ্রান্ত যুক্তিকে সকলের আগে ভাল করে খণ্ডন করা প্রয়োজন মনে করেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা আরম্ভ করলাম। এই প্রসঙ্গক্রমে বহু বিষয়ের আলোচনা করা হবে। ভারততত্ত্বের উপর যে মিথ্যার কালিমা ঢালা হয়েছে, তাহার কতকটা অপসারণ ঘটাতে পারলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

১ বেদান্ত ফিলজফি, ম্যাক্সমুলার ; পৃঃ ৬৩ ও ৬৪।

২ জপ সূত্রম, ১ম ভাগ, প্রত্যগাত্মানন্দ স্বরস্বতী, পৃঃ ৩৪।

# সভ্যতা ও ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ

## প্রথম অধ্যায়

বৈদিকমন্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা ভ্রমাত্মক এবং সে জন্যই তাঁরা বৈদিক মন্ত্রকে যাদু ও কুহক বলে অভিহিত করেন, তার কারণ যে 'শব্দব্রহ্ম' তাহা, তাঁরা বুঝেন না। "শব্দব্রহ্ম" যে অর্থে গ্রীক দর্শনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তৎপরে ইহুদীও খৃষ্টিয় দর্শনে নেওয়া হয়েছে—তাতে আর বৈদিক "শব্দব্রহ্ম" তত্ত্বে অনেক পার্থক্য। গ্রীসীয় দর্শন যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণায় আসতে পারে নাই—যখন ম্যাজিক, প্রত্যাদেশ, রোগমুক্তি, বর প্রার্থনা এই ভাবের ধারণার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ যুক্ত ক'রে, হেলেনিক দেবদেবীর কল্পনাই যখন গ্রীসের বিশেষত্ব ছিল সেই সময় উচ্চ ব্রহ্মবাদ, মানসিক চেতনার উর্দ্ধে মন্ত্রশক্তি জপধ্যানাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করা গ্রীক নাগরিকের চিন্তার অতীত ছিল।

### পণ্ডিত মক্ষমুলারের মত :—

প্রাচীন গ্রীকদের শব্দব্রহ্ম বা লোগস—ভারতীয় শব্দব্রহ্মতত্ত্বের একই সমসাময়িক বলে পণ্ডিত মোক্ষমূলার যুক্তিপ্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "প্রাচীনতম গ্রীক দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের শব্দব্রহ্মের কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। দুইটী পরস্পর পৃথক মূলীয়, যেমন গ্রীক চারিস হেবায়তেসের স্ত্রী হলেন, তেমনি বৈদিক উষার লাল অশ্বগুলি হরিতস হয়েছেন।

"যখন এই বিষয়ের সমর্থনযোগ্য কোন ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন পাওয়া যায় না, আমি শেষে এই সিদ্ধান্তই করেছি যে বৈদিক বাক এবং গ্রীক লোগসের যতই চমৎকারী মিল থাকুক না, আমরা এক্ষণে অবশ্যই

স্বীকার করব, যাহা ভারতে সম্ভব হয়েছিল, তাহা গ্রীসেও হয়েছে। আরও কথা যে ওল্ড টেষ্টামেণ্টে সোফিয়া এবং বাকের অধিকতর মিল আছে, তাহা উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ বাককে প্রজাপতির সহধর্ম্মিনী বলে পড়ি আর সেখানে উইজডমের (জ্ঞান) দ্বারা বলান হয়েছে, "আমি তাঁহারই সহিত আছি; এবং আমি প্রত্যহ তাঁহার আনন্দের কারণ; তাঁর সামনে সদাসর্ব্বদা আমোদ প্রমোদ করি।" আবার কথক উপনিষদে পড়ি, যে প্রজাপতির দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বাক, "অসীম আমাকে অধিকার করল—তার পথ যাত্রার আরম্ভে, তার পুরাতন কাজ শেষ হওয়ার আগে।"

"কিন্তু এই নিয়ে আমি স্বীকার করতে পারি না যে এই দুই জাতির মধ্যে কিছু ধার করা হয়েছে এবং ভারতীয় এবং গ্রীক দর্শনের বিনিময় হয়েছে। আর গ্রীসের লোগোস বা লোগো সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উৎপত্তি বিবরণ যখন পরিষ্কার ভাবে জানা গিয়েছে, গ্রীকদের বৈদিকদের কাছে 'বাক' ধার করার কথা আর তোলা উচিত নয়। যদি গ্রীকেরা লোগোস ভারতবর্ষ থেকে ধারই করেছে—তবে তারা এর পরে যে সমস্ত জিনিষ পরিণতি লাভ করেছে, তা কেন নিল না?"[১]

যাহা হউক, কিছু যুক্তিদিয়ে পণ্ডিতের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।

মন্ত্রবাদ বেদের থেকেও পুরাতন। শব্দব্রহ্মবাদ বৈদিক কালের হলেও মন্ত্রবাদ গ্রীকদর্শনের অনেক আগেকার ব্যাপার। ইতিপূর্ব্বে ইহার আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক প্রণবতত্ত্ব অবিসম্বাদিতভাবে কম পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বছর আগেকার; গ্রীক নাগরিক সভ্যতার বিকাশ—খৃষ্ট জন্মের সাতশত বর্ষের আগেকার হবে না। আর গ্রীক দর্শনেও প্লেটোর আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক। ভারতীয় বৈদিক প্রণবতত্ত্ব, অন্ততঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব চৌদ্দশত বছরের মধ্যে পূর্ব্ব এশিয়া ও ভূমধ্য সাগরে পৌঁচেছে তাতে আর সন্দেহ কি?

১ মক্ষমুলার ইনডিয়ান ফিলসফি, পৃ ৫৬-৫৬।

গ্রীস তার দেবতার কল্পনা, তার প্রতিবেশী মিশর, ব্যাবিলন ও পারশিয়া থেকে নিয়েছে, একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই স্বীকার করেছেন, যথা সময়ে ইহার আলোচনা হবে। মোক্ষমূলার-নিজেও লিখেছেন, "জেনেসিসের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে এবং দ্বিতীয় শ্যামুয়েলের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে এরূপ ক্রোধোত্তেজনার বিষয় বর্ণিত আছে। সেখানে ইসমাইলও জুডার প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং নিউ টেষ্টামেন্টের যে সকল অংশে অসদাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে পারসিক প্রভাবের বিষয় স্বীকার করিতে পারি।" অন্যত্র লিখেছেন, "বেদানুযায়ী পৌরাণিক কাহিনী হইতে হোমারের কবিতা সমূহের উদ্ভব হইয়াছে। বেদ ভিন্ন, পুরাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইত ও কল্পনায় পর্য্যবসিত থাকিত।"[১] খৃষ্টীয় ও ইহুদী একেশ্বরতত্ত্ব তো বহুকাল পরের ব্যাপার, এরা গ্রীক মিশরী ও পারসী তত্ববাদের সবকিছু ধার করে আত্মসাৎ করেছেন। এই সমস্ত জাতির তত্ত্ববাদ যে ভারত থেকেই গিয়েছে ইহাতে সন্দেহ নাই—ইহা ক্রমশঃ আলোচিত হবে। এদের মধ্যে শব্দব্রহ্মতত্ত্ব নাই। এদের "শব্দই ঈশ্বর-এই" তত্ব এবং শব্দব্রহ্মতত্ত্ব এক জিনিষ নয় বা শব্দ ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিতও নয়। বৈদিক ব্রহ্মবাদের ভিত্তি সম্পুর্ণরূপে শব্দ-ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জাষ্টিস উড্রফ লিখেছেন, "According to Philo, Ideas moulded matter. God first produced the inteligible world of Ideas, which are types (Aparajati) of the physical world. Though in itself, nothing but the Logos, the latter is the author of the ideal world."

"The author of the 4th gospel took up those ideas but gave them expression in such a way, as to serve Christian theological needs."

"It has thus been said that it was John's adaptation of the Philolian Logos and a Christianising of it"[২]

---

১ চিপ্ ফ্রম এ জার্মাণ ওয়ার্কসপ, ভল ৩ ম্যাক্সমুলর।

২ **Garland of Letters, Woodr of page 14.**

"The 4th gospel opens grandly, "In the beginning was the Word and the Word was with God." These are the very word of the Vedas. "প্রজাপতি বৈ ইদমাসীৎ : তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ।" She is spoken of as second to him, because she is first potentially in and then as Shakti, issues from Him" "It is not impossible also, seeing the influence of India on the west that the Philonic and Neo-platonic and Johannian conceptions were in part at least, indebted for their origin to India."

তারপর জাষ্টিস উড্রফ Logsএর সঙ্গে বৈদিক বাকের আভ্যন্তরিক পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। এই পার্থক্যটির কারণ বেদের প্রথম যুগের, যে মন্ত্রতত্ত্ব—তাহাতে মন্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ছিল না—দেবতাদের সঙ্গে সেই সময়ের সংস্কৃতিটিই গৃহীত হয়েছিল গ্রীসে, হেরাক্লিটাস বা ষ্টোয়িকদের দ্বারা। পরবর্তী ব্রহ্মবাদের অদ্বৈততত্ত্ব, বৈদিক প্রথম যুগে প্রচলিত হয় নাই। শব্দব্রহ্মতত্ত্ব বৈদিক দ্বিতীয় যুগের ব্যাপার। জাষ্টিস উড্রফ লিখেছেন, Thus the Brahman is the material cause of the world, which the Cristian Logos is not. For Christianity is dualism. Vak is no person in a Trinity. Vak is Herself the mother of the Trimurti—Brahma, Vishnu and Rudra. For She is the supreme sakti—one with Brahman. The full incarnation is a concept of Hinduism. yet in the form of Jiva. Vak is not incarnated, not in one historic person only but in all men's being and things. The word as Vak became flesh not on one particular date, in one particular place and in one particular historic person. It appeared and now appears in the flesh and other forms of matter of all limited beings or Jivas, each of whom may through Veda directly realise the Brahman whose Shakti is the word or Vak. Jesus alone was God in human form. Others were not, are

not and can never become God. Vak manifests herself in every man and is knowable and known as she is in Herself, that is Brahman in that spiritual experiment, which is Veda. [১]

উইজ্‌ডম সম্বন্ধে পণ্ডিত যা বলেছেন উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্যাটিশন সাহেবের লেখা থেকে একটু তুলে দিচ্ছি, [২] "উইজডম সাহিত্য, যার প্রভাবে সেণ্টপলের ক্রাইষ্টতত্ত্ব আকৃতি লাভ করেছে, আমরা দেখছি যে উহার উৎপত্তি আলেকজেণ্ড্রিয়া থেকে—যেখান থেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের চিন্তা বিস্তার লাভ করেছে।

সলোমনের উইজডম (ইহা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে অথবা তারও কিছু পরে লেখা), গ্রীক দর্শনের অনেক প্রভাব প্রকাশ করে। লেখকের আত্মার তত্ত্ব ও তার অমরত্বের উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় উহা প্লেটো-বাদীয় এবং যদিও উইজডমের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা হিব্রুমূলীয় বলা যায়, কিন্তু যে ভাষায় লেখক ইহার বিশ্বব্যাপিত্ব বর্ণনা করেছেন, তাতে বুঝা যাবে যে উহা গ্রীক ষ্টোয়িকদের "নিউমা" তত্ত্বই। ফিলো, ওল্ড টেষ্টামেণ্টের রূপকাত্মক ব্যাখ্যা দ্বারা গ্রীক দর্শন ও ইহুদীদের ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পূর্ণ অবিনাভার মিশ্রণ করেছেন। ইহুদী দার্শনিক ফিলো খৃষ্টের সমসাময়িক ছিলেন। এবং যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেণ্টপল ফিলোর লেখার বিষয় জানতেন কিনা, তাহলেও যে ভাবের দ্বারা তাঁহাদের দুজনের লেখা চিহ্নিত করা যায়, তাহার এত মিল যে—সেণ্টপলের খৃষ্টতত্ত্বের প্রধান তত্ত্বগুলি বুঝতে গেলে ফিলোর প্রধানতত্ত্বগুলিই হবে অধিকতর সহায়। যদিও নিজে, পল একজন মৌলিক চিন্তাশীল লোক ছিলেন না, তার 'লোগোস' তত্ত্বব্যাখ্যা ধর্ম্মের চিন্তারাজ্যে একটা প্রয়োজনীয় স্থান লাভ করেছে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের উইজডম' বেশী নির্ভরযোগ্য নয়। ইহা আলেকজেন্ড্রিয়া থেকেই এসেছে।

---

১ Garland of Letters, P. 4 and 5.

২ ষ্টাডিজ ইন ফিলজফি অব রিলিজিয়ন, প্যাটিসন, পৃঃ ১৯৬, ২০০, ১৩২, ১৩৩।

আর ফিলোর 'লোগোস' ঠিক শব্দব্রহ্ম নয়, ইহা সৃষ্টির যন্ত্র, ঈশ্বর ও সৃষ্ট জগতের মাঝামাঝি কিছু।" পণ্ডিত উইজডম ও বাক্যের একরকম বর্ণনা দেখেও ভারত থেকে ওল্ড টেষ্টামেন্টের ধার নেওয়া স্বীকার করেন না—এটার কোন যুক্তি নাই। প্রতিটি কাহিনী যে শব্দগত রূপে একরকম ভাবেই সংস্কৃতির প্রগতিতে গৃহীত হয়—এটা ভুল। প্রতি জাতির নিজ নিজ বিশ্বাস ও আচারের পরিপ্রেক্ষিতায় নিজ নিজ বিশেষত্বকে ভিত্তি করেই ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি গৃহীত হয়ে থাকে। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তার বিশেষত্বকে ফুটিয়ে দিয়ে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মেই সমস্ত ইউরোপের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম এশিয়ার ধর্ম্ম—খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয়, যাহাই হউক না কেন, বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট সর্ব্ববিষয়ে ঋণী। [১]

বৈদিক কাহিনীকে সাধারণ সাহিত্যিক বিকাশ মনে করলে ভুল করা হয়। উষা হরণের কাহিনীটি রূপক। সূর্য্যদেব উষার পশ্চাৎ ধাবিত হন,—ইহার অর্থ প্রভাতের আলো উষাকে ধরবার জন্য ধাবমাণ হচ্ছে। সুতরাং এই রূপকের ভাবার্থ নিয়েই ঠিক "উইজডমের পশ্চাতে ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হওয়ার ভাবটি গ্রহণ করা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রের রূপকার্থের বাহুল্য আছে ইহা সকলেই জানেন। ইহার দুইরকম অর্থ করা যায়। রহস্যবাদের নিয়মই এই। যখন সাধক সমাধিস্থ হয় বা দৈব প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অভিভূত হয়, তখন তাঁর ভাষা সাধারণ লোকের ভাষার মত থাকে না। এই ভাষা হয় অভিভূতভাষা বা রূপক ভাষা। সাধক রূপকের ভাষা দ্বারা দৈব প্রভাব ব্যক্ত করেন। বৈদিক মন্ত্রের ভাষাও অভিভূত ভাষা অর্থাৎ ঋষির সমাধিলব্ধ দৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত অভিভূত বাণী। সুতরাং

১ হেকেলস কনটিবিউসান, টু রিলিজিয়েন এপ্রস মরিসপৃ ৭০

ভাবাচ্ছন্ন ভাষাকে, প্রতিটি শব্দের মিল দেখে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বিচার করা যায় না। ভাবের রাজ্যের মিলই এখানে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

জাষ্টিষ উড্রফ উদাহরণের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন:

"The union of will and word was the potency of creation. All things being held in undifferentiated mass in the Great womb of the mother of all" 14

## উইজডমতত্ত্ব ও আলেকজেন্দ্রিয়া এবং ফিলো

পণ্ডিত, শব্দব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রীকদর্শনের ধার করার বিষয় বিশ্বাস করেন না এবং ভারতের কাছে এদের অন্য কোন ঋণের অস্তিত্ব কেন নাই, তাই প্রশ্ন করেছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করতে হলে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত জাতিগুলির বিস্তার, সামাজিক বিকাশ নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুবিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করতে হবে। ইতিপূর্ব্বে ডাঃ প্যাটিসনের লেখা থেকে দেখা গেল যে সলোমনের উইজডম—যাহা "শব্দই ঈশ্বর" এই তত্ত্বের মূল—উহা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পরে লেখা, আর উহার উৎপত্তি আলেক্-জেন্দ্রিয়া থেকে। এই আলেকজেন্দ্রিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির মিলনভূমি—বিরাট বিদ্যার কেন্দ্র। এই আলেকজেন্দ্রিয়ার বিরাট লাইব্রেরী ধর্ম্মান্ধ লোকেরা ভষ্মসাৎ করেছিল। ইউরোপের ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধনার পথ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছিল খৃষ্টান ও মুসলমানদের মাধ্যমে, তাহার মূল উৎসই ছিল আলেকজেন্দ্রিয়া। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ শতক পূর্ব্বে মিশরের অধিপতি টলেমির রাজত্বকালে আলেকজেন্দ্রিয়ার গৌরবোজ্জ্বল আবির্ভাব। ইহুদি দার্শনিক ফিলোর বা ফাইলোর আবির্ভাব হয় খৃষ্টের জন্মের প্রায় সমসাময়িক যুগে খৃঃ পূঃ ৩০ বা ৪০ শতকে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" থেকে নীচে তুলে দিচ্ছি, "যে সকল ইহুদী আলেকজেন্দ্রিয়ার সাংস্কৃতিক

14 Garland of letters, page 14

অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা প্রথমে হেলেনীয় সভ্যতার প্রভাবে আসিয়াছিল এবং সেই যুগে ও সেই পরিবেশে যে ষ্টোয়িক—প্লেটনিক দর্শনের আধিপত্য ছিল, তাহার সহিত তাহাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইহুদী চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সাধনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্য পর্য্যন্ত এমন একটী সাহিত্য গড়িয়াছিল যাহাতে বাইবেলের চিন্তাসমূহ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কতকগুলি ষ্টোয়িক ও প্লেটোনিক চিন্তাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। আলেকজেন্দ্রিয়ার দার্শনিক ফাইলোর মনের প্রবণতা রহস্যবাদের অভিমুখী ছিল বলিয়া ষ্টোয়িক মহাদার্শনিক পসিডোনিয়াস খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে যে নব প্লেটোনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যে দর্শনে সেই যুগের অন্তরতম চিন্তাসমূহ প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তিনি উহার প্রতি অনিবার্য্যভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তেই এই সাহিত্য পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ফাইলোও পসিডোনিয়াস অপেক্ষা অধিক সাফল্যের সহিত এই ধারণাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে ইহুদীয় উপাদান ছিল এবং যাহার জন্য তিনি জগতের একত্বের ব্যাখ্যার জন্য একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাতীত এবং সর্বভূতে অনুস্যূত তত্ত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সাফল্যের প্রধান কারণ বলিলে যুক্তিসঙ্গত হইবে। ফাইলো ইহুদীয় এবং ষ্টোইক দর্শনের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাইবেলের ধর্মের মূলাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাইবেলে যাহাকে প্রত্যাদেশ বলে তাহা কোন কালাতীত সত্তা বা কোন তাত্ত্বিক সত্যের সম্বন্ধে নহে। ইহার ফলে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, ক্রিয়া এবং অভিপ্রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইস্রায়েলের ভবিষ্যদবক্তাগণ অর্থাৎ বাইবেলের প্রত্যাদেশের বক্তাগণ দার্শনিক নহেন। তাহারা ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা। এই ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎবক্তাদের চিন্তা ও গ্রীক এবং ভারতীয় চিন্তার মধ্যে প্রগাঢ় পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আর একটি

পার্থক্য আছে। বাইবেলের ধর্ম্মে দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা অপেক্ষা নীতি-সম্মত কার্য্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।”

## প্রাক আলেকজেণ্ড্রিয়া যুগে ঈশ্বরতত্ত্ব

“বাইবেলের ভবিষ্যদবক্তাগণ, মানুষ যে ভগবানকে জানিবে ইহা জোরের সহিত বলিয়াছেন’ কিন্তু ভগবানের জ্ঞান কেবলমাত্র তত্ত্বচিন্তা হইতে নয় পরন্তু আচরণ হইতে উদ্ভূত—এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ফাইলো দার্শনিক চিন্তাকে যে নূতনরূপ দিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে লক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা ইহুদীয় ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম—সকলের উপরই পড়িয়াছিল। খৃষ্টিয় ধর্ম-যাজকগণ, আলেকজেন্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের ক্লেমেণ্ট এবং ওরিগেন এবং ডামাস্কাসের জন, ইসলামিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত। তাহাদের নিকট হইতে যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই ফাইলোর লেখাগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। এইচ গয়ো এবং হাইনেমান দেখাইয়াছেন যে ফাইলোর আরও একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে তাঁহার ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, জগৎ—এই ত্রিত্ব-মূলক মত নব প্লোটোনীয় মতবাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিল এবং এই নবপ্লেটোনীয় মতবাদ মধ্যযুগের ইসলামীয় এবং ইহুদীয় দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।” [১৫]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এবং ডাঃ প্যাটিসনের হিববার্ট বক্তৃতা থেকে দেখা গেল যে বাইবেলের শব্দব্রহ্মতত্ত্বের মূলে আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে প্রচারিত ষ্টোয়িক এবং প্লেটোনিক ঈশ্বরতত্ত্ব। ইহা যথাস্থানে ষ্টোয়িক ও প্লেটোনিক ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনায় পাওয়া যাবে। ইহা ভারতীয় দর্শনের কাছে ঋণছাড়া আর কিছু না।

ইস্রায়েলের ঈশ্বরতত্ত্ব কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান তখন এক

---

১৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; সর্ব্বপলী রাধাকিষণ; পৃঃ ৬১৯, ১০০৩

ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও ছিল না। এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম প্রচার হয় আলেকজেন্দ্রিয়া থেকেই—একথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন না। বাবিলোনিয়ার, আসিরিয়ার, মিশরের—ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন তত্ত্বজ্ঞান ছিল না। ইহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা সিন্ধুসভ্যতা মূলীয়। ইহা পরে আলোচিত হবে। মোটের উপর স্কফিল্ড লিখেছেন, "দেবতাকে পিতৃভাবে চিন্তা করার ভাব থেকে জাতিগতভাবে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এই দেবতা, জাতির ভাগ্যের সঙ্গে একসূত্রে যুক্ত হয়ে গেলেন। চেমোষ হলেন মোয়াবদের দেবতা, এমনদেব হলেন মোলোচদের; এদমদের দেবতা হলেন কোজ আর ইস্রায়েলদের যেমন আছেন—ইহোভা। এক সময় ইস্রায়েলরা, হয়তো ইহোভার বাস সিনাই থেকে তাদের প্রার্থনা পূরণ করতে আসেন বলে, মনে করত। তারপর অবশ্য তিনি একটি মাত্র পবিত্র স্থানে আবদ্ধ থাকেন নাই। জাতীয় দেবতা হিসাবে তিনি তাদের রক্ষা করতেন, তাদের জন্য যুদ্ধ করতেন, শত্রুর বিরুদ্ধে। আর যখন ইস্রায়েলরা কোন বিষয় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারত না, তখন সম্ভবতঃ তিনি উচ্চতম বিচারক ছিলেন, আর এ বিচার প্রত্যাদেশ অথবা দিব্যপরীক্ষা (অরডিয়াল) দ্বারাই হ'ত। তাঁর লোকের সব নীতির ব্যাপারে, তিনি ছিলেন রক্ষক, কিন্তু এই কথার ঠিক অর্থে তিনি ন্যায় বিচারের বা নীতির দেবতা ছিলেন না—কারণ অন্য জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যাপারে, তাঁর ন্যায়বিচার বা সুনীতি রক্ষা করতেন না; তাঁর নীতি ছিল—রক্তদ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তিনি তাঁর লোককে বাহিরের আগন্তুকের বিবাদে রক্ষা করতেন, যদিও তাঁর লোকেরা প্রবঞ্চনা, চুরি প্রভৃতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করত।"

"ধর্মীয় পুস্তকের এপোক্রিপটিক লেখাতে দেখা যায় যে এই পরম্পরাগত বিশ্বাসগুলি ইহুদীয় বাহিরের মাল মসলার সঙ্গে মিশে বিশৃঙ্খল, অসম্বন্ধ ভাবের জন্ম হয়েছে। আর কোন স্থান থেকে এত বেশী আসে নাই—যত এসেছে পারস্য থেকে—ইহুদী সাহিত্যে

ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। "যেমন ইস্রেলীয়গণের উর্বরা প্রকৃতির দেবতা ব্যালের সঙ্গে জিহোবার; তার পরে এরা পারসীকদের দেবতা অহুরা মজদা, যিনি স্বর্গের দেবতা, তাঁর সঙ্গে একত্ব সম্পাদন করেছিল। তেমনি এখন ইহুদীগণ এমন ভাষা ব্যবহ্যর করার জন্য আগ্রহান্বিত হ'ল, যাহা জিউসের সঙ্গে একার্থবাচক। বেশে—ভাষায়, এই হজম করা চলতে লাগল—এমন কি ইহুদী বৈশিষ্ট্য প্রথা যে সুন্নতকরা, তার বিষয়েও অবহেলা করা হ'ল। ১

মিশরের ধর্মবিশ্বাসও তত্ত্বজ্ঞানের পর্য্যায়ে ওঠে নাই।

"পেট্রি তার রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড কনশানস অব এনসিয়েণ্ট ইজিপ্টএ লিখেছেন যে মিশরে ইন্দ্রজাল ছিল অধিবাসীদের আদিম ধর্ম্ম, অসিরিস এসেছে লিডিয়া থেকে, বিশ্বশক্তির আধার—সূর্যের উপাসনা আমদানি করা হয়েছে মেসোপটেমিয়া থেকে এবং নৃপতিদের রাজশক্তিই দেবতাকে অনুরূপ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী ক'রে তুলেছে। বহু দেবতার আসন দেওয়া হয়েছে মিশরীয় ধর্মে; তত্বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করলে নানারূপ অসঙ্গতিও দেখা যায় সত্য; যেমন দেবতাকে আঁকা হয়েছে কখনও মানুষ কখনও বা বাজপক্ষীরূপে, রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো সূর্য্যতারারূপে কখনও বা বৃষ, কুমীর, সিংহরূপে—রূপকছলে নয়, মূল প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে। দেবতা, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, বিশ্বজগৎ, সাধারণ যুক্তিবিচারে সকলেরই রূপ স্বতন্ত্র, প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন, রাজাকে মানব রূপেই দেখতে হয়, সূর্য্যরূপ বা বৃষরূপে বর্ণনা অসঙ্গত।"

"ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—সর্বভূতের অন্তরাত্মা বা তার প্রকাশক—একেশ্বরবাদের কল্পনা ধর্মভ্রষ্ট রাজা ইখনাতনের পূর্বে মিশরীয় চিত্তে বড় একটা সজাগ হয়ে ওঠে নি। ইখনাতনের সূর্য্যপূজা ও একেশ্বরবাদ সাময়িক বিদ্যুল্লেখার মত উদয় হয়েই দিগন্তে মিশে গিয়েছিল। সম্রাট

১ রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউণ্ড অব দি বাইবেল, জে, এন, স্কফিল্ড, পৃঃ ৬৬, ৬৭, ১০২ ও ১৯৪।

ইখ্‌নাতন খ্রীঃ পূঃ ১৩৮০ সালে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পুরোহিত-তন্ত্র তুলে দিয়ে দেবতা আটন অর্থাৎ সূর্য্যদেবতাকে সার্বভৌম দেবতা বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-ধানীর পতন হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত স্মৃতি মুছে, পুরাতন দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তারপর একেবারে খ্রীঃ পূ ৭০০ শতকের কথা—মেমফিসের ধর্ম্মতত্ত্বে "এ পর্যন্ত আমরা যে সব পুরাণো কথা বা মিথের বর্ণনা দিয়েছি, তার সঙ্গে মেমফাইট থিয়োলজির প্রভেদ আকাশ পাতাল। মিশরের কেবল 'মিথই' আছে, দর্শন নেই। তাই যখন এই ধর্মতত্ত্বের প্রকৃতি বিষয়ের দার্শনিক গবেষণার অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়, তখন মনে হয় যেন এটা মিশরের বিষয় নয়—ছিটকে এসে পড়েছে অন্য কোথাও থেকে। প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক তত্ত্বগুলি টুকরো টুকরো ভাবে ছড়ান ছিল মিথের মধ্যে। মেমফাইট থিয়োলজি সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে সাজিয়ে সুসম্বদ্ধ আকার দান করেছে। টা—নগরদেবতা। 'বাক্যই' আদেশ—টা এর হৃদয়ের চিন্তা বা কল্পনা জিহ্বাগ্রে দেখা দেয় আদর্শবাক্যরূপে—আর সেই আদর্শ বাক্য রূপে বাহ্যতঃ সৃষ্টবস্তুরূপে পরিদৃশ্যমান। নয়টি দেবতা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি নরদেবতার হৃদয় ও জিহ্বা"। ১ বৈদিক শব্দ ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যায় না, এমন কি ইহা দার্শনিক তত্ত্বও নয়। ব্রহ্মবাদ যোগলব্ধ। পার্থিব শক্তি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অতীত অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত "সচ্চিদানন্দ স্বরূপের তত্ত্ব। এসব চিন্তা, কল্পনানেত্রের পৌরাণিক আকাশ-কুসুমের ফল নয়। আর এদের শব্দতত্ত্ব মন্ত্রের শক্তিকে রূপ দেওয়ার জন্য সৃষ্ট গল্প মাত্র। এর সঙ্গে বৈদিক প্রণবতত্ত্ব শব্দতত্ত্বের তুলনা করা নিতান্ত ভুল চেষ্টা। এদের মন্ত্র, ঝাড়ফুক প্রভৃতি, তুকতাক, যাদু—ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই জন্যই তাদের মিথের দেশে ইহা পৌরাণিক গল্প হওয়া স্বাভাবিক।

১ প্রাচীন মিশর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৪, ৮৮, ১৪৯, ১২৮, ১২৯ ও ১৩০।

## মিশরের শিবসংস্কৃতি

তা ছাড়া খ্রীঃ পূঃ ৭০০ শতকে, ভারতের দার্শনিক যুগ পুরাদস্তুর আরম্ভ হয়েছে। বেদ ও উপনিষদের যুগ আরম্ভ হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ ২০০০ বছর আগে থেকে। ভারতের দেবসংস্কৃতি বৈদিক। মিশরের অসিরিস সংস্কৃতি সিরিয়া থেকে আনা। মিশরের অসিরিসের সঙ্গে বৈদিক শিবের সাদৃশ্য, মিশরের ঋণ বলে স্বীকার করা ছাড়া আর কি বলা যায়। অসিরিসের রূপ কল্পনা এবং অর্চ্চনা—পরবর্ত্তীকালেগৃহীত সংস্কৃতি এবং উহা ভারতীয় বলেই মনে হয়। বিশ্বকোষ থেকে তুলে দিচ্ছি,—"শিব ও অসিরিস উভয়েরই শিরোভূষণ সর্প। আইসিস দেবী দুর্গার মত পৃথিবীরূপা। অসিরিসও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। তাহার প্রিয় বৃক্ষ বিল্ববৃক্ষের মতই ত্রিপত্রিকা। অসিরিস কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মহাকাল নামক শিবমূর্ত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ (তন্ত্রসার)। শিব যেমন সৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক—মিশরীয় পণ্ডিতগণ অসিরিস সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাকে ভারতীয় সস্কৃতির নিদর্শন বলা যায়।" ১

সুতরাং একথা মোটেই অসঙ্গত হবে না, যদি দেখান যায় যে এই সময়ের ঠিক আগে বা পরে বৈদিকদের সঙ্গে মিশরে লেনদেন হয়েছে। মিশরের প্রাচীন সংস্কৃতিতে বৈদিক ব্রহ্মসাধনের কোন পরিচয় ছিল না। আমরা আরও দেখতে পাব যে এই ভাবেই—সাধনশাস্ত্র হিসাবে নয়—কাহিনীর রূপকআকারে শব্দব্রহ্ম গ্রীক তথা ইহুদী ধর্মের সাহিত্য ও কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে।

## মিটান্নীর সূর্য্য সংস্কৃতি ও ইখনাতন

"ইন্দ্র, মিটান্নীর শাসকবর্গের ভাষা ছিল, আদিম বৈদিক ভাষার অনুরূপ। বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা ছিলেন—তাদের উপাস্য। মিটান্নীরাজ দশরথের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন মিশরের ফারাও,

১ বিশ্বকোষং, শিব।

তৃতীয় আমেনহটেপ। এই রাজকন্যা সুপ্রসিদ্ধ ইখনাতনের জননী। রাজপরিবারের বাহিরে—বিশেষ করে কোন বিদেশী কন্যার সঙ্গে ফারাওর বিবাহ ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। স্পষ্টই দেখা যায়—ইন্দোআর্য্য-বংশীয় রাণী, পুরোহিত সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আর সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি পুত্র ইখনাতনের শিক্ষাদীক্ষার পরিচালনা এমন-ভাবে করেছিলেন যে সিংহাসনে আরোহণ করেই ইখনাতন পিতৃবংশের কুলধর্ম উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হলেন। পুরোহিতগোষ্ঠীর উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, মিশরের দেবদেবী নির্বাসিত করে একমাত্র সূর্য্যদেব আটনের পূজার বোধন করেছিলেন, মাতৃদেবীর শিক্ষাপ্রভাবে—এই বৃত্তান্তটি থেকে আমাদের দেশের কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে ভারতের বৈদিক ধর্মকে অনুসরণ করেই মিশরে একেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছিল।” ১

“মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর ও প্যালেষ্টাইনে কীলকা-ক্ষরে লিখিত যে সব মাটির চাকতি পাওয়া গেছে সেই লিখনগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে খৃষ্টপুর্ব ১৬০০ থেকে ১২৫০ অব্দের মধ্যে পশ্চিম এসিয়ার অনেক লোক ইন্দো-ইউরোপীয়, এমনকি বৈদিক নাম ধারণ করতো, যেমন ইন্দ্ররুত, আর্ত্তম, সুকর্ণ, কিককুলি, দশরথ। পশ্চিম এসিয়ার এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের মিটান্নী, হিট্টাইট, কাসসাইট বলে জানা গেছে। মিটান্নীর আর্য্যজাতি ছিল বৈদিক দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, ও মিত্র, নাসত্যের উপাসক। উরুমিয়া হ্রদের পশ্চিমে নবাগত আর্য্যরা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৪৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে। এখানকার আর্য্যদের ভাষায় অনেক বৈদিক প্রাকৃতের ব্যবহার দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই জাতির সঙ্গে বৈদিক যুগের ভারতের সম্বন্ধ ছিল অভিন্ন।” ২

উক্ত উদ্ধৃতি হতে দেখা গেল যে বৈদিক আর্য্য সংস্কৃতি মিটান্নীর রাজবংশের মাধ্যমে মিশরে গিয়ে, মিশরের ধর্মে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন

১ প্রাচীন মিশর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; পৃ ৪৫।
২ ইরাণের ইতিকথা, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫ ও ৪৬।

সাধন করেছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং একথা বুঝা কষ্ট হয় না যে বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে এই সময়েই মিশরে প্রবল প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করেছিল এবং ঐ বিপ্লব, বৈদিক চিন্তাধারারই সংঘাত—সংঘর্ষ। এই নূতন সংস্কৃতি মিশরের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না; ইহা বাহিরের আরোপিত ভাসা—ভাসা চিন্তাধারা ছিল, জনসাধারণের অন্তরের অনুভূতি বা সাধনধারার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ছিল না বলেই ইখনাতনের মৃত্যুর পরই এই সংস্কৃতি বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

## ইথিওপিয়ান

আফ্রিকায় ভারতসংস্কৃতির বিস্তারের আর এক প্রমাণ ইথিওপিয়া। "ইথিওপিয়া, আফ্রিকায় এখন যেখানে নিউবিয়া, আবিসিনিয়া সেনার, কোরডোফন, দাঙ্গোলা দারফুর প্রভৃতি প্রদেশ—তাহারই নাম ছিল। ৭৬০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়া মিশরের করদরাজ্যভুক্ত ছিল। এক কালে ভারতবর্ষে যাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা তাহাদেরই শাসনাধীন ছিল—সার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ( এসিয়াটিক রিসার্চ্চেস ) সার উইলিয়াম জোন্সের বহুপূর্বে ( ৭০ হইতে ১৮০ খ্রীঃ মধ্যে ) গ্রীস দেশের তার্কিক ও অলঙ্কারশাস্ত্র বিদ ফিলষ্ট্রেশাস এই ইথিওপিয়ার প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন, "ইথিওপিয়বাসীরা ভারতবাসীদের বংশধর। তাহারা পূর্বে ভারতেই বসবাস করিত। তাহারা আপন দেশের সম্মানিত নৃপতিকে হত্যা করিয়া পাতকগ্রস্ত হইয়াছিল। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনপূর্বক তথায় বসবাস করিতে থাকে। কনস্তানতিনোপল রাজ্যের অন্যতম ধর্মাধ্যক্ষ কুলপতি ইউসেবিয়াস পূর্বোক্ত মতেরই পোষাকতা করিয়া গিয়াছেন। ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তানতিনোপলে

তাহার জন্ম হয়! তিনি বলেন, সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া যাহারা মিশরের সন্নিকটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইথিওপিয়গণ তাঁহাদেরই শাখা বিশেষ। ফিলষ্ট্রেশাসের গ্রন্থে একজন মিশরবাসীর পরিচয় প্রসঙ্গে ইথিওপিয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সেই মিশরবাসী তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল—ভারতবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান ও ধীশক্তিসম্পন্ন। ইথিওপীয়গণ ভারতবাসীদেরই শাখা—তাহারা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা ভারতীয় পিতৃপুরুষের ন্যায় জ্ঞানবান ছিল এবং তাহাদেরই আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিত। তাহারা যে ভারতবাসী হইতে উৎপন্ন, পরন্তু অভিন্ন নহে সে কথা মুক্তকণ্ঠে তাহারা স্বীকার করিত।

তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রধান রোমীয় ঐতিহাসিক জুলিয়াস আফ্রিকেনাশ পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ইউসেবিয়াস এবং সিনসেলাস প্রমুখ পরবর্ত্তী প্রত্নতাত্বিকগণ জুলিয়াস আফ্রিকেনাসের মত উদ্ধৃত করিয়াই আপনাদের যুক্তি সমর্থন করেন। আবিসিনিয়ার নামও, অধ্যাপক হীরেণের মতে ভারতের প্রাধান্যদ্যোতক। সিন্ধুনদের একটি প্রাচীন নাম—"আবুইশীন'। অধ্যাপক হীরেন বলেন—সেই আবুইশীন সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আফ্রিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, ভারতীয় হিন্দুগণ সেই স্থানকে আবিসিনীয়া নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।" ১

মিশরের বিখ্যাত নদী নীলনদীর নাম এই উপনিবেশকারীদের দেওয়া হতে পারে। মিশর শব্দটী সংস্কৃত শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ। ইহা ছাড়া, এই নদীর অনেক অঞ্চলের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষের অঞ্চলের নামেরও অনেক মিল পাওয়া যায়। নীলনদীর মোহানার বন্দর বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ঐ বন্দর থেকে ফিনিশিয়গণ তথা ইথিওপিয়গণ স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।"

১ পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতবর্ষ, পৃঃ ২৮, ২৯ ও ৩০ দ্বিতীয় খণ্ড; ৫৭, ৫৮, ৫৯ ও ৬০ ৪র্থ খণ্ড।

মিশরের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যে যোগ ছিল তাহা, ১৯৫১ সালের ভারতীয় সেন্সাসের পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে সেন্সাসের সুধাংশু কুমার রায় মহাশয় অনেক নূতন কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ইহা তাহার "প্রিহিষ্টরিক ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড এনসিয়েণ্ট ইজিপ্ট" পুস্তকে লিখেছেন। ইহার সমস্তগুলি গ্রাহ্য না হতে পারে, তবে সংস্কৃতিক সহযোগের কথা আর অবিশ্বাস করা চলে না।

## মিশরে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

মিশরের ইতিহাস রচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা রাজাদের বংশগত ক্রমানুসারে মিশরের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মিশরের সংস্কৃতি অনুসন্ধান করতে হলে এভাবে ব্যাখ্যা করলে খুব অসুবিধা হবে। হিরোডোটাস ৪র্থ শতক আগেকার অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০৯৮-৩০৭৫ হতে উল্লেখ করেছেন। এর পূর্ব্বে যে ব্রোঞ্জ যুগের আগে, নব্যপ্রস্তর যুগের সময়-স্থানীয় জাতির রাজত্বই ছিল। তা'নিয়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সংস্রব পাওয়া যাবে না। ঐতিহাসিক জাতি-বিস্তারের মূল ছিল বাণিজ্য ও যুদ্ধ। ইহা খৃষ্টীয় পূর্ব্ব তিন হাজার বছর আগে বিশেষ দেখা যায় নাই। প্রফেসর ডি এ মেকেঞ্জি তার "ইজিপ্‌সিয়ান মিথ এণ্ড লিজেণ্ড" পুস্তকে লিখেছেন, "আঠার বংশের সময় ( খৃঃ পূঃ পনর শতক ) রাজকীয় অর্নবপোত সকল ভূমধ্যসাগর এবং ভারত সাগরে গতায়াত করেছে এবং অন্যান্য সুদূর দেশে, যারা মিশরের নামও শুনে নাই, তাদের মধ্যে অনেকে নীল উপত্যকা থেকে বিস্তৃত-সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্যে আসছিল। সুতরাং এই সময়ের কাছাকাছিই ভারতের সঙ্গে মিশরের সাস্কৃতিক বিনিময় ও ঔপনিবেশিক বিস্তার হয়েছিল মনে হয়। ডঃ এম্ এ মুরি তাঁরে "দি স্পেল্‌ণ্ডার ছাট ওয়াজ ইজিপ্ট" নামক পুস্তকে লিখেছেন" হাতসেপসুস্ আর্টিষ্টগণ যাহা চিত্রিত করেছেন, তাহাতে পুন্‌ত দেশের মানুষ, আফ্রিকার কোন জাতি না হয়ে এসিয়ার জাতিই হবে। এতে আছে সুগন্ধি কাঠের কথা, ইহা যাহা

নির্দ্দেশ করে,—তাহা ভারতবর্ষেই ছিল। ভারত থেকে মিশর সমূদ্র-তীরবাহী—অর্ণবপোত দ্বারা বাণিজ্যচালনা খুব সম্ভব এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে আরবের দক্ষিণ উপকুল বরাবর ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য বন্দরের অস্তিত্ব থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব।"

এই সমস্ত প্রমাণ, যথাস্থানে বহুল পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বামী শঙ্করানন্দ লিখেছেন "মিশরীদের জাতীয় ঐতিহ্যে আছে যে তারা মিশরে পূর্ণসংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতা নিয়ে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। প্রত্নতাত্বিকেরাও এই ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। এর কারণ—এই ঔপণিবেশিকরা তাদের সঙ্গে যে সংস্কৃতি এনেছিলেন, তাহা মিশরের মাটীতে জন্মায় নাই—ইহা কোন ক্রমবিকাশজাত অবস্থা না দেখিয়ে, অকস্মাৎ মিশরে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। যখন তারা মিশরে প্রবেশ করেছিলেন তখন তারা—কৃষি কাজ, ধাতুর কাজ জানতেন এবং তাদের বিকাশ প্রাপ্ত ভাষা ছিল। যে স্থান থেকে তারা নীল উপত্যকায় প্রবেশ করেছিল, মিশরের ঐতিহ্যে সেই স্থানের নাম "পুন্‌ত", কিন্তু "পুন্‌ত" মানে 'দেবতাদের দেশ। ইহা ভারতকেই বুঝায়, কারণ ভারতের নামের অর্থ-ই তাই। ভারত ঐ নামেই পরিচিত ছিল এবং দেবভূমি নামে পরিচিত আছে এখনও। এ ছাড়া পুনত দেশ থেকে যে বাণিজ্য সম্ভার আনা হয়েছিল, তাতেও নির্দ্দেশ করে—উহার ভারতই কারণ। প্রচুর গন্ধদ্রব্য, বহু সংখ্যক গৃহপালিত পশু এবং বহু সংখ্যক কাষ্ঠ খণ্ডের আনয়ন দ্বারা ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় ভারতবর্ষই ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল উৎস।"

## ফিনশিয়গণ

"ফিনিশিয়গণ ভূমধ্যসাগরের বড় ব্যবসায়ী জাতি। যেখানে তারা বাস করত, তাহা লেবানন ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড। তাদের রাজধানী টায়ার খৃঃ পূঃ ২৭৩০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বলে হিরোডোটাস লিখেছেন। হিরোডোটাস আরও

লিখেছেন যে তাদের প্রাচীন নিবাস ছিল ইরিথ্রিয়ান সাগর। ইরিথ্রিয়ান সাগর শব্দটী দ্বারা—যে সমুদ্র পার হয়ে গ্রীকরা ভারতে পৌঁছাতে পারে সেই সাগরকে বুঝায়। পূর্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা ফিনিশিয়গণকে লোহিত সাগরের নিকটে অবস্থিত স্থানের নিবাসী বলে নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমানের ঐতিহাসিকেরা ইহাকে পারশ্য উপসাগরের কোন স্থানের নিবাসী বলে মনে করেন। ফিনিশিয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর কার্থেজ, আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত। যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে প্রমাণ হয় যে কার্থেজীয়গণ নিজেদের "পিয়নী বলে অভিহিত করত।" এই পিয়নী শব্দকে বৈদিক পণি শব্দের অপভ্রংশ বলা যায়। ইহারা বণিকসম্প্রদায়। সুতরাং ফিনিশিয়গণ সম্ভবত ভারত থেকেই এখানে উপনিবিষ্ট। সম্ভবতঃ পণিশব্দ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম। তারা দেশের বাইরে যাওয়ার সময় একদলে যেতনা—দলে দলে বাহির হোত। এত্রুসকানগণ, যাদের একটা লিপি পাওয়া গেছে, তাহাতে অন্ততঃ ১৯টী সিন্ধুসভ্যতার অক্ষর পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ এরাই প্রাচীনতম পণি। এই এত্রুস্কানদের একটা লিপি থেকে আমি 'পণি' নাম নির্ণয় করতে পেরেছি। ফিনিশিয় বা আরামাইক লিপিতে ২২টী অক্ষরের মধ্যে ১২টীই সিন্ধু সভ্যতার লিপি আছে।" ২২

ভারত থেকে মিশরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে-দুর্গাদাস লাহিড়ীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি করছি, "কর্নেল অলকট লিখেছেন, দার এল বাবরি শহরে রানী হাসলিটপের রাজত্বের প্রাচীর গাত্রে যে সাঙ্কেতিক চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহাতেও পন্তকে ভারতবর্ষেরই প্রদেশ—বিশেষ ছাড়া কিছু বলা যায় না। প্রাচীন মিশরীয়গণ বহুকাল পর্যন্ত আপনাদের আদিবাসস্থান ভারতের সঙ্গে বানিজ্য করিয়াছিল। তাহারা পন্তের যুবরাজগণের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে এবং সেই দেশের পত্র পুষ্পের—বিশেষতঃ বৃক্ষাদির যে নাম সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা যে মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়

২২ স্বামী-শংকরানন্দ, হিন্দু ষ্টেস্ অব সুমেরিয়া পৃঃ ভূমিকা৯ এবং ১০।

মূলীভূত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। প্রত্নতত্ত্বানু—সন্ধিৎসু পোকক্ এ বিষয়ে ষড়বিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশ এবং হিমালয়ের সন্নিহিত দেশসমূহ হইতে আফ্রিকায় যে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি প্রমাণ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি, প্রথম—প্রাচীন মিশরের বহু প্রদেশের এবং বহু নদ নদীর নামকরণে—ভারতের নদ-নদী এবং প্রদেশের নামকরণে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়, ভারতের অথবা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নগর ও প্রদেশের নামের সহিত মিশরের নগরাদির নামের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়, মিশরের শাসকদের রামেশ বা রমিশীস আখ্যা হইতেও সম্বন্ধ তত্ত্ব বুঝিতে পারি। চতুর্থ,—সমাধিক্রিয়ার উপকরণাদিতে সাদৃশ্য বিদ্যমান। পঞ্চম—স্থাপত্যের শিল্পনৈপুণ্যে, বৃহদায়তনে এবং জাকজ—মকে সৌসাদৃশ্য। ষষ্ঠ,—সংস্কৃতের সাহায্যে মিশরদেশের কতিপয় ভাষার অনুবাদের সুবিধা ( Mr Pococke, India in Greece )। অধিক কি, কর্নেল টড, মিশরের এবং ভারতের রাজন্যবর্গের বংশপর্য্যায় আলোচনায়, উভয় দেশের রাজগণের সংখ্যার তারতম্যে বিস্ময়াবিষ্ট; ভারতবর্ষ হইতে যে আফ্রিকার বহু নগর, গ্রামের নাম সংগৃহীত হইয়াছে, তিনি তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলিয়াছেন, "গাম্বীয়া এবং সেনীগাল নদীর মোহানায় যে সকল নগর অবস্থিত, তন্মধ্যে অনেকেরই হিন্দু নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—তাম্বকুণ্ড, কুণ্ড—ইত্যাদি। এসিয়াটিক জর্ণাল পত্রিকার একজন লেখক দেখাইয়াছেন,—মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের ও অধিকাংশ স্থানের নাম সংস্কৃতমূলক। সেই সকল নামের অধিকাংশেরই মূলে ভারতের প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে সন্দেহ নাই।" (Todds Rajas-than vol II ২৩

২৩ ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৩৭৮,৩৭৯।

## হিকশোস হিট্টাইট ও মিটান্নী

"মিশরের সভ্যতার অধুনিক ধর্ম্মবিকাশের মূলে সিরিয়া, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। খৃঃ পূঃ ১৮ শতকে হিকশোস জাতি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এদের সংস্কৃতিতে ক্রীট, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মেসপটেমিয়ার মিশ্র সংস্কৃতি দেখা যায়। এরা হিট্টাইট ও মিটান্নীর সঙ্গে ইন্দো-উরেশিয় গোত্র বলে প্রতিপন্ন এবং তাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমপর্য্যায়ের কৃষ্টিসম্পন্ন—যেমন মহামাতৃদেবতার পূজা। হিকশোসদের লক্ষ্য ছিল একটি বিরাট সম্রাজ্য গঠন—এই জন্য তাদের কোন বিশিষ্ট অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় নাই। এদের সঙ্গে যে উর্বরতার কৃষ্টি এবং মাতৃদেবতার উপাসনা এসেছিল, তাহা বিশেষত্বব্যঞ্জক। এই কৃষ্টিতে দেবী মানব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। বিশেষভাবে প্যালেষ্টাইনে নগ্ন মাতৃমূত্তি প্রায়ই দেখা যায়। আর এই নারী মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে জন্তুর প্রতীকের অস্তিত্ব ছিল, যেমন সর্প এবং ঘুঘু। বাবিলনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সাপের সঙ্গে বক্রগতি নদী এবং উর্বরতার প্রতীকের সমবায় আছে। এই প্রকার মূত্তি-ব্যবহার এই সময় ক্রীটে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। হিকসোসদের অধীন প্যালেষ্টাইন আর আদিম ধর্ম্ম আচরণশীল জনহীন দেশ ছিল না। ইহার সঙ্গে বর্হিজগতের পরিচয় প্রভাব এসেছিল। ইহা নিকটবর্ত্তী প্রাচ্যের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং আগেকার চেয়ে তাদের তুলনায় বিশেষ পশ্চাৎপদ অবস্থায় আর ।ছল না। এসিয়া মাইনরে ইন্দোইউরোপীয় আক্রমণ হয় খৃঃ পূঃ বিংশ শতকের প্রথমে। উত্তর সিরিয়ায় আখটানার খনন কার্য্যে জানা যায় যে যে স্থানে পূর্বে হাম্মুরাবির আধিপত্য ছিল, সেখানে হিট্টাইটগণের আধিপত্য দেখা দিল। আলেপ্পোরাজ্য, তাঁরা খৃঃ পূঃ ১৮ শতকের মাঝামাঝি দখল 'করেছিল। সম্ভবতঃ হিটটাইটগণ হিকশোসেদের সমগোত্রীয়। হিটাইটদের সঙ্গে হিকশোসদের আকৃতিগত যোগ ছিল। এদের পরে কাশশাইট অশ্বারোহীদের সঙ্গেও তাই। এদেরও আর্য্যসংশ্রব ছিল। হিকশোসদের

আধিপত্য প্রায় দুইশত বৎসর ছিল। তাদের প্রভাবের বিষয় ক্রীটের নস্‌সস এবং মেসপটেমিয়ার বাগদাদ থেকে জানা যায়। প্যালেষ্টাইনে তাদের অনুপ্রবেশ সুবিস্তৃত ছিল। এদের অবশেষ চিহ্ন গ্যালিলি সাগরের উত্তরে হাজরে এবং উপকূলভাগে আস্‌কেনে, জুডিয়ার পাহাড় তলীতে এবং জেরিকোতে পাওয়া যায়। হিকশোসের পর, আসীরিয় ও মিটান্নীদের উদ্ভব। খৃঃ পূঃ ১৫৮০ শতকে, হিকশোসেদের পরাজয়ের পর, হিট্টাইটগণ দুই শতবৎসর জন্য সিরিয়াতে মিশরের আধিপত্য খর্ব করে রেখেছিল। খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতক থেকে কারকেমিশ নামে এদের মধ্যে একটি নবসমবায়রাষ্ট্র গঠিত হয়। ওল্ডটেষ্টামেণ্ট থেকে জানা যায়—হিব্রনের কাছে—হিট্টাইটদের কাছ থেকে একটি গুহা আব্রাহাম খরিদ করেন এবং ইশাউ তাদের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ডেভিডের একজন বিশ্বাসী সেনা উরিয়া হিট্টাইট ছিলেন।” ২৪ এই উরিয়ার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে ডেভিড তার বিশ্বস্ত কর্মচারীকে হত্যা করে, তার স্ত্রীকে আত্মসাৎ করেন।

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, হিট্টাইট, হিকশোস মিটান্নী প্রভৃতি জাতি আর্য্য গোত্র সম্ভূত। ইহারা সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে উপনিবিষ্ট হয়ে সাম্রাজ্য স্থাপনেই উদ্যোগী হয়েছিল, পরে স্থানীয় আইওনিক, ফিনিশিয়, পারসিক, আসীরিয় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

হিকশোসগণ মিশর জয় করে সেখান খৃষ্টপূর্ব ১৬৮০ শতক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। মিশরের ধর্মে ইতিপূর্ব্বে দেবতা ছিল নগর ও পশু মিশ্রিত বহু আকারের এবং পূজার প্রথা ছিল আদিম সভ্যতার স্তরের। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকের সময় থেকে ভারতের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয়েছে। এই সময়টা ভারতের ধর্ম্মের বিকাশের সময়। উপনিষদ ও সাংখ্যের প্রাথমিক বিকাশকে, ধীরে ধীরে ভারত থেকে ঔপনিবেশিক রাজবংশীয়

২৪ রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড-অব দি বাইবেল, স্কফিল্ড, পৃ ১৫, ১৭।

লোক এবং বণিকের দল, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের পারে ছড়িয়ে দেয়—ইহার ঐতিহাসিক নিদর্শনের অভাব নাই। সিরিয়া এবং লিডিয়া থেকে আসিরিস সংস্কৃতির আগমন, এই হিকসোস, হিট্টাইট এবং মিটান্নী সংস্কৃতিরই ফল। এদের প্রভাবে আখনাতনের সূর্য্য অর্চ্চনা মিশরে প্রবেশ করে। সূর্য্যসংস্কৃতি মিত্রপূজক মিটান্নীদের ছিল এবং তাহদের সঙ্গেই বিবাহসম্বন্ধে তৃতীয় আমেনহোটেপ বদ্ধ হয়েছিলেন। এই মিটান্নী জাতি হিট্টাইট ও হিকশোশের সগোত্র। আর হিকসোসদের মিশরে সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও হিট্টাইটদের সিরিয়া অঞ্চলের উপর প্রভাব এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। মিশরের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগ বহু শতাব্দী ধরে। এই অঞ্চল মিশরের সাম্র্যাজ্য-ভুক্ত হয়েছিল; আবার এই অঞ্চল থেকে আধিপত্য লাভ করার পর, হিকশোসগণ মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আদি বৈদিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিশরের এই ভাবে স্পর্শলাভ হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকেই অসিরিস সংস্কৃতি মিশরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের মত এই। এই অঞ্চলেই শিব ও গৌরী হায়রো পলিসে পূজিত হতেন। মিশরের অশিরিসের নাম ইতিপূর্ব্বে থাক লেও—একথা ঠিক যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, হিকশোস, হিট্টাইট ও মিট্টান্নি সংসর্গের ফলেই হয়েছে। কারণ ফিনিসিয়া অঞ্চলে এই সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি-মাতা ও আদিপিতার অর্চ্চনা শুধু এই হিকশোস, হিট্টাইট জাতির প্রভাবেরই ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে পরে আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই অঞ্চলে ও আর্মেনিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। শিব ও গৌরী মিশরে পরিবর্ত্তিত হয়ে যে অসিরিস ও আইসিস, নামে পুজিত হয়েছেন,—হিট্টাইট তাহা ফিনিসিয়, যাবনিক এবং ক্যালডিয় বণিককুলের দ্বারা। শিব সংস্কৃতির ভারতীয় ধারা প্রথমে নিকট প্রাচ্যে, গ্রীসে, পরে মিশরে আনীত হয়েছে। প্যালেষ্টাইনে মহাকালের মন্দির ছিল—ইহার পরে উল্লেখ করা হবে। আদিমাতা ও আদি পিতার সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার

আদি দান। মহেঞ্জোদারোতে ইহা প্রমাণিত হয়েছে, বৈদিক যুগে ইহা প্রস্ফুটিত ও মুকুলিত। যথাস্থানে ইহার আলোচনা হবে। সূর্য্যসংস্কৃতি ও ভারতীয় আদিবৈদিক সংস্কৃতি—ইহা বৈদিক মিত্রযজ্ঞ। মিত্রপূজক মিটান্নী জাতির কন্যা সম্রাট আখনাতনের জননী। মিশরের সম্রাট আখনাতন একদেববাদী সূর্য্যপূজক। ইনি মিশরের আদিম পুরাকাহিনীর জন্তু ও নরমিশ্রিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইহার বিদ্রোহের ফল ভাল হয় নাই। আদিম সংস্কৃতির ধ্বজাধারী পৌরহিত্য-সমাজ এই সংস্কৃতিকে নষ্ট করে আদিম পূজাপদ্ধতির পুনরাবর্ত্তন করেছিল। কিন্তু নৈতিক ও বিচারমূলক সভ্যতার পতন নাই। ইহুদীয় ও গ্রীসীয় এবং পরবর্ত্তীকালে মিশরীয় চিন্তাধারায় এই বিপ্লবই নৈতিক এবং দার্শনিক ঈশ্বরবাদে পরিণত করেছিল। স্কফিল্ড লিখেছেন, "আখনাতনের জ্ঞানবাদী নৈতিক একদেববাদ প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা, যাহা তার সাম্রাজ্যে সর্ব্বব্যাপী হতে পারতো, তাই বিফল হয়ে গেল, কিন্তু নানাভাবে ইহার প্রভাব থাক্‌ল এবং উহার পরিচয় মোজেসের কাহিনীতে ইহুদীয় যে একদেববাদের প্রথম উৎপত্তির বিষয় দেখা যায়, তাহার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।" ২৫

## কাসসাইট

"আর একটি সূর্য্যপূজক আর্য্যজাতির সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যে পরিচয় হয়। ইহারা কাসসাইট। "খৃঃ পুঃ অষ্টাদশ হইতে একাদশ শতকে কাসসাইট নামক এক আর্য্যজাতি ব্যাবিলেন রাজত্ব করে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য্যদেব (সূর্য্যস্), মারুত্তস ছিলেন বায়ুর দেবতা (সাতমারুত)। ইহারা উত্তরে—মিটান্নী জাতীয় আর্য্যদের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের রাজাদিগের মধ্যে—বারিয়াস, কাষ্টলিয়াস, করইষ্টিস, ইত্যাদি উপাধি বা নাম পাওয়া যায়।"

২৫ প্রাচীন মিশর শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৫৭।

"কাসসাইটরা ছিল মিটান্নী জাতীয়, ব্যাবিলন রাজ্যের যখন বিলুপ্তি ঘটল তখন সুযোগ বুঝে ইহারা ব্যাবিলনে অনুপ্রবেশ করে। ইহারা সবিতৃদেবতাকে সূর্য্য নামে অভিহিত ক'রে পূজা করত। কাসসাইটদের ভারতীয় মারুত ও গ্রীক বোরিয়াস ছিল অন্য দেবতা।"

## ভারতীয় সমুদ্র যাত্রা ও উপনিবেশ

তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, "বাইবেল শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ১৭০৬ খৃঃ পূঃ অব্দে আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন ও ভারতীয় দ্বীপসমূহজাত পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া মিশরে বাণিজ্য করিত। মহাত্মা টাইটলার সাহেব বলেন, খৃষ্ট জন্মিবার একবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ডালমেটীয়েরা, ঊনবিংশতি শত বর্ষ পূর্ব হইতে মিশরীয়েরা, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্বে চীন দেশীয়রা ও ফিনিশিয়ানরা এবং ছয়শত বৎসর পূর্বে আরবীয় ও পারসিকেরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করে।

লিপি আছে যে মগধ দেশীয় প্রদ্যোতন রাজ্যের পুত্র পাল নামক নৃপতি শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করতেন না। তিনি বৌদ্ধগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ম্লেচ্ছদেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী মিশ্র ( বর্ত্তমান ইজিপ্ট ) দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা মিশ্রদেশে শৈবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ( ১ম খণ্ড লঘু ভারত ) পূর্বকালে মিশ্রদেশের লোকের সহিত ভারতবর্ষীয় বণিকগণের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৭০৬ পূঃ খৃঃ অব্দে যখন য়ূসফ মিশরে উপনীত হইয়াছিলেন তখন আরব দেশীয় ইস্‌মালীয় বণিকেরা, তথায় ভারতবর্ষজাত এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধদ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল।" ২৬

"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে হিন্দুরা সুখতর দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্বউপকূলে

২৬ বাইবেল, জেনেসিস ৩৭, ২৯।

সোফার বা সোফাল নামে একটি স্থান আছে। যেমন হিন্দুগণ সুখতর দ্বীপে গিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম রাখিয়াছিল, তেমনি তাহারা আফ্রিকার উপকূলে বসতি করিয়া গুজরাটের সন্নিহিত সুপারের নামানুসারে ঐ স্থানেরনাম সোফার রাখিয়াছিল। সোভার বা সোফাল; সুপার নামেরই অপভ্রাংশ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় ভারতের সঙ্গে মিশরের অত্যন্ত সংযোগ হইয়াছিল। ভারতীয় উৎকৃষ্ট সুখাদ্য সামগ্রীর সম্ভোগ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রাদির দ্বারা মিশরের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্মবিষয়ক মতের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।" ২৭

"মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথোমিস নামা নৃপতি ১৫৯৫ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই রাজার এবং তৎপরবর্ত্তী ফিরোণ নামা 'নৃপতিবর্গের সময়ে মিশরে বৈদুর্য্য মণি প্রভৃতি বিবিধ ভারতীয় রত্ন এবং নীল ও অপরাপর সামগ্রী আনীত হইত।" ২৮

"নোনস নামক মিশরীয় কোন কবি নিজকৃত কাব্য মধ্যে লিখিয়াছে যে হিন্দুদের সমুদ্র গমনে বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। তাহারা স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সমুদ্রযুদ্ধেই বিশেষ পটু এবং তাহাতে তাহাদের বিক্রম অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই কবি খৃষ্টাব্দের ৪র্থ শতকের শেষে অথবা ৫ শতকের প্রথমভাগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।" ২৯

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীন সময়ে হিন্দুগণ আফ্রিকার পূর্বদিকে জোকতর দিই অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে (সকোট্রা) গিয়া বাস করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে কম্বোজ দেশীয় হিন্দুরা অতি পূর্বকাল হইতে সুখতর দ্বীপে বাণিজ্যে গমন করিয়া তথায় বাস করিত। ৩০

২৭ উইলসনস বিষ্ণুপুরাণ, প্রিফেস।
২৮ উইলকিনস্ এনসিয়েন্ট ইজিপ্সিয়ানস্ ভল ৩, পৃঃ ২১৬-২১৭, পৃঃ ১২৩ ১২৫।
২৯ এসিয়াটিক রিসার্চেস, ইজিপ্সিয়ানস চ্যাপ ৪, নোট ৭০।
৩০ এসিয়াটিক রিসার্চেস্ ভল ১৭, পৃ ৬১৯-৬২০।

হিন্দুরা ২৯৪ খৃঃ পূঃ অব্দে আফ্রিকায়, কার্থেজে যাতায়াত করিত এবং তদ্দেশীয় লোকের সহিত যে তাহাদের বিলক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে রহিয়াছে। ২৫১ পূঃ খৃঃ সিসিলি দ্বীপে, রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলবের সাথে কার্থেজীয় সেনাপতি অসদ্রাবলের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে, কার্থেজীয়দের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় ভারতীয় হস্তী ও হস্তীপক ( মাহুত ) মৃত বা ধৃত হয়।

কথিত আছে, কার্থেজীয় লোকেরা যুদ্ধকালে হস্তীপৃষ্ঠে কাষ্ঠময় আমারি স্থাপন করিত। প্রত্যেক হস্তীর উপর ২২ জন করিয়া যোদ্ধা ও একজন হিন্দু মাহুত বসিত, হিন্দুরা ভয়ানক আড়ম্বর ও সজ্জা করিয়া বিপক্ষদলের ভয়োৎপাদন করিত। এক প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অতি নিপুণতা সহকারে স্বকার্য্য সম্পন্ন করিত। ( ইউনিভার্সাল হিষ্টরী, টাইটলার ) মিশর দেশীয় ভূগোল শাস্ত্রবিদ টলেমি বলেন যে সুপার নামে একটি প্রদেশে ভারতের পশ্চিমে গুজরাটের দাক্ষিণস্থ কাম্বে নামে অখাতের তীরে অবস্থিত। এই সুপার প্রদেশ হইতেই ফিনিসীয় বণিকেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, চন্দন, হস্তীদন্ত, বানর ও ময়ুর ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কথিত আছে ইহুদীদের পুস্তকে ঐ সকল দ্রব্য ভারতবর্ষীয় নামেই লিখিত আছে। পরন্তু ফিনিশীয় বণিকেরা ইজরাইল বণিকদের পূর্বেও স্থলপথে ভারতের সাথে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। ন্যূনাধিক ১৮৩৫ বৎসর পূর্বে লিখিত পেরীপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ানসি' গ্রন্থেও ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের বাণিজ্য ব্যাপার বর্ণিত আছে। ঐ সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে, মহাত্মা হীরেন স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে ফিনিসীয় বণিকেরা দুই সহস্র ও বহুকাল পূর্বে ভারত হইতে পূর্বোক্ত পণ্যজাত সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমন করিত। কখনও কখনও আরবীয় বণিকগণ বিশেষতঃ আরবের উত্তরভাগবাসী স্বার্থবাহ বণিকদল, পূর্বোক্ত দ্রব্যজাত ফিনিসীয়ানদের নিকট বিক্রয় করিত। এইরূপে বাইবেলে বর্ণিত

সকল বৃত্তান্তের ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।" ৩১

মিশরের সভ্যতা, সিন্ধু ও সুমেরের সভ্যতার চেয়ে আগেকার নয়। নব্যপ্রস্তর যুগের মানব সমাজের সংস্কৃতিকে সভ্যতা নাম দেওয়ায় ধারাবাহিক সভ্যতার পরিচয় অনেক আগে চলে চায়। ভারতে বা অন্যত্র সেইরূপ প্রস্তরযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। সেইজন্য মনে করা যায় না যে ঐরূপ আদিম যুগের সংস্কৃতি ভারতে ছিল না। বাংলায় মানভূম, হাজারিবাগ বা রাঁচিতে এই যুগের লোকের বাস ছিল। শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন লিখেছেন, "বাংলার সীমান্তে এই প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে রাঁচি জেলায় প্রস্তর নিৰ্ম্মিত শত শত বর্ষাফলক, অস্ত্রতীক্ষ্ণ করিবার যন্ত্র, কুঠার ফলক, ছেদানাস্ত্র, ছুরিকা, মুষল, চক্র প্রভৃতি ও শস্য পেষণের উদুখল আবিষ্কৃত হইয়াছে।" ৩২

## তাম্রযুগের সভ্যতাই—সভ্যতার আরম্ভ।

প্রকৃত পক্ষে সভ্যতা অর্থে সুসংস্কৃত জাতীয়জীবন, শৃঙ্খলিত ধৰ্ম্ম ও নীতিজ্ঞান, পাকাঘর, জলপ্রণালী এই সমস্ত ধরা হয়। এই রকম সভ্যতা খৃঃ পূঃ সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তাম্রযুগেই সম্ভব হয়েছে। যানবাহন, সমুদ্রপোত, আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র,—এই যুগের সভ্যতার দান। এই যুগেই মিশরের পিরামিড নিৰ্ম্মিত হয়। এই পিরামিডের সময়ের আগেই সিন্ধু সভ্যতার উদয় হয়েছে। সিন্ধু যুগের ও পিরামিডের যুগের সভ্যতা—তাম্রযুগের সভ্যতা। প্রভাসচন্দ্র সেন লিখেছেন, "মেনেস বাজপক্ষী গোষ্টির এক রাজা, মিশরে প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (৩৪০০ পুঃ খৃঃ)। গিজোর পিরামিডগুলি নিৰ্ম্মিত হয় চতুর্থ রাজবংশের সময় (২৭০০ পুঃ খৃঃ)। প্যালারমো প্রস্তর ফলকে চিত্রাক্ষরে এই চারিটি রাজবংশের (৩৪০০-২৭০০ পুঃ খৃঃ) বংশাবলী লিখিত আছে। দ্বাদশ

৩১ হীরেনস্ হিষ্টরিকাল রিসার্চ্চ; ফিনিসিয়ানস্ চ্যাপ ৪. এজেকিয়েল—৩৭৫

৩২ বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৩৪।

রাজবংশের পর হিকশোসেরা (১৭৮৮ খৃঃ পুঃ) অশ্ববাহিত রথের সাহায্যে প্রায় সমগ্র মিশর জয় করিয়া, রাজত্ব করে। অষ্টাদশ রাজবংশের পর (১৫৮০ পুঃ খৃঃ) মিশর পুনরায় স্বাধীন হয়। ষড়্‌বিংশ রাজবংশের, (৬৮৩-৫২৫ পূঃ খৃঃ) রাজা থটমশ ফিণিসিয়া, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জয় করেন।”

“মানব জাতির আদিম ধাতব অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, পুজার সামগ্রী ও অলঙ্কায় প্রভৃতি সমস্তই তাম্রনির্ম্মিত। আজিও আমরা পূজায় তাম্রনির্ম্মিত টাট, কোশাকুশি, পুষ্পপাত্র ব্যবহার করি। মিশরের লোকেরা মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহার করিতে শেখে ১৭৯০-৮৯ খৃঃ পূঃ) হিকশোসদের কাছে। কিন্তু গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকার মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়, খৃষ্টের প্রায় পঁয়ত্রিশ শত বৎসর পূর্বে। ইহাই বোধ হয় মৃৎশিল্পে চাকা ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন। তাম্রযুগের সভ্যতা ভারতে যে কেবল সিন্ধুর মহেঞ্জোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হরাপ্পাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বক্সার ও পাটনার কাছে, এবং ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে, (প্রাচীন মাহেশ্বতীপুর) কনৌজ ও উজ্জয়িনীতেও ঐ কালে অনেক মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা নীচের স্তরের একরকম ধূসর রংয়ের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে (১৯৫৬ খৃঃ পৃঃ), যাহা প্রাচীন আর্য্যদের সময়ের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ধরণের মৃৎপাত্র হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ ও মথুরাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটের কাছে ভগত্রবে ও মধ্য ভারতের চম্বল উপত্যকার নাগদাদে ও গুজরাটে এইরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কৌশাম্বীতে (এলাহবাদের ৩২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম যমুনা-তীরস্থ কোশান গ্রামে) খননের ফলে, হরাপ্পার ন্যায় একটী প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেদেও মৃৎপাত্রের উল্লেখ আছে। আমাদের বাংলার মৃৎশিল্প ও সুপ্রাচীন। কিছুদিন হইল অজয়নদীর তীরবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলায়, পাণ্ডু রাজার ঢিবি খননের ফলে,

তাম্রযুগের নিদর্শন বাহির হইয়াছে। তাম্রযুগের আর একটী অবদান চুল্লী, হাপর ও ছাঁচ। তাম্র গলাইবার জন্য চুল্লী ও হাপরের, উৎপত্তি এবং গলিত ধাতুকে ইচ্ছামত আকার দেওয়ার জন্য ছাঁচের উদ্ভব হয়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে আর্য্যজাতিই সর্বাগ্রে লৌহাস্ত্র ও ঐ সকল দ্রুতগামী যানবাহনের অধিকারী হয় এবং তৎসাহায্যে তাম্রযুগের সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে সেকালের বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।"

লৌহ যুগ সুরু হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায় ক্যালডিয় সাম্রাজ্যের সমসাময়িক সময়ে—মিটান্নী শক্তির অভ্যুদয়ের সমসাময়িক কালে। মিটান্নী রাজ ব্যাবিলনে, নবপলসারের পুত্র নেবুকাডনসারের সঙ্গে কন্যাদান সূত্রে, অসিরিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, এই সময়ে কাছাকাছি সময়েই আর্য্যগণের পশ্চিম এশিয়ার সম্প্রসারণ ও উপনিবেশ দ্বারা নানাদিক বিস্তৃতি শুরু। ইহার পূর্বে তাম্রযুগের সভ্যতায় সমস্ত ভারত থেকে আর্য্য অভিযানের বিষয় যথাসময়ে আলোচিত হবে। এখন ইহা মোটামুটি এই উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করা হল মাত্র।

## আর্য্যগণ বহিরাগত নয়।

প্রভাসচন্দ্র সেন, লিখেছেন, "ঋগ্বেদের প্রাচীন সুক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু আর্য্যেরা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণও বেদে পাওয়া যায় না। বরং তাহারা কতিপয় যজ্ঞহীন গোষ্ঠিকে যে ভারতের বাহিরে বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। "অগ্নির যজ্ঞরহিত অল্পক হিংসিতবাক শ্রদ্ধারহিত বৃদ্ধিশূন্য পণিনামক যজ্ঞহীন দস্যুদিগকে বিদূরিত করুন। (ঋগ্বেদ ৬ মণ্ডল ৬১।৩)।

"এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটিনিকায় (১৯২৯ খৃঃ) আর্য্য শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে উহার অর্থ "সম্ভ্রান্ত" এবং কেবলমাত্র

ইণ্ডোইউরোপীয়ানগোষ্ঠীভুক্ত হিন্দু ও ইরাণীগণই নিজদিগকে আর্য্য বলিতে পারে।”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৺অবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহার “ঋগ্বেদিক ইণ্ডিয়া”তে দেখাইয়াছেন, উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা, পূর্বে সরস্বতী, মধ্যে সপ্তসিন্ধু বিধৌত ভূভাগ—ইহাই আর্য্যদের আদি বাসভূমি। আমাদের মতে আর্য্য সংস্কৃতি ভারতের সরস্বতী তীরে উদ্ভূত হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।”

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইরাণীয় আবেস্তা গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন জাতির প্রাচীন সাহিত্যে সেই জাতিকে আর্য্য বলা হয় নাই। পারসিকেরা নিজদিগকে অইর্য্য বলিত। আবেস্তা গ্রন্থে অইর্য্য শব্দের উল্লেখ আছে। মিডাস ( মদ্র ) গোষ্ঠীভুক্ত পারস্য সম্রাট দারাউস তাঁহার যোগসকুই শিলালিপিতে নিজেকে অইর্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।” পূর্বাদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রবর্ণিত জনশ্রুতিমূলক বিবরণ হইতে মনে হয়—ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের অপর পারে ইরাণ, শক, বহ্লীক প্রভৃতি রাজ্য ভারতীয় প্রগতিশীল আর্য্যগণই স্থাপন করিয়াছিল।”

“অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রির মতে ইজিপ্টবাসীগণ মনে করিত যে তাহারা লোহিত সাগরের পরপারের বহুদূরবর্ত্তী “পাণ্ট” নামক দেশ হইতে আসিয়াছে। এই পাণ্টদেশ সম্বন্ধে তাহারা বলে এই দেশ মহাসাগরের উপকূলে পর্বত ও উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। সেখানে হস্তীদন্ত, নানা প্রকার সুগন্ধ মশলা, ধুপ, রত্ন, চিতাবাঘ, নানাপ্রকার বানরের, বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট পক্ষী, চন্দনা ও নারিকেল গাছ সমূহ উৎপন্ন হয়—ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য ও পাণ্ট দেশ অভিন্ন।”

## পণি

"ঋগ্বেদে সরস্বতী তীরস্থ পণি নামক জাতির উল্লেখ আছে। ৬৷৬১৷১ ঋকে বলা হইয়াছে, "এই সরস্বতী বধ্যশ্বকে দিবোদাস নামক পুত্র দিয়াছেন, যিনি আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণিগণকে সংহার করিয়াছেন।" ৬৷২০৷৪ ঋকে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কুৎস হইতে ভীত হইয়া পণিগণ শত শত সৈন্যসহ পলায়ন করিয়াছে।" অনেকে মনে করেন এই পণি জাতিই বাণিজ্যতরীযোগে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হইয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ঋগ্বেদে (৬৷২০৷১২,৬,৪৫৷১) আর্য্যগোষ্ঠীগণের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। ভারতীয় পণিগণের এই উপনিবেশ গ্রীকগণের নিকট ফিনিকিয়া নামে পরিচিত ছিল। পণিগণ সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের পণিক ও বণিক। সংস্কৃতগণ, পণ্য, বিপণি শব্দগুলি এই পণি নামের সহিত সম্বন্ধ সূচক। রোমানগণ এই জাতিকে পণিক বলিতেন। ফিনিকিয়া উপনিবেশটী টায়ার নগর হইতে উত্তরে আরাডম নগর পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৬০ ক্রোশ ও পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর হইতে লেবানন পর্বত পর্য্যন্ত প্রস্থে দশ ক্রোশ ছিল। ফিনিকিয়ার সমুদ্র উপকূলের বালুকা হইতে উত্তম কাচ ও সমুদ্রে এক প্রকার মৎস্য হইতে লাল রং প্রস্তুত হইত। লেবানন পর্ব্বতের খনি হইতে তাম্র ও লৌহ প্রচুর পাওয়া যাইত। এখানকার দেবদারু বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে অর্ণবযান প্রস্তুত হইত। ফিনিকিয়ার প্রধান বন্দর ছিল ছয়টি—যথা আরাসস্, ট্রীপলিস, বাইব্রশ, বেরাইটস, সাইডন ও টায়ার। টায়ার নগর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এই পণি বা পণিগণ ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে আফ্রিকাতে কার্থেজ, উটিকা এবং স্পেন দেশে কেডিজ নামক প্রসিদ্ধ বন্দর স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে পণ্য আমদানী করিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বাজারে বিক্রয় করতঃ অত্যন্ত ধনশালী

ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ইহারা ইউরোপে বর্ণলিপি, মুদ্রার ব্যবহার ও ওজনের পরিমাণ প্রচলিত করিয়াছিল।

"পূর্বোক্ত প্রাচীন লিপি সমূহের বিবরণের সহিত বিষ্ণুপুরাণ ও মনুসংহিতার বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য সূর্য্য, মরুৎ প্রভৃতির উপাসক ভারতীয় প্রগতিশীল আর্য্যগণ ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর ও আইওনিয়া ( যবন দেশ ) পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।"

"কিন্তু আর্য্যসভ্যতা যে ভারতের সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মর্ষি দেশে জন্মলাভ করিয়া মধ্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং তথা হইতে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরেও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহা বলা অসঙ্গত হয় না।"

আর্য্যগণ যে বহিরাগত নয় ইহা নানাভাবে এই গ্রন্থমধ্যে প্রমাণিত করা হয়েছে। এখানে শুধু এক জন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হল।

## ইলসাহেবের মত

"সুপণ্ডিত হল সাহেব নানা প্রমাণ দিয়া এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভারতের দ্রাবিড়গণই প্রাগৈতিহাসিক যুগে—সুমের বাবিলোনও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।" ৩৩

উক্ত তিনটি সভ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যুক্তিমূলক এবং গ্রাহ্য হলেও সভ্যতার দিকনির্ণয়ে উহার যুক্তি অভ্রান্ত নয়। অবশ্য ইহার কারণ পূর্ব্বকালীয় পণ্ডিতবর্গের একদেশদর্শী ভ্রান্তি ও কুসংস্কার যে আর্য্যগণ ভারতের বাহির থেকে আগত এবং মহেঞ্জোদাড়ো সংস্কৃতি ভারতের নিজ হলেও, ঐ সভ্যতা নির্ম্মূল করে আর্য্যসভ্যতা বাহির থেকে এসেছে। ঐ মতটীর প্রতিষ্ঠার কারণ যে ভারততত্ত্বজ্ঞ বৈদেশিকগণের ইণ্ডোইউরোপীয় আর্য্যতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপের আর্য্যতত্ত্ব প্রমাণ করতে হলে "বাহির থেকে আর্য্যআক্রমণ" প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যাহা

৩৩ বাংলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন, পৃঃ ৪৩, ৪২, ৪৪, ৫৪ ও ৫৫।

হউক, হলের সিদ্ধান্ত এই সমস্ত মতকে ভিত্তিহীন করেছে—ইহা কতকটা মঙ্গলের কারণ বটে, কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তটীরও ত্রুটি আছে।

দক্ষিণ ভারত থেকে তামিল ভাষী জাতিগুলির দ্বারা সুমের বাবিলন এবং আসিরিয়ার সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার প্রমাণস্বরূপে বেলুচিস্তানের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র স্থানে ব্রাহুই ভাষা এবং সুমেরে প্রাপ্ত খোদিত চিত্রাঙ্কনের মধ্যে প্রকৃতিসাদৃশ্য এবং মৃৎপাত্রে মৃতদেহ সমাধি দেওয়া প্রভৃতি প্রথা থেকেই ঐ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আর একটী প্রমাণ করোটির মাপের দ্বারা অনুমান।

এই কয়টী প্রমাণই যথেষ্ট নয়। মাথার খুলির মাপ যা, মহেঞ্জো-দাড়োতে পাওয়া গিয়াছে তাতে অন্যান্য প্রকার জাতিবাচক মাপের করোটীও পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং দাক্ষিণাত্য সভ্যতার কথায় এই প্রমাণ ঐ পক্ষে একান্ত নির্ভরযোগ্য নয় আর ঐ নৃতাত্ত্বিক মাপের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আধুনিক নূতন গবেষণা দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে এবং উহাকে জাতিতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণরূপে ধরা যায় না। আমেরিকার বোয়াস প্রভৃতি পণ্ডিতের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে নাক, রং, চুল, মাথা প্রভৃতির মাপ স্থান, ঋতু এবং পরিবেশের পরিবর্ত্তনের ফলে পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে।

বেলুচিস্থানের ব্রাহুই ভাষা দাক্ষিণাত্যে তামিলাদি ভাষাভাষী লোকের ভাষা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। লৌহযুগের প্রারম্ভে বাবিলনে ভূমধ্যসাগরের বণিকগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাগরোপকূলের ব্যবসার সম্বন্ধ ছিল, এই বিষয় বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এ ব্যবসা পরবর্তীকালে মিশরী গ্রীক, ও ফিনিসিয়দের দ্বারা পরিচালিত হত। এই সূত্রেই পারস্যসাগরের তীরে, লোহিত সাগরের কূলে, মিশরে এবং ভূমধ্যসাগরে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ হয়েছে; তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; ইহা যথাসময়ে উল্লেখ করা হবে। এই সমস্ত বণিকরাই ভারতীয় সংস্কৃতি—পারস্যসাগর, লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর তীরে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার

দক্ষিণদেশীয় লোকেরা এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল যে পারস্যসাগর তীরে বেলুচিস্থানের নিকটে উপনিবিষ্ট হবে, আর তাঁদের ভাষার চিহ্ন যে সেখানে পাওয়া যাবে—তাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? পক্ষান্তরে সুমের সভ্যতা বৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠ, ইউফ্রেটীস নদীর তীরে অবস্থিত বহু উত্তরে এবং একটী ক্ষুদ্র স্থানে উপনিবিষ্ট নয়। ইহার দ্বারা তামিল প্রভাব প্রমাণ করা যায় না। বিশেষতঃ দ্রাবিড় সভ্যতাকে মনুসংহিতায় বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির সভ্যতা বলা হয়েছে; ইহার অর্থ, দ্রাবিড় জাতি আর্য্যজাতিরই বহির্মুখী (অন্তরঙ্গ নয়) ব্রাত্য শাখা। আর্য্যসভ্যতা একটী ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সভ্যতা নয়—ইহার মূল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাবর্ত্ত হতে পারে কিন্তু ইহার সংস্কৃতি ও সভ্যতাপুষ্ট সমাজকে আর্য্য বলে স্বীকার না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাথা ও নাকের মাপের সীমায় এই সংস্কৃতি বা সভ্যতাকে সীমাবদ্ধ করতে হলে মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বৈদিক সভ্যতাকে এই ব্রহ্মর্ষিদেশের সীমার মধ্যে ফেললে রং, চুল, উচ্চতা, মাথার মাপ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তারপর সুমের ও মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সাদৃশ্যের এত আধিক্য যে এই দুইটীকে পরস্পর সম্বন্ধে যুক্ত না বলে পারা যায় না। সমুদ্র যাত্রার কথা বাদ দিলেও এই সভ্যতাকে সম্বন্ধযুক্ত করতে হলে পদব্রজেও উষ্ট্র এবং শকটাদিতে যোগাযোগ ছিল বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে দেখা গিয়েছে যে এদের মধ্যে স্থলবাহী কতকগুলি জিনিষের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, উহা সামুদ্রিক হতে পারে না। এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। পরন্তু, মেদ প্রভৃতি স্থানে বৈদিকদের স্থলপথেই যোগাযোগ ছিল, এমনকি, বৈবাহিক সম্বন্ধও ছিল, বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণে ইহার উল্লেখ যথেষ্ট আছে। মৃৎপাত্র ও খোদিত চিত্রে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে দাক্ষিণাত্যের চেয়ে উত্তর ভারতের উত্তরাপথের সংস্কৃতির সাদৃশ্যই প্রমাণিত হয়। দ্রাবিড়

সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন নয়, ইহাও যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

তারপর সামাজিক স্তর বিচারে, সুমের ও মহেঞ্জোদাড়ো পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের পরিচয় দান করে। দ্রাবিড় সমাজে ছিল মাতার কুল। দ্রাবিড় সভ্যতাও বৈদিক সভ্যতা থেকে প্রাচীনতর নয় দ্রাবিড়জাতি বৈদিক কালের পূর্ব্বে সর্ব্ববিষয়ে বৈদিকদের সমকক্ষ ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় উত্তর ভারত থেকেই ঋষিকুল ও রাজন্যবর্গ, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহন করে নিয়ে গিয়েছে। বৈদিক যুগ যে সুমের ও মহেঞ্জোদাড়ের যুগের পরবর্ত্তী কালের—তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই জন্মদাতা। বহির্বেষ্টনীর সভ্যতাও এই সভ্যতা থেকে বিভিন্ন নয়, তবে ইহার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতি মিশ্রণে উন্নততর ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতের বাহিরে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে অন্যান্য মিশ্র সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। সুমের সংস্কৃতি,—সিন্ধু সভ্যতার শাখা এবং বৈদিক সভ্যতাও সিন্ধুসভ্যতারই ক্রমবিকাশ—এই সমস্ত বিষয় পরবর্ত্তী আলোচনায় যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। মৃৎপাত্রে শবের সমাধি দেওয়ার প্রথা, যাহা দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, উহা সভ্যতার দিক নির্দ্দেশ করে না। উহার অস্তিত্ব সিন্ধুসভ্যতায় পাওয়া গিয়াছে; তবে সিন্ধুসভ্যতাকে যেমন সভ্যতা বলা যায়; দাক্ষিণাত্যে বৈদিক যুগের সমসাময়িক কালে সিন্ধুসভ্যতার সমকক্ষ কোন সভ্যতার খবর পাওয়া যায় নাই। বৈদিক সভ্যতা দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় সভ্যতার চেয়ে অনেক পুরাতন। বৈদিক সভ্যতাতেও মৃৎপাত্রে শবসমাধি প্রচলিত ছিল, ইহা যথাস্থানে আলোচিত হবে। মৃৎপাত্রের শব সমাধি হলেই উহা সভ্যতা বলে বিবেচিত হয় না উহা প্রাচীন আদিম সংস্কৃতির পরিচয়।

# পারসিক সভ্যতা

## ঐতিহাসিক যুগের সাক্ষ্য

এবার পারস্যের বিষয় ধরা যাক্।

মিশরের বেলায় যাহা দেখা গেল, পারস্যের বেলায় আরও প্রমাণ হবে যে ভারত থেকেই ঈশ্বরতত্ত্ব তথা ব্রহ্মতত্ত্ব বাহিরে গিয়েছে, ভারত এ বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পায় নাই। পারসীরা আর্য্যগোষ্ঠী সমুদ্ভূত। "প্রবল পরাক্রান্ত আসিরিয়ার ধ্বংসকারী মিডিসদের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অসুররাজ তৃতীয় সলেমানেসারের একটী শিলালিপিতে। সেখানে তিনি খুর্দীস্থানের পার্ব্বত্য অঞ্চলের পারশুয়া নামে একটী দেশে যুদ্ধ পরিচালনার কথা বলেছেন। ( খৃঃ পূঃ ৮৩৭ ) তখন সেখানে ছিল ২৭ জন সর্দ্দার কর্তৃক শাসিত ২৭টী জনবিরল রাষ্ট্র। অধিবাসীদের নাম আফদাই, মাদাই, মিডিস" । ৩৪

"সারগনের রাজত্বকালে (খৃঃপূঃ ৭২২-৭০৫) ইরাণের অন্য একটি দেশের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে দেশ মিডিয়া। মিডিয়ার শাসক ও অধিবাসীরা ছিল আর্য্যজাতি; ইতিহাসের মঞ্চে ইরাণী আর্য্যদের এই প্রথম আবির্ভাব। উরারুতুরাজ (আর্মনিয়া) রুসাসকে সাহায্যদানের অভিযোগে সারগন, মিডিয়া আক্রমণ করেন এবং ইহার শাসক দারায়ূকে বন্দীকরে সপরিবারে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই সময় বহুসংখ্যক মিডিয়ান দলপতি সারগনের বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর আসিরিয়ার প্রতাপ অনেক-খানি খর্ব্ব হয়ে পড়ে ছিল।"

পরবর্ত্তী আসিরিয়াধিপ সামসি আদাদের ( ৮২৩-৮২০ পূঃ খৃঃ ) একটি বর্ণনায় বারশত সহরের মালিক জনৈক ইরাণী সর্দ্দারের পরাজয়ের বিষয় বলা হয়েছে। তখন সেদেশ ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। সুরক্ষিত নগরসমূহে অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ছিল, দুহাজার

৩৪ ইরাণের ইতিকথা, শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬, ৫৪ ও ৫৬

কি তিন হাজার। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ জাতিগুলিকে রেখেছিল খর্ব্ব করে। তার পর যখন এইসব সামন্তরাষ্ট্র প্রতিবেশী পরাক্রান্ত রাষ্ট্র উরারুতুর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হল, তখন সেই অজুহাতে ঘন ঘন আক্রমণ চালাতে আসিরিয়া কখনও দ্বিধা করেনি। হিরোডোটামের বিবরণে মিডিয়ার বুসায়, পারদ-সেনা, ম্যাগি প্রভৃতি কয়েকটী উপজাতির কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এই উপজাতিগুলির মিলন ও ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলির ঐকীকরণের ফলে মিডিয়াদের একটী জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল—প্রধানতঃ আসীরিয়ায় আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য। এই নূতন রাজ্যের শাসকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দারিয়কৃকু ( গ্রীকনাম দেইওকিস)" উক্ত উদ্ধৃতির আলোচনায় দেখা যায় যে খৃষ্ট পূঃ ৮৩৭ অব্দের পূর্ব্বে অক্সাস উপত্যকার মিদিস, ইরাণ, বাহ্লিকে শক প্রভৃতি জাতি বিশেষ-ভাবে উল্লেখ যোগ্য ছিল না। ইহাদের অবস্থা তখন কতকটা নূতন উপনিবেশকারীর অবস্থা। এই প্রথমাবস্থা হলেও ইহারা সিন্ধু-সভ্যতার ভারতীয় জাতিরই মানুষ এবং ভারতীয় বৈদিক সভ্যতাই এদের সংস্কৃতি ছিল। এরা পষ্টতই আর্য্য এবং তৎকালীন উচ্চ বৈদিক সভ্যতারই উত্তরাধিকারী।

"খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ থেকে ১২৫০ অব্দের মধ্যে পশ্চিম এসিয়ায়, এইরূপ বৈদিক কৃষ্টিধারী অনেক উপজাতি মেসোপোটিমিয়া, বাবিলন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে আধিপত্যলাভ করেছিল, তাদের অনেকগুলির নাম—হিকশোস্ মিটান্নি, কাসসাইট, মিদিস পারসী প্রভৃতি জাতি। এরা ছিল বৈদিক আর্য্যদের গোত্রসমুদ্ভুত। মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারের পর, ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। এমনকি, সুমেরীয় সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর পণ্ডিতদের অনেকের মত এই যে—সুমেরীয় সভ্যতা ভারত থেকেই উপনিবিষ্ট। ভূগর্ভখননের ফলে এখানে যা' যা' জিনিষ পাওয়া গিয়েছে, তাহার নমুনা সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের অনুরূপ ;

অথচ এখনকার আবিষ্কারগুলি, যাহা সুমেরের নিজস্ব, তাহা সিন্ধুসভ্যতায় পাওয়া যায় নাই। এইভাবে বৈদিক নাবিকগণ সমস্ত ইউফ্রেটিস উপত্যকা শাসনের অধিকার পেয়েছিল, বহু কালের জন্য। এই অঞ্চলের হিন্দু রাজত্বগুলি প্রচলিত রেখেছিল। এইভাবে যখন প্রাচীনকালে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত ছিল, শুধু ভারতবাসীই জাগ্রত ছিল। আর তারা বিদেশে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তাদের সংস্কৃতি দান করেছিল আর রাজ্যস্থাপন করেছিল, যাহার দ্বারা তারা ঐ সমস্ত দেশ শাসন করেছিল।"৩৫

## ভারতের সংস্কৃতি বিস্তারের বৈদেশিক সাক্ষ্য

উপরের উক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিম এসিয়ায় বহু বিস্তৃত স্থান ব্যাপ্ত করেছিল। "গ্রীক ঐতিহাসিক এরিয়ান বলেন, ভারতবর্ষের সীমানা—উত্তরে তরাস পর্বতমালা, উহা সাইলেসিয়া, লাইসিয়া, পাম্ফেলিয়া প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল"। তরাসগিরিশ্রেণী—এশিয়া মহাদেশের তুরস্করাজ্যে অবস্থিত। তরাস হইতে ককেশাস এবং ককেশাস পর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের উত্তর পর্য্যন্ত, আরিয়ানের মতে ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। তাহা হইলে, আরব, পারস্য, তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্য এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত—আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান সহ, ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভবপর। চীন, পারসীক, পারদ, দরদ, হূণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের সীমানার সন্নিকটে বাস করিত। ঐতিহাসিক টলেমির মতে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানা মধ্য এসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান এবং টলেমির সীমানা নির্দেশকে বর্ত্তমান সূক্ষ্ম গবেষণা মনে করা না গেলেও, উহা ভুল নয়। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সময়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঐ পর্য্যন্ত হয়েছিল।

---

৩৫ (সুমেরীয়ার হিন্দু রাজত্ব; স্বামী শংকরানন্দ পৃঃ ৬৮)

## বৈদিক ও পারসিক সংস্কৃতি

"বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকল্পিত, জেন্দ আবেস্তার অন্তর্গত বর্হম মহৎ অংশ তদ্রূপ বেরেথ্রগ্নর স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। এই জন্যই বেদের ইন্দ্রকে এবং জেন্দ আবেস্তার বেরেথ্রগ্নকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মতান্তরে দেখা যায়, ব্যাবিলন নগরে সেমিটিক জাতীয় এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র, ঘোর যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সেই হইতেই বৃত্রাসুরবধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। পারসীকগণের জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থে উক্ত ঘটনার আভাষ পাওয়া যায়।" দেবরাজ ইন্দ্রের পর যে সকল নরপতির প্রসঙ্গ বেদে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রাজা সুদাস সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি—সম্পন্ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—রাজা সুদাস সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সুদাসের এই বীরত্ব বর্ণনা, ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে রাজা সুদাস দশজন স্বাধীন নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া বেদে উল্লেখিত আছে। রাজা সুদাস একটী যুদ্ধে ষষ্টিসহস্রাধিক সৈন্য ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন। বীরবর কুৎস, দস্যুগণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন। ইন্দ্রের এক দিনের যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচলক্ষ শত্রু সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়।"[৩৬]

"ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন, "জোরষ্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী পারসিকগণ আপনাদের আর্য্যনাম অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আভেস্তায় আর্য্যধর্মেরই অংশ বিশেষ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।" অধ্যাপক হীরেন বলেন, "প্রকৃত কথা কহিতে গেলে জেন্দভাষা সংস্কৃতভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" মনুসংহিতায়

৩৬ (ভারতবর্ষঃ প্রথম খণ্ডঃ পৃঃ ২৩,২৪, ৫৪, ৫৫ ও ৫৭, দুর্গাদাস লাহিড়ী।

পারসিকগণকে হিন্দুগণেরই অংশ, ক্ষত্রিয় বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ আছে। কাউণ্ট জোনস্ জাম্মণা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "যে দেশ হইতে পারসিকগণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে দেশ প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ, আফগানিস্থান ও কাশ্মীর ভিন্ন অন্য দেশ হওয়া সম্ভবপর নহে।

ডাক্তার হোঁগ সিদ্ধান্ত করেন, "আমরা বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাখা প্রশাখার পরস্পর বিবাদের ফলে প্রাচীন কালে এই ধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কর্ণেল টড্ প্রাচীন মিডিয়া রাজ্যের অভ্যুদয় বিষয়েও এবম্বিধ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন অজমেধের পাঁচ পুত্র ছিল। দুই পুত্র ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পিতৃস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের পদবী মেধ এবং তাঁহাদের বাসস্থানের নাম মেধদেশ হইয়াছিল। সেই মেধদেশ হইতে ক্রমে মিডিয়া নামের উৎপত্তি হয়।" ৩৭

## ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লিক

"ব্যাকট্রিয়া নামে আর এক প্রাচীনতম রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, ঐ রাজ্য হিন্দুকুশ-পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। তাঁহাদের মতে— ব্যাকট্রিয়া আর্য্যগণের বা ইন্দো ইউরোপীয়গণের আদিভূত। ইতিহাসে যে ব্যাকট্রিয়গণের পরিচয় পাওয়া যায়, মিডীয় ও পারসিকগণের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল এবং জেন্দভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা ছিল। অনেকে অনুমান করেন—ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী ব্যাকট্রিয়া জারিয়াস্পা হইতেই পারসিকগণের অভ্যুদয় হয়। ঐ নগর বহুদিন পর্য্যন্ত ম্যাগি নামক মিডীয়দের একটী সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। ঐ নগর এসিয়া মহাদেশে স্থলপথে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের

৩৭ (ভারতবর্ষঃ দুর্গাদাস লাহিড়ী, তৃতীয় খণ্ডঃ পৃঃ ১৯, ২০।)

উপর বর্ত্তমান কালে বাল্‌খ নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—পরবর্ত্তী কালের ব্যাকৃট্রিয়া নামক জনপদই পুরাণবর্ণিত প্রাচীন •বাহ্লিক রাজ্য। বহুপূর্ব্বে ব্যাকট্রিয়ায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, মুদ্রায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।" ৩৮

## পারসিক ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "মহারতু জরাথুষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পশ্চিম পারস্যে, তেহারাণের নিকট রজিনগরে। পুরাণে প্রসিদ্ধ সম্রাট নহুষের ভ্রাতার নাম ছিল রজি। নহুষ পারস্য দেশে রাজত্ব করিতেন। তাই তিনি ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতেন। এই রজিই হয়তো রজিনগর স্থাপন করিয়াছিলেন। জরোথুষ্ট্রের তপস্যার স্থান আরও পশ্চিমোত্তরে কাশ্যপ সমুদ্রের পশ্চিম আজরবাজান ( আর্য্যবীজ ) প্রদেশে। বহ্লীকের অধিপতি সম্রাট বিষ্টাস্প তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। মহারতু জরথুষ্ট্র বহ্লীকেই প্রথমে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন এবং পরিণত বয়সে বহ্লীকেই দেহরক্ষা করেন। পেশোয়ার হইতে বহ্লীকের দূরত্ব মাত্র তিন চার কিলোমিটার। ইরাণ দেশ, ( ইলাবৃতবর্ষ ) তিনটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল—পার্থব ( পার্থিয়া ) পর্শ্ব ( পার্শিয়া ) এবং মাধ্য ( মিদিয়া )। বেদে এই তিনটী প্রদেশেরই উল্লেখ আছে। ( ঋগ্বেদ ৮-৬-৪৬ ১-১০৫-৮ ) * * পার্থব, পর্শ্ব ও মাধ্য—এই তিনটী দেশের মধ্যে পর্শ্বই প্রধান বলিয়া সমগ্র দেশের নামক্রমে হইল পর্শ্ব। ভারতীয়েরা বলিতেন পর্শ্ব আর ইরানীয়েরা বলিতেন পার্স। বিহিস্তান লিপিতে দেশটী পার্স নামে উল্লেখ করা আছে। এই পার্স শব্দ কালক্রমে পারস এবং পারস্যে পরিণত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সম্রাট নহুষ এবং তার পুত্র যবাতি

৩৮ পৃথিবীর ইতিহাস ভারতবর্ষ, —দ্বিতীয় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬ ও ৩৭, দুর্গাদাস লাহিড়ী।

পারস্য দেশে রাজ্য করিতেন ( ব্যানার্জি শাস্ত্রী—অসুর ইণ্ডিয়া পৃ ৮৭ ) পুরুরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর ছিল আফগানিস্থানে ( উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বেদ প্রবেশিকা—পৃ ১৬ )। ঋগ্বেদে ( ৭-১৮-৭ ) পাঠানদিগকে পক্থ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই পাখতুনিস্থান নামের মূল ইতিহাস। রামায়ণ হইতে জানিতে পারি ভরতের মাতুলালয় ছিল কেকয় দেশ অর্থাৎ ককেশাস পর্বতের নিকটবর্ত্তী আর্মেনিয়ায়। দশরথের মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে ভরতকে নিয়া আসিবার জন্য যে আমাত্যগণ কেকয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের বহ্লীক অতিক্রম করিয়া আরও অনেক উত্তর পশ্চিমে যাইতে হইয়াছিল। ( বৈদ্য—ভেদিক ইণ্ডিয়া পৃঃ ২৯৪ )। কিন্তু আমরা এখন এমন কুপমণ্ডুক হইয়াছি যে ভারতের বাহিরেও বৈদিক আর্য্যগণ বাস করিতেন,—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিনা এমন দিন ছিল যখন এসিয়া মাইনরের অর্ধেকটা গ্রীক আর্য্য দ্বারা অপর অর্দ্ধেক পারসিক আর্য্যদ্বারা অধ্যুষিত ছিল (ওয়েলস—এ সর্ট হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ল্ড, চ্যাপটার ২৩ এবং ২৪ ) এবং তাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। ঐতিহাসিকদের পিতৃস্থানীয় গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসের বাড়ী ছিল এসিয়া মাইনরে। বৈদিক সংস্কৃতি তখন ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের যুগে নকুল সহদেবের মাতুল শল্যকে তো মহাবীর কর্ণ, আচারবর্জিত শূদ্র দেশের রাজা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। বেদে উল্লিখিত মাধ্যদেশ মদ্র নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাদ্রী যখন পাণ্ডুর সহিত সহমরণে চিতা আরোহন করেন, তখন কুন্তী তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া ছিলেন,

'ধন্যা ত্বমসি বাহ্লিকী মত্তো ভাগ্যতরা তথা।"

মাদ্রীকে বাহ্লীকী বলিয়া সম্বোধন করায় বুঝা যায় মদ্র এবং বাহ্লীক সংলগ্ন প্রদেশ। পাণ্ডবগণ বিরাটের দেশে আত্মগোপনের সময় যখন অস্ত্র শস্ত্র লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, তখন নকুল, শমীবৃক্ষে একটি মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিলেন,

'কুলধর্ম্মো অয়ং অস্মামকম্ পূর্বৈরাচারিতোঽপিচ।"

ইহাকে কুলধর্ম্ম বলিবার হেতু এই যে ইহা নকুল সহদেবের মাতুলদেশের প্রথা। পার্শীরা মৃতদেহ দাহ করে না, কিম্বা করব দেয় না—কোন উচ্চস্থানে রাখিয়া দেয়, যাহাতে পক্ষীদের ভোগে লাগে। মহাত্মা বিদুরও পারস্য দেশে বিবাহ করেছিলেন তাঁহার পত্নীকে মহাভারত তো স্পষ্ট ভাষায় পারসবী কন্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গান্ধারী তো কান্দাহারের কন্যা তাহাতে সংশয় নাই। জগতের আদিম বৈয়াকবণিক মহাত্মা পাণিণির বাসস্থান ছিল শালাতুর গ্রামে। শালাতুর গ্রাম আফগানিস্থানে অবস্থিত। মহাভারতে বর্ণিত ঘটনার সময় পর্য্যন্ত হিন্দু ও পার্শীতে কোন সামাজিক প্রভেদ ছিল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুরুগণ হীনবল হইয়া পড়িল। নাগরাজগণ তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুর আক্রমণ করিল। কুরুরাজ পরীক্ষিত তাঁহাদের হস্তে নিহত হইলেন। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় নাগদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কুরুদের আর হস্তিনাপুরে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। কুরুবংশের একটী শাখা হস্তিনাপুর হইতে তিনশত মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়া কৌশাম্বীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিল ( প্যাজিটার, এ্যা, হিঃ টাঃ পৃঃ ২৮৫ )। অপর একটী শাখা পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া পারস্যে পার্শীপোলিস ( পার্সীপুর ) নগরে রাজধানী স্থাপন করিল। এই বংশের সুবিখ্যাত সম্রাট নবকুরুকে ইতিহাসকারগণ ঐতিহাসিক কালের প্রথম সম্রাট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ( ওয়েলস, এ সর্ট হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ল্ড পৃ ৭৬ )। গ্রীকগণ বলিতেন সাইরাস, কিন্তু পারস্যের শিলালিপিতে তাহার নাম কুরু এবং হিব্রু সাহিত্যে "কোরেস"। সম্রাট কুরু, এসিয়া মাইনরস্থ গ্রীকরাজা ক্রোশাসকে পরাভূত করিয়া সমগ্র এশিয়া মাইনর দখল করিয়া লন।

পরে তিনি কালদিয়ার রাজা বেলথেসরকে পরাভূত করেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৩৮ অব্দে সম্রাট কুরু বেলথসরের পুত্র নবনীদাসকে পরাজয়

করিয়া সমগ্র ব্যাবিলন সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। কুরুর পুত্র কম্বেশ মিশর দেশকেও নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। সম্রাট কুরুর নাম বাইবেলেও শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত আছে। * * * ইহা খৃঃ পৃঃ ৫৫৪ সনের কথা। ইতিহাসকারগণ খৃঃ পৃঃ পঞ্চদশ শতককে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক হাজার বৎসর পরে কুরুবংশের গৌরব পুনরায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাহা ভারতবর্ষে নহে—পারস্যে। নবকুরুর সুযোগ্য অধিকারী সম্রাট দর্য্যবাহু ( দেরিয়াস ), বিজয়গৌরব খ্যাপন করিয়া বলিতেছেন, "অজেম দর্য্যবাহু, ক্ষত্তিয়ো বজ্রক, ক্ষত্তিয়ো ক্ষত্তিয়ানাম, ক্ষত্তিয়ো দহনাম।" অর্থাৎ আমি দর্য্যবাহু, প্রধান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয়, সকল দেশের ক্ষত্রিয়। দুঃখের বিষয় একজন দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাটের পক্ষে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী—ভারত ও ইরাণের ঐক্য সূচনায় যে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ—কোনও ইতিহাস লেখক আমাদিগকে তাহা খুলিয়া বলেন না। এই শিলালিপি হইতে মনে হয়, পারস্যের কথিতভাষা তখন সংস্কৃতের অনুরূপই ছিল। দর্যবাহুর রাজত্বকালে পারস্যের সীমানা পূর্ব্বে সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" ৩৯

"দেবগণের সাধারণ সংজ্ঞা বিষয়ে পারসিকগণের ও হিন্দুগণের মধ্যে বিপরীত শব্দ প্রচারিত থাকিলেও উপাস্য দেবতার নাম দু'এক স্থল ভিন্ন উভয়ত্রই অপরিবর্ত্তিত। পারসিকদের কয়েকটী দেবতার নাম—ঐর্য্যমান, মিত্র, বেরেথ্রঘ্ন, বঘ, অতর ও নর্য্যসংহ, এবং যিম প্রভৃতি।

পারসিকদের প্রধান উপাস্য দেবতা অগ্নি। তাঁহারা অগ্নিদেবতাকে অতর বলিতেন অথবা অগ্নি দেবতাকে নর্য্যসিংহ বলিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ সূক্তে বহু নামে অগ্নিদেবতাকে আহ্বান

---

৩৯ ( গাথা, যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় পৃ ১৮৵৹, ১৮৶৹, ২৲, ২৵৹, ২৶৹, ২৷৹, ২৷৹, )

করিয়া তাহার উপাসনা হইয়াছে। অগ্নিদেবের সেই নাম—সুসমিদ্ধ, তনুনপাৎ, নরাশংস, ইহা, বর্হিঃ, দেবীদ্বার, নক্ত, উষা, হোতারো, স্বরস্বতী, মহী, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহা। এই সকল নামের নরাশংস অর্থাৎ মানব প্রশংসিত নামটী, জেন্দ আবেস্তায় নর্য্যসিংহ নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে আবার বুঝা যায়, যিনি অহুরমজদা, তিনিই অগ্নি, তিনিই নর্য্যসিংহ। কি ভাবে অগ্নি দেবতার স্তুতি জেন্দ আবেস্তায় লিখিত আছে, তাহার একটু বাদানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"আমি অহুরো মজদার পুত্র—অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নর্য্যসিংহকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। একই অগ্নিদেবতা, প্রায়ই একই প্রকার যজ্ঞাহুতির প্রণালী, কিন্তু দেবতার নাম রূপান্তরিত। ঋগ্বেদের প্রথমেই আছে—যজ্ঞে অগ্নিকে প্রধান স্থান প্রদান করা হইয়াছে এবং তিনি পুরোহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অগ্নির ন্যায় বায়ু দেবতার উপাসনা আর্য্য হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পারসিকগণও সে উপাসনা অনুসরণ করিয়াছিলেন। পারসিকদিগের জেন্দাবেস্তার বায়ুর নিকটতম প্রার্থনার এবং বর প্রদানের বিষয় যাহাতে লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, "এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি। বীর্য্যবান আর্য্যকুলের উত্তরাধিকারী থ্রেতেয়ন (থ্রৈতন) চতুস্কোণ বরণ প্রদেশে (বরুণ প্রদেশে) একটী সুবর্ণ সিংহাসনে যজ্ঞ প্রদান করিলেন। তিনি তাহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "হে উর্দ্ধচারী বায়ু, আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন মুখ্ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে (অহিদহককে) পরাস্ত করিতে পারি। উর্দ্ধবিহারী বায়ু তাহাতে সৃষ্টি কর্ত্তা অহুর মজদার প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন। জেন্দ আবেস্তায় মিত্র ও বরুণের উপাসনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে আহার কিয়দংশের অনুবাদ, "অহুর মজদা স্পিতম জরাথুষ্ট্রকে কহিলেন, "আমি যখন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি

মিথ্রকে সৃষ্টি করি, হে স্পিতমা, আমি তাহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনায় যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমরা মিথ্রকে যজ্ঞ প্রদান করি। তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের আধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে। তাঁহার দশ সহস্র চক্ষু আছে; তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে, তিনি বলবান। তিনি অনিদ্র চিরজাগরূক। বরুণ, জেন্দ আবেস্তায় বরণ নামে অভিহিত। তাঁহার বিষয় জেন্দ আবেস্তার লিখিত আছে, "আমি অহুরো মজদা—যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরণ তাঁহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। সেই দেশের জন্য থ্রেতন (ত্রৈতন) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অজিদহককে হত করিয়াছিলেন।"

মিত্র ও বরুণের বিষয় জেন্দ অবস্তায় লিখিত আছে। তাহা আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, বেদে মিত্র ও বরুণকে অনেকস্থলে একত্র আহ্বান করা হইয়াছে—এমন কি, সমস্ত ঋগ্বেদের একটি সুক্তে কেবল মিত্রকে পৃথকরূপে অর্চনা করা হইয়াছে। ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক আবস্তায় দেখা যায় যে ইরাণীয়দের ঈশ্বর অহুরোমজদার সহিত অনেক স্থলেই মিত্রের নাম সংযোজিত। ঋগ্বেদেও বরুণকে প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লেখের ত্রুটি নাই। ইরাণীয়দের এই সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ বলেন ইরাণীদের মধ্যে প্রধান দেব, অহুরমজদা এই বরুণের প্রতিরূপ"। ৪০

প্রভাসচন্দ্র সেন লিখেছেন, মধ্যদেশের উত্তরে হিমবানের অপর পারে অবস্থিত উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্রগণ, সম্ভবতঃ প্রাচীন ইরাণী ও প্রাচীন মিডাস বা মিডিয়াবাসী। পাণিনির "পার্শ্বাদি যৌধয়াদিভ্যঃ" (৫।৩।১৭) সূত্রে যে পর্শু জাতির কথা আছে, উহারাই পার্শী জাতি। উত্তরকুরু ইরাণী ও উত্তর মদ্র (মিডিয়াগণের) মিশ্রণে বোধ হয় পার্শী জাতি সংগঠিত হইয়াছে।" ৪১

৪০ (ভারতবর্ষ, তৃতীয়খণ্ড দুর্গাদাস লাহিড়ী; পৃঃ ২৯, ৩০, ৩১)।
৪১ (বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৪৮)।

মহাভারতে ( ভীষ্মপর্ব্ব, ৭।১২ ) বলা হইয়াছে, "তীক্ষ্ণ ঠোঁট-বিশিষ্ট ভারুণ্ডা নামক মহাবল শকুন সমূহ উত্তর কুরুদের মৃতদেহ হরণ করিয়া গুহায় নিক্ষেপ করে। এতদ্বারা পার্শীদের মৃতদেহ পক্ষী দ্বারা ভক্ষণ করাইবার যে রীতি আছে তাহা সমর্থিত হইতেছে।"

"মনুসংহিতায় ( ১০।৪৫ ) উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শূদ্রবর্ণেরা—ক্রিয়া লোপাদি দ্বারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হ'য়। আর্য্যভাষীই হউক আর না হউক, উহারা দস্যু অ্যাখ্যা পাইয়া থাকে। এতদ্বারা মনে হয়,মধ্য দেশীয় আর্য্যগণের মধ্যে প্রগতিশীল দল, মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, উভয় দিকে সমুদ্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহাদের মধ্যে মধ্য দেশের সদাচারে শিথিলতা আসিল, ভাষা—বিশুদ্ধতা হারাইয়া অপভাষায় পরিণত হইল। ক্রিয়া লোপাদি হেতু ও অপভাষা ব্যবহারের জন্য তাহারা মধ্যদেশের রক্ষণশীলগণের নিকট বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এই রক্ষণশীলগণ নিজ দিগকে সুর বা দেব ও প্রগতিশীল এবং বাহ্যজাতিগণকে অসুর বা দস্যু আর প্রগতিশীলগণের কথিত অপভাষাকে ( অপভ্রংশকে )—ম্লেচ্ছভাষা বলিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক সাহিত্যে ( শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪।৩৪ ), তাহারা উভয়েই প্রজাপতির সন্তান।" তাঁহারা পরস্পরকে ভ্রাতব্য বলিতেন। প্রথমে অঙ্গিরা ঋষি, তৎপরে অথর্ব্ব ঋষি ও তৎপুত্র দধিচি—অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তন করিলেন। দেব ও অসুর উভয়েই সেই অগ্নিযজ্ঞে যোগ দিতেন। শেষে যজ্ঞকারী বলিলেই কেবল দেবগণকেই বুঝাইত। একদা দেবশব্দের ন্যায় অসুর শব্দও শ্রদ্ধাবাচক ছিল। ইন্দ্র ( ১।৫৪।৩ ), বরুণ ( ১।২৪।১৪ ), সবিতা ( ১।৩৪।১০ ), মরুৎ ( ১।৬৪।২ ), ত্বষ্টা ( ২।১১।৩ ), ইহাদের সকলেরই ঋগ্বেদে সম্মান সূচক অসুর উপাধি দৃষ্ট হয়। যতদিন দেবাসুরে সদ্ভাব ছিল, ততদিন অসুরদের মর্য্যাদা ছিল, পরে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধ চলিত। রুদ্র ছিলেন "মহান অসুর" ( অহুর মজদা ঋগ্বেদে আছে, "ত্বমগ্নে রুদ্র অসুরোমহো, ঋগ্বেদ, ১।১।৬।৬মঃ ১৬ ১১৪—২৪ )।

"মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে, ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপহেতু পৌণ্ড্র, ওড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ (ক্যাম্বোডিয়া), যবন (আইওনিয়া), পাণ্ডয়া (পার্শ), শক (সিথিয়া), পারদ (পার্থিয়া), পহ্লব (পারস্য), চীন (ইন্দোচীন), কিরাত (হিমালয়), দরদ (দর্দ্দিস্থান) ও খস (হিমাচল) দেশগত ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত (বেদাচারহীন) বাহ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাহ্য জাতিতে পরিণত হইলে, তাহারা আর্য্যভাষীই হউক অথবা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, দস্যু বলিয়া পরিগণিত হয়।"

আর্য্যদের যে শাখা পারস্যে গমন করিয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র নামে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রাজাদের মধ্যে কুরু (সাইরাস) নাম দৃষ্ট হয়। তাহারা যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আবেস্তা নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আবেস্তার একটি ভাগের নাম যশ্ন (যজ্ঞ)। দ্বিতীয় ভাগের নাম গাথা, তৃতীয় ভাগের নাম ভেন্দিদাদ। ভেন্দিদাদে অহুরমজদা ও জরাথুষ্ট্রের মধ্যে প্রশ্নোত্তরগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থ ভাগের নাম যশত (ইষ্ট)। ইহাতে হব্য ও স্তুতি নিবেদন দ্বারা পূজাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে।" "ভেন্দিদাদে (২।২২) অহুরমজদা ইরাণীদের আদিপুরুষ যিমকে বিবংঘতের পুত্র বলিয়াছেন। তাহাদের আদি বাসস্থান আরিয়ানো বিজোকে দৈত্যানদী তীরস্থ (১।৩) বলা হইয়াছে। দৈত্যানদী কি দৃষদ্বতী ও আরিয়ানা বীজো কি আয্যাবর্ত্ত? ঋগ্বেদে (১০ম ১৪ সুক্ত) যম ও মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলা হইয়াছে। বিবংঘত = বিবস্বত (সূর্য্য ও যিম = যম হইলে, ইরাণীদের পূর্ব্ব পুরুষ যম ও হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষ মনু পরস্পর ভ্রাতা হইতেছে)" ৪২

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "ভারতীয় আর্য্যদের বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় ইরাণীদেরও যজ্ঞ—প্রথা ছিল। যজ্ঞের সামগ্রীর মধ্যে প্রধান—অগ্নি। যজ্ঞের সহিত পুরোহিতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেজন্য জরাথুষ্ট্র

৪২, বাংলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন, পৃঃ ৫৭, ৫৩।

ধর্ম্ম, উৎপত্তির সময় থেকে পুরোহিতের বংশ চলে আসছে'। অথর্ব বেদের ক্ষেত্রেও যে একই রূপ—তা আমরা আগের আলোচনাতেই দেখে এসেছি। বৈদিক যাগের চারটী প্রধান ভাগ হ'ল—হোম, ইষ্টি, সোম ও পশুযাগ ( তার মধ্যে সোম যাগের সঙ্গে জরথুষ্ট্র ধর্ম্মের হওম ভাগের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বৈদিক যজ্ঞে আহুতি পুরোডাশের অনুরূপ পার্শীদের দারুণ নামে পবিত্র রুটী ও পশুমাংস অর্পণ। এই দুই ধর্ম্মের যজ্ঞে একটী প্রধান পার্থক্য এই যে বৈদিক যজ্ঞে সমস্ত আহুতি আগুনে দেওয়া হয়, কিন্তু পার্শীধর্ম্মে আগুনে কোন কিছু দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ আগুন চিরশুদ্ধ। সোম যাগে তিনটী সবন হয়—প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। সবনের অর্থ সোমরস ছেঁচে বার করা। পার্শীদের সবন দিনে মাত্র দুবার হয়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে। সোমের আলোচনার দিক দিয়েও বেদ ও অবস্তার যথেষ্ট মিল আছে। যজ্ঞ আরম্ভ করার আগে, ঋত্বিকেরা এবং যজমানেরা বলেন—'যে যজামহে' অর্থাৎ আমরা যজ্ঞ করছি। একে যজ্ঞের 'আগূ' বলে। পার্শীদেরও প্রার্থনা মধ্যে, বারবারই একই অর্থে 'যজামাইদা' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।" ৪৩

মৃত সৎকারের প্রথায়, দুই ধর্ম্মে প্রভেদ আছে। পার্শীদের মৃত দেহ অগ্নিদ্বারা দাহ করেনা, তাঁহারা নির্দ্দিষ্টস্থানে রেখে দেয়, সেখানে পাখীরা শব আহার করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার উৎপত্তি এই বিশ্বাস হইতেই হয়েছে ;—অগ্নিতে মৃতদেহ দাহ করলে, অগ্নি অশুদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক এই কারণেই অগ্নিতে পশু বলি দেওয়া পশুমাংস আহুতি দেওয়া হয় না।

বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন প্রথা আছে, পার্শীদেরও অনুরূপ প্রথা আছে।

শ্রীযোগীরাজ বসু লিখেছেন, "মাজদীয় ধর্ম্মের সংস্কাররাজির মধ্যে উপনয়ন, বিবাহ ও মৃত দেহসৎকার এই তিনটিই প্রধান। ভারতীয় আর্য্যগণের উপনয়নসংস্কারের তুল্যই তাদের নওজোত সংস্কার।

৪৩ অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি ; নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পৃঃ ১৯৫, ১১১।

উপনয়ন সংস্কার কালে যেমন বালকের দ্বিতীয় জন্ম হয়, তদ্রূপ জরথুষ্ট্রীয় বালকের এই সংস্কার কালে নওজোত (নবজাত) অর্থাৎ নবজন্ম হয়। সাত থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই বালকের সদ্‌রা ও কশতী নামক পবিত্র সূত্রে নওজোত সংস্কার হয়। মেষলোম থেকে প্রস্তুত ৭২টী পশমে বোনা মেখলাকে কস্‌তী বলা হয়। স্মৃতি গ্রন্থে দ্বিজাতির যে মৌলী বন্ধনের কথা আছে, কশতী ও তদ্রূপ। কটি দেশে তিন পাক দিয়ে ইহা ধারণ করার বির্ধি। কশতির তিনটী পাক দিয়ে ইহা ধারণ করার বিধি। কশতীর তিনটী পাক এই ধর্ম্মের পবিত্রতায় তিনটী মূল কথা—সৎবাক্য, সদ্‌চিন্তা ও সৎকর্ম্মের স্মারক।" ৪৪

পারসিকদের দেবার্চ্চানা সম্বন্ধে হেরোডোটাস লিখেছেন; "পারসিকদের যে সকল আচার, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই, "ইহারা গ্রীক দিগের ন্যায় দেবদেবীদিগকে মানুষের স্বভাবসম্পন্ন মনে করে না; সেইজন্য ইহারা দেবতাদের কোন মূর্ত্তি গড়ে না কিম্বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না। সেইজন্য ইহারা যখন দেবতাদের পূজা দিতে যায়, তখন কোন উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে। আকাশ মণ্ডলকে তারা জুপিটার বলে, তাহা ছাড়া তারা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ুকে পূজা দেয়। এই সব দেবতাদের পূজা তাহারা পুরাকাল হইতে করিয়া আসিতেছে। পরবর্ত্তী কালে তাহারা আসিরীয়দের নিকট শিখিয়া উরেনিয়া দেবীর পূজা আরম্ভ করে। এই দেবীকে আসীরিয়রা মীলিটা নামে পূজা করিত, আরবীয়রা শুধু আলিটা নামে করে। পারসিকেরা তাঁহার নাম দিয়াছে মিত্র। এই সকল দেবদেবীকে তাহারা, এই ভাবে পূজা দেয়। কোন দেবী নাই, অগ্নি জ্বালায় না, বংশীবাদন নাই। যবের রুটী, জল—এসব কিছুই দেয় না, কেবল বলির পশুটিকে লইয়া আসিয়া একটি পবিত্র স্থানে রাখা হয় এবং যজমান, দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে। শুধু নিজের মঙ্গল নহে, রাজা এবং সমস্ত

৪৪, জরাথুষ্ট্র ধর্ম্ম, ক্ষেত্রীরাজ বসু পৃঃ ৩৩-৩৪।

পারস্য দেশবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হয়। তারপর বলির পশু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়, তাহার পর মাংস রান্না করিয়া নরম তৃণের উপর রাখা হয় তখন একজন ম্যাগি (পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পুরোহিত উপস্থিত থাকা চাইই। অল্পকাল পরেই যজমান মাংস লইয়া যায় এবং তাহা লইয়া যাহা খুশী করে। রাস্তায় দেখা হইলে ইহারা পরস্পরের মুখ চুম্বন করে, গুরুজনকে দেখিলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।" ৪৫

হেরোডোটাসের বর্ণনা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। তবে ভাষার তাৎপর্য্য নিয়ে বুঝতে হবে। জুপিটার পূজা—ইহা বেরেথ্রগ্ন পূজা' ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। আর মিত্র পূজা ইহা তাদের নিজস্ব। ইনি প্রাচীন বৈদিক দেবতা। হেরোডোটাস, বিদেশী ও বিধর্ম্মী। আসিরীয়দের ও আরবদেয় সূর্য্যদেবতা স্ত্রীরূপী ছিল। হেরোডোটাস এই অনুমানে পারসী মিত্রদেবতা অর্থাৎ সূর্য্যদেবতাকে তাদের ঋণকরা আমদানী উরেনীয়া দেবী বলে মনে করেছেন। ভিতরের খবর অবশ্য হেরোডোটাসের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই।

সাধারণতঃ, প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মে দেবতার কোন রূপ বা আকার ছিল না—মূর্ত্তি ছিল না। প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের দেবতা মন্ত্রাত্মক। মন্ত্রকেই দেবতাজ্ঞানে যজ্ঞে হবন করা হ'ত। তাঁদের গুণ ও কার্য্যকে স্মরণ করে প্রার্থনা জানান হ'ত। পার্শীদের ও এই এক প্রথাই প্রমাণিত হচ্ছে। যজ্ঞের বিষয়ে কথা এই যে—হেরোডোটাস নিশ্চয় তাদের দেশে যেয়ে তাদের প্রার্থনাগৃহ দেখেন নাই। এই প্রার্থনাগৃহে বা অগ্নিমন্দিরে তাহাদের যজ্ঞ করা হত। সেখানে বেদী, সমিধ, অগ্নি, এবং 'দারুণ' ও পশু মাংস নিবেদন করা দেখতে পাওয়া যেত। ইনি হয়তো কোন প্রবাসী পারসিকের অর্চ্চনা দেখে থাকবেন, তাই তাঁর বর্ণনা, সেই হিসাবে মিথ্যা হবে না।

৪৫ প্রাচীন পরিচয়, বীরেন্দ্রকুমার বসু, পৃঃ ৭৩ ৮৷

## পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, পার্শিদিগের যাহা বেদ তাহার নাম ছান্দ উপস্থা (জেন্দ আবেস্তা)। আবেস্তা গ্রন্থও বেদের মত চারিখণ্ডে বিভক্ত। যস্ন, যস্ত, বিশ্বরতু এবং বিদৈবদাত। যস্ন—মন্ত্রের, যস্তে—উপাখ্যানের, বিশ্বরতুতে—স্তোত্রের এবং বিদৈব-দাতে—বিধিনিষেধের প্রাধান্য। ইহাদের মধ্যে যস্নই মুখ্য গ্রন্থ। ভাব ও ভাষায় উপস্থাগ্রন্থ বেদের সমকক্ষ। ভাষার সাদৃশ্য এত প্রকট যে যস্নসংহিতাকে অথর্ব বেদের অপরার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করিলে, তাহা অসঙ্গত হয় না। অথর্ববেদের অপর নাম ভৃগু—আঙ্গিরসী সংহিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ-১-৩-৪ ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ইহার প্রথম ভাগ (অর্থাৎ ভৃগু খণ্ড) অসুরদিগের পুরোহিত মহর্ষি ভৃগুর ভাব ধারার বাহক। এবং ইহার দ্বিতীয়ভাগ (অর্থাৎ আঙ্গিরস খণ্ড) দেবদিগের পুরোহিত—মহর্ষি অঙ্গিরসের (বৃহস্পতির) ভাবধারার বাহক। উপস্থা গ্রন্থেই যখন আমরা মহর্ষি ভৃগুসমর্থিত অসুরোপো-সনার সন্ধান পাই, তখন উপস্থাকেই অথর্ব্ববেদের ভার্গব খণ্ড মনে করা সমীচীন নহে কি? বেদের অপর নাম ছন্দস্। অতএব ছন্দস এবং ছন্দ তুল্যার্থক; অর্থাৎ ছন্দ শব্দের অর্থও বেদ। উপস্থা শব্দের অর্থ মন্ত্র। পাণিনি "উপান্ মন্ত্রকরণে" (১-৩-২৫) এই সূত্র দ্বারা উপস্থাপদ সিদ্ধ করেছেন। ছান্দ উপস্থার অর্থ বৈদিক মন্ত্র।

সম্পাদক অমিয় চরণ মজুমদারই—যতীন চট্টোপাধ্যায়ের এই মত সমর্থন করেছেন। "ঋগ্বেদের যুগে পরমেশ্বরকে দেব ও অসুর এই উভয় বিশেষণেই বিশেষিত করা হইত। অর্থ যাহাই থাকুক—একদল লোক পরমেশ্বরকে দেব বলিতে ভাল বাসিতেন এবং অপর দল তাঁহাকে অসুর বলিতে ভাল বাসিতেন। রুচিভেদ হইতে বুদ্ধিভেদ জন্মিল, মতান্তরক্রমে মতান্তরে পর্য্যবসিত হইল। দেবপূজকগণ অসুর

৪৬ (শ্রীমতিলাল দাশ; ভারত সংস্কৃতি; বেদ ও আবেস্তা পৃঃ ৫৫)।

শব্দের কদর্থ করিলেন, বলিলেন অসুর বলিতে বুঝা যায় দানব বা রাক্ষস। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে একদিন দেব এবং অসুর এই উভয় শব্দই সমান সম্মানসূচক ছিল। ঋগ্বেদ, দেব এবং অসুর এই উভয় বিশেষণকেই স্তুত্যর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন (৫-৪২-১১°)। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, রুদ্র প্রভৃতি যে কোন নামেই পরমেশ্বরকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সকলকে অসুর বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে। একটী ঋকে দেখিতে পাই (৫-৪২-১১) পরমেশ্বকে যুগপৎ দেব এবং অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমেই বিভেদ বাড়িতে লাগিল। ভার্গব বেদ অর্থাৎ উপস্থায় আমরা দেখিতে পাই বলা হইতেছে, "নাইসিমো দএবো অর্থাৎ দেবদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি। আঙ্গিরস বেদ বলিতেছেন, "যস্যাঃ দেবাঃ অসুরান্ অভ্যবর্ত্তয়ন্" (১২-১-৫) 'যে প্রদেশে দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন।"

বেদ ও আবেস্তার ভাষার সাদৃশ্য অনস্বীকার্য্য।

বেদ এবং আবেস্তার ভাষার সুপ্রাচীনতম রূপের সঙ্গে বেদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ খুব বেশী—শব্দ সম্ভার, বাক্য, ছন্দ, এবং কাব্যের বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়েই ইহা এত ঘনিষ্ট যে শুধু ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে নিয়মের প্রয়োগ ফলেই দেখা যায় যে আবেস্তার সমস্ত রচনা বৈদিক আকৃতিতে শুধু রূপেই নয়, কবিত্বের ভাবে, শুদ্ধরূপেই পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে। (ম্যাকডোনেল, বৈদিক মাইথোলজি পৃ ৭)।"

উপরে উক্ত উদ্ধৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে, পারস্য দেশের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ও পারস্যের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তা মূলতঃ এক; বৈদিক দেবতা ও আবেস্তার দেবতা এক। ভারতের বহু দেববাদের মতনই পারস্যের বহুদেববাদ। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সকল দেবতাই পরমেশ্বরের বিভূতি বা প্রকাশ। এই পরমেশ্বর বাদই ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষে। ধর্ম্মমতে পার্থক্য হওয়ার

৪৭, গাথা, যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ।৶, ॥০, ॥৵ ও ॥৶

পূর্ব্বে ভারতীয় ও পারসী দুই মতই ছিল পরমেশ্বরবাদের অন্তর্ভুক্ত বহুদেববাদী। তারপর ধর্ম্মপ্রচার, অন্তর্বিপ্লব, মতবিরোধ, রাজনৈতিক অপরাধেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক—ভারত সীমান্ত থেকে ক্ষত্রিয় রাজন্যেরা বা সর্দ্দাররা বাহিরে পশু, পার্থিয়া, সিরিয়া, মদ্র, এশিয়ামাইনর, গ্রীস ও ইথিওপিয়া প্রভৃতিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। এ বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি এবং পরে করব। এই যুগটী ছিল ভারতীয়দের বিস্তারের যুগ—ব্যবসা, বানিজ্য বা অন্যান্য কারণে ভারতীয়েরা অন্যান্য স্থানে—যেমন, শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, যব, বলি, সিংহল দ্বীপেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এখানেও তাই হয়েছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য—সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ঔপনিবেশিকেরা যে দেশে উপনিবিষ্ট হয়, সেই দেশের অনেক প্রথাই গ্রহণ করে। তাহাদের মূলপ্রথার সঙ্গে আপোষ করে, নূতন করে, মূল ভিত্তি সূত্রেই নূতনতর সংস্কৃতির উদ্ভব করে। এই নূতন সংস্কৃতি মূলসংস্কৃতি থেকে অন্যগতি লাভ করে। ভারতে হেনোথিজম বা একেশ্বরবাদ মূলক—বহুদেববাদ ছিল। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ শতকের পূর্ব্বেই ব্রহ্মবাদে রূপায়ণ লাভ করে। ইহা আমরা চারি বেদ; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করতে পারি। এই সময়টী ছিল বিস্তারের যুগ।

ক্ষত্রশক্তি ও বৈশ্য শক্তিই বহির্বিকাশের মুখপাত্র। ব্রাহ্মণ্য শক্তি অন্তর্ব্বিকাশের মুখপাত্র। অন্তর্বিকাশের ফলে বিদ্যা, দর্শন, ব্যক্তিগত ঐশ্বরিক শক্তি, যোগ, মোক্ষবিদ্যা প্রভৃতিই বিকশিত হয়ে থাকে। ভারতে পরবর্ত্তী যুগে এইগুলি চিন্তাতীত রূপে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। বহির্বিকাশের ফল—সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আনুষঙ্গিক বিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য, নানাপ্রকার জাগতিক বিজ্ঞান।

এই বিকাশের যুগে—ব্রহ্মবাদ উদ্ভবের ফলে অন্তর্মুখী ব্রহ্মবাদী ঋষিদের বিদ্যাও অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। এই বিদ্যা প্রধানতঃ ঋষি ও তাঁহাদের বংশধর এবং মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়ের আয়ত্তাধীন হয়।

ক্রমশঃ সমাজ ও অন্তর্মুখী হয়ে বহির্বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। এই সূত্রে শুরু হয় ভৃগু ও বৃহস্পতি, অসুর এবং সুরের বিরোধ। প্রবৃত্তিমার্গী ও নিবৃত্তিমার্গী, দেবযানী ও কচ। পৌরাণিক রূপক এই ইতিহাসের রূপায়ণ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যাঁরা বিরোধী—সেই বৈদিকগণ ভারত ছেড়ে বাইরে উপনিবিষ্ট হলেন। এরাই বহির্ভারতের আর্য্য ভাষাভাষী আর্য্যগণ এবং তাদেরই সংস্কৃতিপুষ্ট অন্যান্য জাতিগণ। এদের ভাষারই শব্দ গ্রহণ করেছেন অন্যান্য হীনসংস্কৃতিবিশিষ্ট এসিয়া, ইউরোপ ও মিশরের বর্ত্তমান জাতিগুলির পূর্ব্ব পুরুষেরা। ইহাদের মধ্যে ভাষার শব্দ মিল দেখে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেছেন, এরা ইন্দো-ইউরোপীয় এবং এঁরা এসেছিলেন এসিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়া থেকে—আরও কত কি বলেছেন, তার হিসাব দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু মধ্য এসিয়ার নানাস্থানে গিরিলিপি, শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভূখননের ফলে, আবিষ্কারের তথ্যগুলি এই পণ্ডিতগণের ভ্রান্তির কুয়াসা দূর করে দিচ্ছে। যথাস্থানে এবিষয়ে আলোচিত হবে।

পারসীকেরা বৈদিক অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী প্রবৃত্তিমার্গী। এরা নিবৃত্তিমার্গী পরিণত ব্রাহ্মণ্যবাদ আয়ত্ত করে ছন্দোবদ্ধ করে নিতে পারছিল না, সেই জন্য বিরোধের ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে এবং অনতিবিলম্বে দেখা গেল—খাস ভারতে যারা থাকল—তাদের প্রতিক্রিয়া। উপনিষদের মধ্যেই ফলকামী যাজ্ঞিকদের বিস্তর নিন্দা করা হয়েছে। যজ্ঞও দেবপূজা এবং আস্তিকতার বিরুদ্ধে চলল অবিরাম বিরোধ। ফলে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে আজীবিক, নাস্তিক প্রভৃতি অনেক মতবাদের উদ্ভব হোল। বুদ্ধ ও পার্শ্ব-নাথের বিরাট বিদ্রোহে, যজ্ঞকাণ্ড তথা ফল কামনামূলক যজ্ঞক্রিয়া একদিন ভারতে লোপ পেতে বসল। দর্শনশাস্ত্রগুলির উদ্ভব হল। পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত বাদ দিলেও অন্যান্যগুলি, যেমন সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়,—প্রায় সকলেই বৈদিক মন্ত্রবাদের

বিরুদ্ধেই মত ঘোষণা করলেন। বৈদিক মন্ত্রবাদ বা সংহিতাভাগই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের, তথা—ব্রহ্মর্ষিদেশের আশ্রয়। বেদকে প্রকাশ্যে স্বীকার করলেও অন্তর্নিহিত সাধনাধারায় মন্ত্রবাদকে এরা অস্বীকার করেছেন। ব্রহ্মবাদে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্বস্বীকার করেও জগৎ বা প্রকৃতিকে অস্বীকার করলে, বৈদিক মন্ত্রবাদ থাকে না। ব্যক্ত শক্তিকে অস্বীকার করলে শব্দশক্তি থাকে না, প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য, পাতঞ্জলের সাধন পন্থা মন্ত্রবাদের তত্ত্বানুযায়ী নয়; ইহাদের মন্ত্রনিষ্ঠা ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখা মাত্র। এবিষয়ে প্রসঙ্গান্তর হয়ে যাচ্ছে—সুতরাং যথাস্থানে আলোচিত হবে। নিবৃত্তিমার্গ, সংহিতার মান্ত্রিক বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী—প্রবৃত্তিমার্গ, ক্ষত্রধর্ম্মী বৈদিক ধর্ম্মই জরাথুষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত প্রবৃত্তিমার্গী পারসিক ধর্ম্ম। স্মরণাতীতকালের বৈদিক ধর্ম্ম, যাহা বেদের মন্ত্রে প্রকাশিত, তাহাতে বর্ণভেদ, নিবৃত্তিপরায়ণতা এবং সন্ন্যাস, বিশেষ আবশ্যক বলে গণ্য ছিল না। সেখানে উভয় ধর্ম্মই এক। উহাই স্মরণাতীত কালের বৈদিক ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং অধিকারানুযায়ী মোক্ষসাধনার বিষয় ছিল। তখন ছিল বিস্তারের যুগ।

জরাথুষ্ট্র বর্ণভেদ মানলেন না, মূর্ত্তিপূজা নিন্দা করলেন, প্রবৃত্তি বেছে নিলেন। অধ্যাত্ম ও অমৃতাদি লাভ, বিষয় বাসনা থাকতেই হবে, ইহা ধর্ম্মের শুভ মূল বলে ঘোষণা করলেন, কর্ম্মবর্জন নিন্দা করে কর্ম্মই গ্রহণ করলেন। মূল বৈদিক ধর্ম্মে ইহা আচরণীয় বলে গৃহীত হলেও, পরিণত বৈদিক ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের বেলায় এই মত নিন্দনীয়।

জেন্দাবেস্তার মধ্যে যশ্ন অংশে জরাথুষ্ট্র রচিত সতেরটী অধ্যায়ের নাম গাথা। ঐ গাথা থেকে জরাথুষ্ট্র ঋষির বাণীর কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি: চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবাদ।

(১) সুক্ত ৪০-৭

হে মজদা' প্রজ্ঞা শুনুক, হে অসুর, তুমি নিজেও শোন,

ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের কি গুরুত্ব? যিনি ক্ষত্রিয়ের সহায়তা করেন, তিনিই যথার্থ সমাজ রক্ষক।

(২) সুক্ত ৪৮-১০

হে মজদা, নরের নর কবে আমাতে আবিষ্ট হইবেন? কবে আমি এই মঘ হইতে মূর্ত্তিপূজা দূর করিতে পারিব? যে মূর্ত্তিপূজা তামসিক কল্পপন্থীগণ উদ্ভাবন করিয়াছে, আর যে কাজ কেবল দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগেরই যোগ্য।

(৩) সুক্ত ৪৪-১৮

হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া কেমনে অশ্বসহ দশটি অশ্বা ও একটি উষ্ট্র ইত্যাদি বর প্রার্থনা করিতে পারি, কেননা, বিষয় বাসনা পরিত্যাগই অধ্যাত্মতার ও অমৃতাতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভের উপায় বলিয়া কথিত হয়।

(৪) সুক্ত ৩৪-১০

সুধীগণ প্রবৃত্তি মার্গকেই প্রজ্ঞার বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুণ্য অরমতিকে (শ্রদ্ধা) ধর্ম্মের শুভ মূল বলিয়া জানি। অহুর, এই সকল তোমার ক্ষেত্রের (অনপেক্ষার) সঙ্গে গ্রথিত।

(৫) সুক্ত ৪৮-১৬

আমি জরাথুষ্ট্রের যাহা প্রিয়তম অভিলাষ—যিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া যথার্থভাবে তাহা আচরণ করেন, তিনি পুরস্কার স্বরূপ অধিআত্মা এবং মনোজ্ঞ জগৎ উভয়ই পাইবেন। হে মজদা, তুমি সর্ব্বজ্ঞ—তুমি বলিয়া দিলে এই প্রত্যয় দৃঢ় হইবে।

(৬) সুক্ত ৩১-১০

কর্ম্মগ্রহণ ও কর্ম্ম বর্জন—এই দুইয়ের মধ্যে তোমরা কর্ম্ম

গ্রহণকেই বাছিয়া নিও। কারণ কর্ম্মই তার প্রভাবের হেতু। কর্ম্মই শক্তিমান্ ধর্ম্মময় আর প্রজ্ঞার বিকাশক। হে মজদা, ছলনাপরায়ণ, (কর্ম্ম না করিয়া ফললাভেচ্ছু) কর্ম্মত্যাগী কখনও শাস্ত্র হইতে কোন ফল লাভ করিতে পারে না।

জরাথুষ্ট্র স্পষ্টতঃ সন্ন্যাসের বিরোধী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে, পূর্ব্বে ইহাদের সঙ্গে বৈদিক ব্রহ্মবাদ এই সাধনা গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখন তিনি মোক্ষকে একেবারে বাদ দিচ্ছেন। মোক্ষটী সন্ন্যাসের প্রশ্নে জড়িত ছিল, জরাথুষ্ট্র উহা চিরতরে বাদ দিলেন। মোক্ষ বাদ দিলেও, তিনি যজ্ঞবাদ ও মন্ত্রবাদ রাখলেন। এই মন্ত্রসাধনাও পরিণত বৈদিক ব্রহ্মবাদের মত, জপ ধ্যানের মাধ্যমে নয়, তিনি এ বিষয়ে ৩১-১১ সুক্তে বলেছেন।

সুক্তে ৩১-১১

শুভ সত্বগুণের কর্ম্মও বচন দ্বারা ধর্ম্ম যাহাকে জানিতে পারে, আমি স্তব প্রণাম করিতে করিতে—সেই অহুর মজদাকে বরণ করিব, চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিব, তারপর সেই ব্রহ্মকে সঙ্গীতের নিলয়ে অর্চ্চনা করিব। ৪৮

## অর্থার্থীভক্ত—দ্বৈতবাদ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাঁহার সাধন মার্গই হচ্ছে সদ্‌গুণ যুক্ত কর্ম্ম ও বচন, প্রণাম, প্রার্থনা সাহায্যে চিন্তার মাধ্যমে তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন। আর সঙ্গীত দ্বারা তাঁর পূজা। এই সব কটি উপায় হ'ল মনের মাধ্যমে এবং মনের সাহায্যে। ইহাকে অর্থার্থীর ভক্তিযোগ বলে।

এই অর্থার্থী ভক্তিযোগেই ছিল পশ্চিম এসিয়ার সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। ইহা ছিল সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার।

---

৪৮ গাথা, যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,

## প্রাচীন প্যারসিক জাতির বর্ণ বিভাগ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের বিভাগ, ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এই বর্ণবিভাগ ভারতের নিজস্ব, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। বেদে যে বর্ণ বিভাগের কথা দেখিতে পওয়া যায়, জেন্দ৷ বেস্তায় যেইরূপ বর্ণ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। জেন্দাবেস্তায় চারিবর্ণের নাম যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শূদ্র নহে, কিন্তু একই অর্থজ্ঞাপক। সেই বর্ণ চতুষ্টয়ের নাম, (১) অথর্ব্ব অর্থাৎ পুরোহিত, (২) রথেষ্টন অর্থাৎ যোদ্ধা, (৩) ভস্ত্রী রোক্ষি অর্থাৎ কৃষিজীবী, (৪) হুইটম অর্থাৎ শ্রমজীবী। জেন্দাবেস্তার প্রসিদ্ধ অনুবাদক অধ্যাপক ডারমেষ্টেড লিখিয়া গিয়াছেন, "জেন্দাবেস্তার বর্ণবিভাগের বিষয় আলোচনা করিলে, উহাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বর্ণবিভাগোর অনুসরণ বলিয়া স্পষ্টতা মনে হয়। ভারতবর্ষে দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়) উপবীত ধারণে অধিকারী। প্রাচীন পারসিকগণেরও প্রথমোক্ত তিন বর্ণ—অথর্ব, রথেষ্টন এবং ভস্ত্রী রোক্ষিরা প্রকারান্তরে উপবীত গ্রহণ করিতেন। ভেন্দিদাদে জরাথুষ্ট্রের সহিত অহুরামজদের যে কথোপকথন দৃষ্ট হয় তাহাতে প্রকাশ—যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুষ্টিধারণ না করে, গাথা উচ্চারণে বিরত থাকে এবং সলিলের প্রতি সম্মান না করে—তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জরাথুষ্ট্রের নিজের বংশেও বর্ণ বিভাগ ছিল এবং তিনি নিজে অন্য বর্ণের আবশ্যকতা বাদ দিয়ে, শুধু ক্ষত্রিয় বর্ণের আবশ্যকতার কথা প্রচার করার ফলেই সম্ভবতঃ, তাহাকে স্বগৃহবাস ত্যাগ করে বাহ্লীকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়েছিল।

## পারসিক জাতির জন্মান্তরবাদ

জরাথুষ্ট্র কর্ম্মফলবাদ নিন্দা করে প্রকারান্তরে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ বাদ দিয়ে নূতন সমাজ গঠন করেছিলেন—একথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন পারসিকগণের জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ ছিল। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "আত্মার অধিনশ্বরত্ব এবং জন্মান্তরবাদ—অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল—আর্য্য হিন্দুদিগের অনুকরণেই ইরাণীয়গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হয়। ইরাণীদের হোশাং গ্রন্থে লিখিত আছে, "পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার নূতন দেহ-পরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী।" এখানে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্যক্‌রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কর্ম্মানুসারে মনুষ্য যে বিশেষ বিশেষ লোক প্রাপ্ত হয় যে কথাও ইরাণীয়দের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে। নামনিহাফাদ গ্রন্থে দেখিতে পাই, প্রত্যেক মানুষ—আপনার জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে স্বর্গে ও নক্ষত্রলোকে স্থানলাভ করেন এবং সর্ব্বদা বাস করিতে সমর্থ হয়। যদি পৃথিবীতে পুনরায় যাইতে অভিলাষী হয়, কর্ম্মানুসারে তিনি রাজা, মন্ত্রী, শাসনকর্ত্তা বা ধনবান হইতে পারেন। ধর্ম্মপ্রচারক বাশাদাবাদ বলিয়া গিয়াছেন—"নৃপতিগণ যে তাদের সুখভোগের মধ্যে সময় সময় কষ্ট, যন্ত্রণা ও পীড়ায় আক্রান্ত হন, সে কেবল তাহাদের পূনর্জন্মের কুকর্ম্মের ফলভোগ মাত্র।" ৪৯

## বৈদিক দেববাদের বিস্তার

প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মে ছিল যজ্ঞ, স্তব ও মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ফল কামনা করা। এটা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ দেড় সহস্রাধিক শতকের আগের ব্যাপার, এ সময় ছিল কাম্য কর্ম্মের যুগ। সাধক ছিল প্রবৃত্তিমুখী। এই অবস্থাটাই ছিল বৈদিক বিস্তারের যুগ। খৃঃ পূঃ বার

৪৯ ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৪, ৩৫ ও ৩৬

শতকের আগেই আমরা দেখি, বৈদিক আর্য্যদের এসিয়া মাইনর, ভূমধ্য সাগর ও কাশ্যপ সাগরতীরে, পারস্যেও মিশরের উত্তর ইথিওপিয়ায়। এই সময়ের ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মই সর্ব্বত্র দেখা যায়। এই ধর্ম্ম একাভিমুখী বহুদেববাদী ও প্রবৃত্তিমুখী। ইহাই হ'ল প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম। ইহার সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়ো, সুমেরীয় ও মিশরের সভ্যতার যোগ এবং সাদৃশ্য ছিল।

এস, এম, এল, মানস্থুরি "আর্ট, কালচার অব ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজিপ্ট" —বই থেকে একটু তুলে দিচ্ছি, "ভারতীয় এবং প্রাচীন মিশরীয়দের ভিতর সেই প্রাচীন যুগে, শুধু প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না, যেখানে মিশরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার এবং তৎপরবর্ত্তী ঐতিহাসিক সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল—সেই নিকট প্রাচ্যে তাদের মিলন হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপে প্রচুর সাক্ষ্য দেওয়া যায় যে ভারতীয়েরা ভারত থেকে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে গিয়েছিল। মহেঞ্জোদাড়োর মোহর, ইলাম এবং সুমের— উভয় স্থানেই পাওয়া গিয়েছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত আনে যে ভারতীয়েরা এই দুই দেশে এসেছে; কিন্তু প্রমাণও আছে যে ভারত থেকে মেসোপটোমিয়ায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খৃঃ পূ ২৮০০ শতকের মোহর, উর এবং কিসে পাওয়া গিয়েছে। উহা মেসোপটো-মিয়ার পুরাতন নগর উর এবং কিস্ শব্দ—উরুকসিতি শব্দের অপভ্রংশ। বৈদিক ভারতীয়েরা সম্ভবতঃ এই উরুকসিতিতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ৭—১০০—৪ ) আছে—বিষ্ণু তাঁর অনুচরদের বসবাস করার জন্য পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তিনি উরুকসিতি সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদ; ৯—৪৮—৯ সুক্তে আছে, "হে সোম—ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর জন্য প্রবাহিত হও, তোমার যজ্ঞের শব্দ শুনে, দেবগণ উরুকসিতিতে সমবেত হবেন। ঋগ্বেদ ১০-১১৮ সুক্তে আছে, অগ্নি, তোমার নিজ মহিমায় উরের গৃহ-গুলিতে প্রজ্জ্বলিত থাক এবং রাক্ষসদিগকে দগ্ধ কর।" ঋগ্বেদ ১০-১১৮ ৯ সুক্তে আছে, "হে অগ্নি উরের অধিবাসীরা তোমাকে

অর্চ্চনা করেছে।" উর থেকে উর এবং ক্ষিতি থেকে কিসিতি—সংক্ষিপ্ত করে কিস্। স্বাভাবিক অপভ্রংশ উর এবং কিসই শুধু নয়, প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় উরু, লরুক, উরুকসদিস পাওয়া যাচ্ছে। এত বেশী সাদৃশ্য কখন ঘটনাচক্রে হয়েছে—নিশ্চয়ই ইহা বলা যায় না। বেদ হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা ইহাই ধারণা হয় যে বৈদিক আর্য্যেরা উর এবং কিসে গেয়েছিলেন, আর এই ধারণা দৃঢ় হয়—উরুকে আর্য্য আক্রমণ খৃঃ পূ ৩৫০০ শতকে হয়েছিল ( হুন্‌জি, পৃঃ ৩৫ )। আর একটা আক্রমণ হয় এসিয়া মাইনরে খৃঃ পূ ১৯০০ শতকে ( হুনজি, পৃঃ ১০৯১)। খৃঃ পূঃ ১৬০০ শতকে একটি আর্য্য রাজবংশ ব্যাবিলনে রাজত্ব করেছিলেন। ( পিগট, ২৫০ )। খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকে মিটান্নীদের মধ্যে অনেক রাজা আর্য্য নামে পরিচিত দেখা যায়। ৫০

খৃঃ পূঃ ১৩৮০ শতকে হিট্টাইট ও মিটান্নীদের সঙ্গে বিখ্যাত সন্ধি হয়—যাহাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং নাসত্য ( যমজ অশ্বিনী কুমার ) এদের সাক্ষ্য করে সন্ধি করা হয়েছিল। রথের দৌড়খেলা যাহা মিশরে প্রচলিত ছিল, হিট্টাইট দলিলে দেখা যায় উহা সংস্কৃতের শব্দ একবর্ত্তন্ ( এক পাক )—তেরা বর্ত্তন, ( পাঁচ পাক ) সত্তবর্ত্তন, ( সাত পাক )। মিটান্নী রাজ্যে, ভারতীয়রা যে বাস করত, ইহা তার স্পষ্ট প্রমাণ ( হুণজি, পৃঃ ১১২। এবিষয়ে সবিস্তারে পরে আলোচিত হবে।

এখন এই সব প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না যে পারস্যের উপনিবেশও এই বিস্তারের যুগে হয়েছে; আর এই সময় পর্য্যন্ত তারা সংস্কৃতিতে ও ধর্ম্মে একাভিমুখী বহুদেববাদী ও প্রবৃত্তি-মার্গী ছিল। প্রকৃতপক্ষে গাথা থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হয়েছে তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। তবে শেষ জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব—সম্বন্ধে আচার্য্য ধল্লা বলেন যে পণ্ডিতগণের সর্ব্ববাদিসম্মত মত—

---

৫০ এস এন এল মানুস্থরি, আর্ট, কালচার অব হজিপ্ট পৃঃ

উহা খৃঃ পূঃ সহস্র শতকের পূর্ব্বে নয় )। এই সময়ের পূর্ব্ব ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের উদ্ভব হয়। উহাই নিবৃত্তিমুখী ব্রহ্ম সাধনার ধারা। এই নিবৃত্তিমুখী ব্রহ্মসাধনই ক্রমবিকাশে সন্ন্যাস, বৈরাগ্য এবং মায়াবাদে পর্য্যবসিত হয়েছে। পারসীদের উহা ছিল না বটে, কিন্তু খৃঃ পূঃ সহস্র শতকে এই মতের উদ্ভব যে হয়েছিল, তাহা খৃঃ পূঃ ১০০০ শতকের জরাথুস্ট্রের বাণী, যা গাথায় পাওয়া যায়, তার মধ্যে খুব স্পষ্টই দেখা যায়।

## জরাথুস্ট্র ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমার্গী

জরাথুস্ট্র ঋষি ছিলেন প্রবৃত্তিমার্গী, ও ভক্তিবাদী—তিনি উপনিষদের নিবৃত্তিমুখী অদ্বৈতবাদ লন নাই। তাঁর দেবতা নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকার অবস্থার—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" নহেন। তিনি মানস চেতনার ঊর্দ্ধে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ নহেন। উপনিষদের ব্রহ্ম তত্ত্বের পর থেকে দর্শনের উৎপত্তি। তার আগে জরাথুস্ট্র ঋষির সময়ে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কি ছিল না। ঈশ্বরতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, দর্শন—এই সমস্ত ভারত থেকে বাইরে গিয়েছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের কিছুকাল আগের এবং পরের অবস্থায়। এর আগে যা গিয়েছে তাহা প্রাচীন বৈদিক দেববাদ। ইহা গ্রীক ও ইহুদী দর্শনের বিষয় আলোচনার সময় আলোচিত হবে। দার্শনিকতত্ত্ব প্লেটোর সময় কিছু দেখা যায়, তবে প্লোটিনাসের সময় নিওপ্লেটনিক দর্শন, যাহার কেন্দ্র আলেকজেন্দ্রিয়া, সেখানেই ইহার প্রকৃত বিকাশ।

জরাথুস্ট্র বেদের বহুদেববাদী সর্ব্বাত্মবাদ প্রত্যাখ্যান করে, সর্ব্বাধিপতি দেববাদ গ্রহণ করলেন কিন্তু বৈদিক দেবতা ও যজ্ঞ এবং মন্ত্রকে ত্যাগ করলেন না। বৈদিক সর্ব্বদেববাদের সঙ্গে পারসিক সর্ব্বাধিপতিবাদের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যমূলেই দুই ধর্ম্ম এক মূল থেকে ছিন্ন হয়ে গেল।

## আধিপত্যবাদী সর্ব্বেশ্বরবাদ ও সর্ব্বাত্মবাদ

শ্রীঅনির্ব্বাণ লিখেছেন, "বেদের দেবতা অমূর্ত্ত, কিন্তুঅরূপ বা নিরাকার নন। "ইরাণের নবধর্ম্মের অহুরা মজদাও তাই। "আর্য্যসংস্কৃতি মোটের উপর মূর্ত্তিসংকৃতির বিরোধী। বিরোধ সব চাইতে বেশী ছিল, ভারতের প্রতিবেশী ইরাণে।* * আর্যদের মধ্যে মূর্ত্তিউপাসনায় গ্রীকরা সবচাইতে আগ্রহী।* * পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এটা গ্রীকদের প্রাক্তন মিনোয়ান বা মাইকিনিয় সংস্কৃতির প্রভাব। * এদেশে—এমনকি মিশরে, বাবিলনেও দেবমূর্ত্তি প্রতীকধর্ম্মী। আর্য্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে মূর্ত্তিউপাসনা প্রাচীনকালে ছিল না, পরে দেখা দিয়েছে। আর্য্যদের জাতিদের মধ্যে গোড়া থেকেই তার চল ছিল বাবিলন ও মিশরে। ছান্দোগ্য উপনিষেদ বর্ণিত আসুরী উপনিষদে এসব দেশের আচারকে লক্ষ্য করা হয়েছে মনে হয়।" (৮।৮।৫) ৫১

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রীকদের আদিযুগে যে মূর্ত্তিপূজা ছিল, তাহাও প্রতীকধর্ম্মী, খাঁটী মূর্ত্তিপূজা ছিল না। রজনীকান্ত গুহের সক্রেটীস্ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—ইহা সিন্ধুসভ্যতার ধারারই পরিচয়। আর্য্যসংস্কৃতি মূর্ত্তির বিরোধী নয়। বেদের সময়ও মূর্ত্তি পূজা ছিল। এ বিষয়ে যথাসময়ে আলোচিত হবে।

বৈদিক প্রথমস্তরে পারসিক ও ভারতীয় ধর্ম্ম দেবতার আরাধনায় একরকম হলেও, এদের মধ্যে পার্থক্যের সূত্রই হল 'সর্ব্বেশ্বরবাদ'। অহুরা মজদা ইন্দ্রের মত সর্ব্বপ্রধান দেবতা হলেও বেরেথ্রগ্ন বা মিত্রের মত "নামে আর রূপে পৃথক হলেও, সব দেবতা সেই "একের বিভূতি" থাকলেন না। অনির্ব্বাণ আরও বলেছেন, "বহু গোড়ায় কিন্তু তার শেষ একে। আবার এক হতে বহুর বিসৃষ্টি—সূর্য্যমণ্ডল

৫১ বেদ—মীমাংসা ২য় ভাগ, অনির্ব্বাণ; ২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠা

হতে সূর্য্যকিরণের মত। বহু এবং এক দুইই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।" জরাথুষ্ট্র এই বৈদিক বিশেষত্ব হতে পৃথক হয়ে পড়লেন। অহুর মজদা অন্য দেবতার উপরে সর্ব্বাধিপতি হলেন, ঐ সব দেবতা থাকলেন, পৃথকভাবে বা তাঁরই অধীন। পক্ষান্তরে সর্ব্বাত্মবাদের মূলে সকল দেবতা এক ব্রহ্মেরই বিভূতি। প্রধান দেবতার সাথে অন্য দেবতার আত্মগত সাযুজ্য বোধ না থাকলে—ঐ দেবতাবাদ হয় সর্ব্বাধিপতিবাদ। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের দেবতাবাদ—সর্ব্বাধিপতিবাদ—এই বাদটী এই দুটী ধর্ম্মে এসেছে পারসিক তথা আসুর সভ্যতা থেকে।

## জরাথুষ্ট্র ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্মের পৃথক ধারা

জরাথুষ্ট্রের এই বৈদিক ধারা পরিবর্ত্তনের ফল হ'ল সদূর প্রসারী। পারসিক ও বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্যের মূলই হ'ল এখানে। নীচে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

### সর্ব্বাধিপতিবাদ

(১) প্রথমত :—বৈদিক সর্ব্বাত্মবাদের দেবতার ধারণা ত্যাগ করার ফলে জরাথুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে এল সর্ব্বাধিপতিবাদ। বৈদিক সর্ব্বাত্মবাদে অদ্বৈত ও দ্বৈত ধারণা—উভয়ই আছে। পারসিক ধর্ম্মে থাকল শুধু দ্বৈতবাদ। আর এই দ্বৈতবাদ ভারতীয় দ্বৈতবাদ নয়।

### অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদ

(২) দ্বিতীয়ত :—অদৃষ্ট ও জন্মান্তর মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এই বিশ্বাসটি আদিস্তরের বৈদিক সমাজে পারসিক ও ভারত উভয় ধর্ম্মেই ক্ষীণ ভাবে ছিল। ৫২। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত

---

৫২ পারসিকদের জন্মান্তরবাদ; ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী; পৃ:৩৫ জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলবাদ; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃ:১৪৮;১৪৪

এই যে উহা বেদে ছিল না ; কিন্তু স্বামী মহাদেবানন্দগিরি দেখিয়েছেন যে উহা বেদে ছিল। ৫৩ উহা আদি পারসিক ধর্ম্মেও ছিল।

যাই হোক—পরবর্তী স্তরে এই বিশ্বাসটি ভারতের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিগণিত হয়েছে। জরাথুষ্ট্র ইহার বিরুদ্ধে গিয়েছেন। সর্ব্বাত্মবাদে ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত। কর্ম্মচক্রে আবদ্ধজীব সুখ দুঃখের ফলের অধিকারী হয়। সুতরাং যান্ত্রিক নিয়মেই জীব পরিচালিত হচ্ছে ; ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ সেখানে গৌণ। সেইজন্য অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। জরাথুষ্ট্র সর্ব্বাধিপতি বাদী, সুতরাং তারপক্ষে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপই প্রধান প্রয়োজন—কর্ম্মচক্র ও অদৃষ্ট এখানে গৌণ। কর্ম্মফল বাদই জন্মান্তরবাদের মূল—সুতরাং জন্মান্তরবাদকে জরাথুষ্ট্র গ্রহণ করলেন না।

## ধ্যান, জপ, যোগ, আত্মজ্ঞান নাই

(৩) তৃতীয়তঃ—প্রার্থনা যজ্ঞ ও অর্চ্চনাই হচ্ছে সর্ব্বেশ্বরের আনুগত্য লাভের প্রধান উপায়। ধ্যান, জপ প্রভৃতি দরকার হয় না। সর্ব্বাত্মবাদে পরমাত্মাকে লাভ করার উপায় প্রধানতঃ যোগের মাধ্যমে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা বা ইষ্টদেবতাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা দ্বারা বা শব্দ-শক্তির অন্তর্মুখী অভ্যাসের দ্বারা।

## মোক্ষবাদ পরিত্যাগ

(৪) চতুর্থতঃ—সর্ব্বাত্মতা লাভ করার কথা এদের কাছে অচিন্তনীয়। সর্ব্বাত্মতা লাভই, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। বৈদিক প্রথম স্তরে উভয় ধর্ম্মেই মোক্ষ থাকলেও, ইহার স্থান ছিল গৌণ। নগণ্য সংখ্যার লোকই বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে পারত, তাও আবার গার্হস্থ্য আশ্রমের শেষে। সাধারণ জীবনে

৫৩ বেদের কথা ; মহাদেবানন্দ গিরি, পৃঃ ১৩১

মোক্ষের আদর ছিল না, কিন্তু বৈদিক দ্বিতীয় স্তরে, আত্মলাভ বা মোক্ষলাভই শ্রেষ্ঠ আদরণীয় আদর্শ বলে গণ্য হল। জরাথুষ্ট্র মোক্ষকে বিশেষভাবে বাদ দিলেন।

### ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের উদ্বোধন

(৫) পঞ্চমত :—বৈদিক প্রথম স্তরে বর্ণাশ্রম থাকলেও উহা প্রবল ছিল না, কেন না উহা বংশগত ছিল না, কার্য্যগত ছিল। দ্বিতীয় স্তরে উহা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হল। জরাথুষ্ট্র ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ বাদ দিয়ে একমাত্র ক্ষত্রিয়বর্ণকেই মানলেন। জাতিটী ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী হয়ে গেল। ইহার ফলে ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং যুদ্ধবিগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হল। জ্ঞান চর্চ্চা এবং মানসিক বিকাশের লাঘব হল। পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠল। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং বিলাসই পারসীদের ধ্বংসের কারণ।

### সয়তান তত্ত্ব ও শেষ বিচারের দিন

(৬) ষষ্ঠত :—ভালমন্দ, পাপপুণ্য, সদসৎ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে, জরাথুষ্ট্র ঈশ্বরের সঙ্গে সৎ বা পুণ্য বা ভালর সম্বন্ধ রাখিবার জন্য ঈশ্বরের বিরোধী তত্ত্বের মূল অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। এই তত্ত্বের পরিণিতি হল—ঈশ্বরের শেষবিচারের দিন, সয়তানতত্ত্ব প্রভৃতি। এই তত্ত্বটির বাহক একাধিপত্যশালী ঈশ্বর-তত্ত্ব—প্যালেষ্টাইন ও মক্কা, পারসীকদের কাছে থেকেই গ্রহণ করে ছিল। এটা তাঁর নূতন ধর্ম্মের নূতন চিন্তা ধারা।

### মূর্ত্তি বিরোধ

(৭) সপ্তমত :—অধিপতিদেবতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, তাঁকে সৃষ্টি থেকে পৃথক না করলে, তাঁর প্রভাবকে খর্ব্ব করা

হয়, এই জন্যই তাঁর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হল। বৈদিক অমূর্ত্ত দেবতার ধারণায়, উহার দরকার হয় নাই—কেন না, দেবতা পৃথক হলেও গুণের একত্বের ধারণার অভাব ছিল না। এই গুণগত একত্ব থেকেই সর্ব্বাত্মবাদের ধারণা করা সহজ হয়েছে। বৈদিক দেবতার বিষয়ে প্রতীক এবং অপ্রতীকধর্ম্মী উভয় প্রকার ধারণাই ছিল। জরাথুষ্ট্রের অধিপতিদেবতা সম্পূর্ণ অপ্রতীক ধর্ম্মী। এই জন্য নব্যপারসিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে মূর্ত্তিবিদ্বেষী চিন্তাধারার সৃষ্টি করল। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের মূর্ত্তিবিদ্বেষ পারসিকদেরই উত্তরাধিকার।

## ভগবৎ প্রেম অজ্ঞাত

(৮) অষ্টমতঃ—জরাথুষ্ট্র অর্চ্চনা ও প্রার্থনা দ্বারাই অহুরা মজদাকে সন্তুষ্ট করার বিধান দিয়াছেন। ইহার অর্থ স্তব, স্তুতি দ্বারা কাম্য কর্ম্ম আদায় করা। এই বিধানে অনুরাগ ও আত্মসমর্পনের কোন পরিচয় নাই। ইষ্টকে একান্তভাবে আত্মভাবনা না করলে তাকে "ভালবাসা" নাম দেওয়া যায় না। উহাদের আছে অর্থার্থী ভক্তির ভক্তিযোগ। দেবতার সাথে লেনদেনের সম্বন্ধই এতে থাকে। সর্ব্বাত্মবাদে ইষ্টকে আত্মভাবে চিন্তা করা যায় এবং তদ্ভাবে তন্ময়তা হলে, একাত্মস্বরূপ হওয়া যায়। সর্ব্বাত্মবাদে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুই ভাবেই সাধন করা যায়। জরাথুষ্ট্রবাদ অদ্বৈতবাদ নয় —ইহা ভগবৎ প্রেমবিহীন দ্বৈতবাদ, কারণ এখানে শুধু লেনদেনের কারবার। ভগবৎপ্রেম—আত্মসমর্পণ ছাড়া লাভ হয় না। দেবতাকে সম্রাটের আসনে রেখে ভয়ের ও অনুতাপের দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা করলে ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায় না। ভারতীয় ভক্তিযোগ দ্বৈতবাদী হলেও সর্ব্বাত্মবাদী। নিওপ্লেটোবাদ, ফিলোবাদ, সুফীবাদ, প্রকৃত ভক্তিযোগী ও সর্ব্বাত্মবাদী। এই শেষোক্ত বাদগুলি ভারত থেকেই গিয়েছে—এবিষয়ে, পরে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

## সর্ব্বভূতে প্রীতির অভাব

নবমত ঃ—অধিপত্যশালীদেবতা • সংস্কৃতির পারসিক ধর্ম্ম: সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনা এবং ত্যাগের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হল, ফলে পারসিক ধর্ম্মে ন্যায়ও নীতির আদর্শ' এককালে এই জন্যই বিদায় গ্রহণ করল। একমাত্র আনুগত্যের দ্বারা এবং শৃঙ্খলায় বিধান রচনার দ্বারা সামরিক মনস্তত্ত্ব গঠন করা যায়, কিন্তু সর্ব্বভূতের কল্যাণ কামনা এবং তাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের মনস্তত্ত্ব গঠন করা যায় না। সর্ব্বভূতের প্রতি ভালবাসা এবং তাদের জন্য ত্যাগ একমাত্র সর্ব্বাত্মবাদেই সম্ভব। সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিই ত্যাগ ও ভালবাসার মনস্তত্ত্ব। এই দুইটী—মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির মূলে। জরাথুষ্ট্র এই বৈদিক সামাজিক আদর্শের বদলে নিয়ে এলেন—আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও যুদ্ধ। ইহার পরিণতিতে সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উপযুক্ততমেরই বাঁচবার অধিকার এবং জীবন ধারণের জন্য সংগ্রামের মনস্তত্ত্ব। ইহাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের চূড়ান্ত আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য সমাজবদ্ধতা লুপ্ত করার পক্ষে ইহা অমোঘ অস্ত্র। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য সমাজের মধ্যে স্বার্থান্ধতা, নিষ্ঠুরতা এবং অশান্তির মনস্তত্ত্বের একমাত্র কারণই ইহা। এই নীতি আসমুর তথা পারসিক ধর্ম্মের আধিপত্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের জরাথুষ্ট্র ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা খুবই সুন্দর এবং সুচিন্তিত; আমরা ইহা প্রশংসায় সঙ্গেই গ্রহণ করেছি কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে, তাঁর সিদ্ধান্ত যুক্তি অপেক্ষা ভাবই অধিক অনুসবণ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ তিনি জরাথুষ্ট্র ধর্ম্ম ও ঔপনিষদিক ধর্ম্মকে একচক্ষে দেখেছেন। ইহা ঠিক নয়। পারসিক ধর্ম্ম ও প্রথম স্তরের বৈদিক ধর্ম্ম এক-কিন্তু জরাথুষ্ট্রের দ্বারা উহার সংস্কার এবং সেই সময়ের বৈদিক ঔপনিষদিক ধারণা এক জিনিষ নয়। ইহারা পরস্পর বিরোধী। এই বিরোধী যুক্তিগুলিই উপরে আলোচনা করলাম।

দ্বিতীয়তঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন যে এই দুই ধর্ম্মে শুধু সাকার নিরাকারের ধারণায় তফাৎ। এটাও ঠিক নয়। দেবতার ধারণা নিয়ে দুইটী ধর্ম্মে প্রভেদ এসেছে। জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কালে ভারতীয় বৈদিকগণ নিবৃত্তিমার্গী, স্বর্গঅভিলাষী ও কাম্যকর্ম্মের অসমর্থক হয়ে উঠছিল; দার্শনিকতত্ত্বচিন্তার আবির্ভাবে, অনীশ্বরত্ব ও কর্ম্মফলবাদের বিশ্বাসের দিকে গতি এসেছিল; জরাথুষ্ট্র ইহারই বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। বৈদিক দেবতার নেতৃস্থানীয় দেবতা ইন্দ্র দেবরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও বৈদিক ভারতে ঐ দেবতাকে বিশিষ্টতা দিয়ে অন্য দেবতাকে পৃথকভাবে চিন্তা করতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। সকল দেবতার মধ্যে এক সামগ্রিক সাধারণ রকম গুণ দেখাই বৈদিক ভারতে চিন্তার ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; ইহাই সর্ব্বাত্মবাদের মূলসূত্র। জরাথুষ্ট্র এই ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অহুরমজদা সর্ব্বপ্রধান বটে, কিন্তু অন্য দেবতার উপর অধিদেবতা। নব পারসিক ধর্ম্মে অন্য সকল দেবতার গুণ পৃথক এবং তারা অহুরমজদার সঙ্গে অনুস্যুত ও একাত্ম নয়। এই ভিন্নতাই সেমেটীক দেবতার ধারণার সঙ্গে এক। অহুরমজদার সর্ব্বাত্মবাদ নাই। তিনি গুণাতীত—শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, চিন্তাতীত, নিস্তরঙ্গ, শান্ত নহেন। তিনি মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্তের অতীত নন। তাঁর নিরাকারত্ব, মনের অতীত অবস্থা নয়। ৫৪

তাঁর নিরাকোরত্ব শুধু প্রতীকধর্ম্মী। ব্রহ্ম অপ্রতীকধর্ম্মী হয়েও প্রতীকের মধ্যে অনুস্যুত, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, জরাথুষ্ট্র ধর্ম্মকে ব্রহ্মবাদী ধর্ম্মের সঙ্গে এক বলে প্রমাণ করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক।

সেমেটিক জাতির নেতা আসসুর সম্রাটদের বিপুল আত্মম্ভরিতা, সমরপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতার জ্বালায়, পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলি অন্তিমকালের দিন গণনা করছিল। এই আসসুর সভ্যতার বিরুদ্ধে

৫৪ রামচন্দ্র ও জরাথুস্ত্র ৮৬। [illegible]

জনসাধারণ এবং প্রতিবেশী জাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টার মনস্তত্ব গড়ে উঠছিল। এই সময় জরাথুষ্ট্রের, সামরিকতাবাদের এবং আধিপত্যবাদের মনস্তত্বটী সকলের পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠেছিল। এই মনস্তত্ব সর্ব্বাত্মবাদ বা ব্রহ্মবাদের বিরোধী। সেখানে দেবতার ক্ষমতা সকলের উপর। এই ক্ষমতা—কর্ম্মের উপর নির্ভরশীল নয়; দেবতার ইচ্ছা সেখানে একচ্ছত্র, প্রধান এবং নিরঙ্কুশ। এই মতবাদটী ছিল—সেমেটীক জাতির নিজস্ব। ইহা যথাস্থানে দেখান হয়েছে। জরাথুষ্ট্র বৈদিক যজ্ঞবাদ ও সর্ব্বাত্মবাদ থেকে বাহির হয়ে গেলেন। তার নূতন ধর্ম্মটাতে, যাহা মূলতঃ বৈদিক প্রথম স্তরের অর্থাৎ সিন্ধু স্তরের ধর্ম্ম ছিল, তার উপর কতকগুলি সেমেটিক ধারণা আরোপ করলেন। তার জন্মভূমি ভ্যানহ্রদের নিকটে, সেখানে তাঁর এই মত গৃহীত হল না। বাহ্লীকে রাজা বিস্তাস্পের সমর্থন তিনি পেলেন; কিন্তু সেখানেও জনসাধারণ তার মত প্রথমে গ্রহণ করে নাই। এই মতের জন্যই তাঁর জীবনের অবসান হয়।

উক্ত আলোচনায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "গাথার" অনুবাদ থেকেই তার বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছি—এ বিষয়ে মতান্তরের কারণ না হওয়াই উচিত।

## পারস্যের শব্দব্রহ্ম তত্ত্ব

পারস্যের মধ্যে শব্দব্রহ্ম তত্ত্বের বিকাশ হয় নাই। তার কারণ উপনিষদের তাত্ত্বিকযুগের আগে বেদের মন্ত্রই একমাত্র পবিত্র ও সনাতন—এই বিশ্বাসের প্রভাব দেখা যায়। বেদের মন্ত্র ঋষির দৃষ্ট—যোগলব্ধ পবিত্র সিদ্ধ মন্ত্র। সেইজন্য প্রতি মন্ত্রে ঋষির নাম উল্লেখ আছে। এই রকম অবস্থা সেই সকল দেশেই দেখা যায়—যেখানে মন্ত্রের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর আছে। আমরা মিশরে এই জিনিষ দেখেছি—গ্রীসেও এই জিনিষই দেখব। এদের কাছ থেকে ইহুদীরা ইহা নিয়েছে, আর পারসীদের বেলায় এটা থাকবেই; কারণ

এটা মূলতঃ বৈদিক। এটা মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস, ব্রহ্মের সঙ্গে এর সম্বন্ধ দরকার হয় না। যাদের ঈশ্বর জাতিগত—তাদের অর্থাৎ ইহুদীদের বেলায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য, পরবর্ত্তীকালে, শব্দকে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। শব্দব্রহ্ম—যাহা প্রণব, তার বিষয় ধারণা, এই সমস্ত জাতিগত বা কুলগত ঈশ্বরের ধারণা যাদের, তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়। সর্ব্বাত্মবাদের ধারণা ছিল প্রাচীন বৈদিকদের, কিন্তু এই তত্ত্বের বিকাশ হয় উপনিষদ যুগে—পরবর্তী ব্রহ্মবাদী নিবৃত্তিমার্গীদের সময় ব্রহ্মসাধনের লক্ষ্য ছিল যোগ ও মন্ত্র সাধনার দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বের ব্রাহ্মীস্থিতিতে উন্নয়ন। এই তত্ত্বের সঙ্গে জাতিবাচী বাইবেলের ঈশ্বর-তত্ত্ব মিল করা যায় না বলেই, আলেকজেন্দ্রীয় যুগে ফিলো ওল্ডটেষ্টামেণ্টের গল্পকে ঢেলে নূতন করে দার্শনিক রূপ দিয়েছেন। এটা যে আর একটা গোঁজামিল তাহা পূর্ব্বেই ডাঃ প্যাটিসনের উদ্ধৃতি দিয়ে, দেখিয়ে দিয়েছি। সাকার ভগবান ও জাতীয় ঈশ্বর ধরে ব্যাখ্যা করলে শব্দব্রহ্ম হয়ে যান ঈশ্বরের মুখনির্গত শব্দ। ঈশ্বরের মুখনির্গত পবিত্র শব্দ হলেই তার ব্রহ্মত্ব থাকে না। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ঈশ্বরের বাক্য বা ভরের বা রিভিলেসনের বাক্য বলে ঘোষিত না হলে, লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। চেলা তৈরী করতে হলে, এইরকম ভরের বাক্য হবে, সাকার ঈশ্বরের শব্দব্রহ্ম তত্ত্ব।

সুখের বিষয় পারসিকদের এইরকম শব্দব্রহ্ম তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখা যাচ্ছে না। তবে এটাকেও ফিলোর মত গোঁজামিল দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পার্শিদের আচার্য্য ধল্লা সাহেব লিখেছেন, "ওরিগেন বলেন যে ঈশ্বর, প্রজ্ঞা অথবা পুত্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অহুর মজদা এবং পেন্তা মৈন্যুর মধ্যে যে সম্বন্ধ—পরম পিতার সহিত তাহারও সেই সম্বন্ধ"। ৫৫ এই ব্যাখ্যাটা ফিলোর দেওয়া ব্যাখ্যারই

৫৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, রাধাকৃষ্ণণ পৃঃ ৪

নকল। ফিলোর সম্বন্ধে ডাঃ প্যাটিসন যাহা বলেছেন, তাঁহা আগেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

## পার্শী প্রণব

প্রণব সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যা বলেছেন তাহা গ্রহণ-যোগ্য নয়। তিনি বলেন, "হিন্দু মতে অ, উ, ম এই তিনটি বর্ণদ্বারা প্রণব গঠিত; ইহার নাম ওঁকার, পার্শী মতে হ—উ—ন্—এই তিনটী বর্ণদ্বারা প্রণব গঠিত। ইহার নাম হোন্ বর।"

আমরা প্রণব আলোচনায় দেখেছি যে প্রণবই ব্রহ্ম—ইনিই শব্দব্রহ্ম। এই ব্রহ্মবাদ হতে পৃথক হয়ে গেলেন জরাথুষ্ট্র ঋষি। তিনি গ্রহণ করলেন নামরূপের বাচক সগুণ ভগবান অহুরমজদাকে। সুতরাং ইহা প্রণবরূপ মহাবীজের সঙ্গে একার্থবাচক হতে পারে না। "হোন্"কে পারসিকরা, যদি বীজমন্ত্র অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, তবে এই বীজ অহুরমজদাবাচক শক্তিবীজ। ইহা প্রণবের প্রকাশিত বাচকবীজশক্তি। ইহাকে প্রণবের আসন দেওয়া যায় না। আর—আচার্য্য ধল্লা সাহেব পার্শিদের আচার্য্য; তাঁর লেখায় এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেওয়া নাই এবং 'গাথার মধ্যেও ইহার কোন উল্লেখ নাই।

রহস্যমূলক সাধনা, প্রাচীন পারসী ধর্ম্মে থাকা সম্ভব, কারণ বেদের প্রাচীন যুগেই মান্ত্রিক স্তরে রহস্যমূলক সাধনা ছিল। পরবর্ত্তীকালে যখন জরাথুষ্ট্রবাদের ক্ষাত্রধর্ম্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সেই সময় দেখা গেছে পুনরায় এই প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্ম, বৈদিক "মিত্র" ধর্ম্মের নিগূঢ় আচারের অভ্যুদয়। আচার্য্য ধল্লা সাহেব লিখেছেন," জুলিয়ান দি ব্যাপটিষ্ট (৩৬১-৩৬৩ খৃঃ অঃ) মিত্রধর্ম্মের গূঢ় রহস্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি কনষ্টান্টিনোপলে মিত্রপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।৫৬

৫৬ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১ ও পৃঃ ২।

সুতরাং হোন বা হুংকার বৈদিক দেবতার বীজ হওয়াই সম্ভব তান্ত্রিকযুগে ইহার পুনরাবির্ভাব। তন্ত্রে হুংকার, শিবের বীজ। "ওঁ মনিপদ্মে হুং"—তির্ব্বতীয় মহাযোগীর বৌদ্ধ বীজমন্ত্র। ইহা পষ্টতঃ শিবকে ধ্যান করার মন্ত্র। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ—শিবকে ধ্যান করি, মনিপদ্মে অর্থাৎ সহস্রারে তাঁহার সহিত একাত্মবোধ করি। এখানে শিব "বাচকশক্তি এবং প্রণব "বাচ্য" শক্তি। সুতরাং হুংকার এবং ওঁঙ্কার একার্থবাচক নয়। বীজমন্ত্র সাধনপূত শব্দ বা সিদ্ধমন্ত্র, তাহাকে বুদ্ধিদ্বারা পরিবর্ত্তিত করে "ওঁ তৎসৎ হোং" এই কল্পিত মন্ত্র—যাহা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন, তাহা যুক্তিপূর্ণ নহে।

## পারসিক ধর্ম্মে জরাথুষ্ট্রবাদ তাত্ত্বিক নয়

পারসিকদের সময়ে ঈশ্বরতত্ত্বের ভালভাবে বিকাশ হয় নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আংশিক আলোচনার চেষ্টা দেখা যায়—প্লেটোর সময় এবং পাশ্চাত্যজগতে ইহার বিশেষ আলোচনার চেষ্টা দেখা যায়—আলেকজেন্দ্রিয়ার মাধ্যমে, খৃষ্টীয়শতকে। সুতরাং ঈশ্বরতত্ত্ববাদ ও বৈদিক প্রণবতত্ত্ব, জরাথুষ্ট্রবাদী পারসীদের সময় আসা সম্ভব ছিল না। পারসীগণও এই ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে মাথাও ঘামান নাই। আচার্য্য ধল্লাও তাঁর প্রবন্ধ—"পারসিক, চিন্তাধারার ঐতিহাসিক ভূমিকা" পৃঃ ২ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" ২য় খণ্ডে লিখেছেন, "জোরোষ্ট্রিয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী, প্রাচীন ইরাণীয়দের তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারে, অনুরাগ ছিল না। জরাথুষ্ট্রের ধর্ম্মমত ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তত্ত্বসম্বন্ধীয় নয়।"

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সিন্ধু সভ্যতা—সকল সংস্কৃতির মূল

পারসিক সভ্যতায় প্রথম আরম্ভ, বৈদিক সভ্যতা হতে হলেও, পরবর্ত্তীকালে আসুর সংস্রবের জন্য ইহাতে সেমেটিক বিকৃতি এসেছিল। জরাথুষ্ট্র এই বিকৃতিকে সংস্কৃত করে জরাথুষ্ট্রধর্ম্মরূপে প্রবর্ত্তিত করেন। পশ্চিম এসিয়ায় সংস্কৃতির মূলে সিন্ধুসভ্যতা, আবার বৈদিক সংস্কৃতির মূলেও সিন্ধুসভ্যতা। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতায়, পশ্চিম এসিয়ার জাতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে, পশ্চিম এসিয়ার তথা ভারতের আর্য্যত্ব ও ইউরোপের জাতিতত্ত্বের গোঁজামিলের কুয়াসা কেটে যায়।

ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক এবং ইন্দোলজিষ্টদের নিজ নিজ ধর্ম্মীয় সংস্কার এবং সংস্কৃত ভাষায় সুদূরপ্রসারী অস্তিত্ব দেখার ফলে যেসমস্ত ভ্রান্তমতের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। ইন্দোইউরোপীয় আর্য্য কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল এই থেকেই। আর এখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ উহার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই।

জোরোষ্ট্রীয়গণের উৎপত্তি যেখানে, তাহা যে এখনকার ভারত-সীমান্তের সন্নিকটে এবং মূলতঃ ঐ উৎপত্তি স্থান ভারতেরই অন্তর্গত ছিল, তাহাতে এখন আর পণ্ডিতগণ সন্দেহ করেন না।

ইতিপূর্ব্বে মিশর, পারস্য সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা গিয়েছে যে মিটান্নি, কাশশাইট, হিট্রাইট ইত্যাদি জাতি, যাহারা এসিয়া মাইনর থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাদের সংস্কৃতি ভারতের লোকের সমগোত্রীয়। শুধু ভাষায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই নয়, ধর্ম্মীয় আচার ব্যবহারের ব্যাপারে, এরা বৈদিক ভারতের সঙ্গে এক। পারসীদেরও এই এক কথা। পারসীদের জেন্দ আভেস্তার ভাষার সঙ্গে বেদের ভাষার শুধু

মিলই যে আছে তা নয়, তাদের জাতিগত গঠন ও আচার ব্যবহারও বৈদিক ভারতের সঙ্গে একগোত্রীয় ছিল। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণও ছিল। জরাথুষ্ট্র সংস্কার করে তাদের মধ্যে শুধু ক্ষত্রিয় বর্ণের অস্তিত্ব রাখলেন—একথা গাথায় স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। বৈদিক ভাষাগত প্রমাণেরও কোন অভাব নাই, যাতে দেখা যায় যে ভারত থেকেই এদের প্রবর্ত্তকগণ বাইরে গিয়েছেন।

বৈদিক সংস্কৃতির আলোচনায় আর একটা ভুল করা হয়—ইহার বয়স সম্বন্ধে। এ পর্য্যন্ত আলোচনায় যা দেখা গিয়েছে, তাতে মহাঋষি ব্যাসদেবের সময় স্থির করে ধরা হয় এবং বলা হয় যে খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রায় পৌনে দু'হাজার বছর আগে বেদ সংকলিত হয়েছিল। এ কথাটা না হয় মেনেই নেওয়া হ'ল, কিন্তু বৈদিক সভ্যতা তো ঐ সময়ই উদ্ভূত হয়েছে একথা তো উহাতে প্রমাণ হয় না। ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের নিয়ম ধরে হিসাব করলে প্রমাণ হবে যে, ঐ সময়ের শত শত বছর আগে থেকে বৈদিক সভ্যতা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ছিল। আর সেই সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজতে হলে খুব বেশী দূর যেতে হবে না। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পা এই বিষয়ের জ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। পূর্ব্বে, মার্শালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে সকলের ধারণা হয়েছিল যে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার খাদ্যখাদক সম্বন্ধ, আর উহার জন্যই বাইরে থেকে বৈদিক আক্রমণকারীদের আক্রমণের গল্প বেশ রচনা করা হয়েছিল। এই মত আর বর্ত্তমানে চলে না। এই মত যথাস্থানে খণ্ডন করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা একই গোত্রীয়, এদের পরিচয় ধারাবাহিক।

## সিন্ধু সভ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে ঋগ্বেদে উত্তর অঞ্চলে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের বিষয় একাধিক স্থানে দেখা যায়। এ বিষয়ে জানতে হলে মানস্থরি সাহেবের আগে—উল্লিখিত পুস্তক এবং স্বামী

শংকরানন্দের "হিন্দুষ্টেটস্ অব স্মুমেরিয়া" অধ্যয়ন করা উচিত। আমি লিপিবাহুল্যভয়ে আর বেশী প্রমাণ-দাখিল করব না, তবে, বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আরও কয়েকটী উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত মনে করছি।

ইহার আলোচনায় স্বামী শঙ্করানন্দের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ—

"বিংশ শতাব্দী—ক্রীট ও সিন্ধু উপত্যকা এবং আর যে সব প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে এই কাল্পনিক ( বর্হিভারতীয় ) আর্য্য আক্রমণের মতবাদ নির্মূল করা যায়—তাহা আবিষ্কার করে এক যুগান্তর নিয়ে এসেছে। ইহা নিম্নে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

( ১ ) ক্রীটের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণ হয়েছে যে গ্রীক—সংস্কৃতি ক্রীট থেকে নেওরা হয়েছে। ক্রীটবাসীগণ হ্যামবংশী ছিল, গ্রীকরাও তাই ছিল, তারা আর্য্য ছিল না। থেরা ও এথেন্সের ছয় এবং সাত পূঃ খৃষ্টাব্দের গ্রীকশিলালিপিতে মহাপ্রাণ বর্ণের অভাব থেকে এই প্রমাণ সিদ্ধ হয়েছে। এই কল্পিত সাধারণ আর্য্যনিবাসের মতবাদ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই কাল্পনিক আর্য্যনিবাসের মত অন্তর্হিত হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় আঘাত সিন্ধু উপত্যকার খননের দ্বারা দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় পুরাতাত্ত্বিক এবং তাদের মোসাহেবদের বিরোধী তত্ত্বের উদয় হয়েছে এক উচ্চস্তরের নগরসভাতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের দ্বারা সেইস্থানে, যেখানে মোক্ষমূলরের মতে আদিমদের কুটীর থাকার কথা বলা হয়েছিল। অধিকন্তু সিন্ধু সভ্যতার পত্তনের পর সিন্ধু স্থানের চিত্র ঋগ্বেদের চিত্রের সঙ্গে পৃথক। সে স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাতপূর্ণ বন্যজন্তু সমাকীর্ণ ঘন বনের বদলে পাওয়া যাচ্ছে এমন স্থান—যেখানের অঞ্চল বৃক্ষহীন ও জন্তুশূন্য, শুষ্ক রসশূন্য, এবং যেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম। স্মুতরাং সেখানে মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার পত্তনের পর কোন আর্য্যজাতির বাস সম্ভব হ'তে পারে না। মোক্ষমূলরের কাল্পনিক আর্য্যদের অদৃশ্য হওয়ার পর আমরা

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাকে বৈদিক আর্য্যদের নগর বলে প্রমাণ করতে অগ্রসর হতে পারি। এর বিরুদ্ধে যুক্তি নিম্নে দেওয়া গেল,

(ক) প্রত্নতাত্ত্বিকদের স্তম্ভভিত্তিক বৃহৎ গৃহ—বৈদিক যজ্ঞের অংশ। চারটী বেদী যার ঢালু উত্তরদিকে, আর যায় দুইদিক বাথরুমের শ্রেণীর মত দুইদিকে ইটের দেওয়াল, তার উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞে যুপ প্রতিষ্ঠার জন্য। এই পরিকল্পনা ছিল যে এই পথে অনেক জল ফেলা ও ধৌত করার জন্য প্রয়োজন। চারটি বেদীর প্রয়োজন ছিল—চারি বেদের জন্য। ইহার উত্তরের বড় ঘর—যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বালন করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহার উত্তরে বৃক্ষের সারির অবশেষ ছিল—ইহাতে বোঝা যাবে যে পবিত্র বৃক্ষের জন্য উহা নির্দিষ্ট ছিল।

(খ) মৃতের সংকারের যাহা বৈদিক প্রথা—যথা দাহ, সমাধি এবং গৃহে অগ্নিহোত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল।

(গ) বৈদিক দেবতার জন্য পক্ষী ও পশুর প্রতীক ছিল। এই বৈদিক দেবতা—সূর্য্য, ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, গায়ত্রী, পর্য্যন্য প্রভৃতি।

(ঘ) পারলৌকিক বৈদিক চিন্তা যাহা যম এবং যমায়ন দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল তার বর্ণনার অস্তিত্ব দেখা যায়—হরপ্পার সমাধিপাত্র থেকে ( এস এম ভাট্স্ )।

"ঋগ্বেদের শম্বরাসুর ব্যাবিলনের হাম্মুরাবীর সঙ্গে এক বলে মনে করা যেতে পারে নিম্নলিখিত কারণেঃ—শম্বর শব্দ পার্শিতে হম্বর। হম্বর থেকে হাম্মুরাবি, শুধু উচ্চারণের পার্থক্য। হাম্মুরাবির বংশের পরের সম্রাট বংশই হল কাসসাইটগণ, যারা ইন্দো আর্য্য—সুতরাং ইহা ঋগ্বেদের দিবোদাসের বংশই হবে।" ৫৭

এই বিষয়ে পরে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করা হবে।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে গ্রীক সভ্যতাকে অনার্য্য অসিন্ধু সভ্যতা বলা যায় না এবং ক্রীট সভ্যতাও অসিন্ধু নয়।

---

৫৭ হিন্দু ষ্টেটস্ অব সুমেরিয়া, শঙ্করানন্দ : পৃঃ ৩৫, ৩৬ ভূমিকা।

সিন্ধুর দেবার্চ্চনাকে বৈদিক যজ্ঞের স্থানাভিষিক্ত করা যায় না। এই বিষয় পরে সুবিস্তৃত আলোচনায় প্রমাণ করা হবে।

প্রকৃতপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, তাতেই ইহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মহেঞ্জোদাড়োয় ব্যবহৃত সাংস্কৃতিক পদার্থ সুমেরে প্রচুর প্রমাণে পাওয়া গিয়েছে, পক্ষান্তরে সুমের থেকে মহেঞ্জোদাড়োতে খুব কমই এসেছে বা আসে নাই।

## পারস্য-সংস্কৃতির মুল ভারতীয়

উক্ত বিষযে কয়েকটী মত উদ্ধৃত করছি: "রলিনসন লিখেছেন, পারস্যসভ্যতার দ্বারা বৈদিক কালের ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তন হয় নাই। পারসিক-দের প্রভাব বৈদিক সভ্যতার পরবর্ত্তীকালের। আসীরীয় ও ব্যাবিলোনীয়গণ সিন্ধুদেশের অর্থসম্পদের সংবাদ ভাল ভাবেই জানতেন।"৫৮

পারস্য ও ভারতের দেবতা ও অসুর এবং ভাষাতাত্ত্বিক অদ্ভুতমিলের জন্য সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে বৈদিক সভ্যতা মূলতঃ মধ্যএসিয়া হতে উদ্ভূত, কিন্তু ভারততত্ত্বজ্ঞ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

কীথ লিখেছেন, "ফলতঃ ইহা স্পষ্ট যে এই দেবতাদের অস্তিত্ব আগেই ছিল; বাগজোকাইতে যে দেবতাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, তাহাতে ঋগ্বেদে এই চিন্তাধারা যে স্পষ্টরূপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে এবং ঋগ্বেদ নিশ্চয়ই সে সময় বর্ত্তমান ছিল"।

"এমন কোন বিষয় জানা যায় নাই যে নামের মিল ধরে কোন দেবতা অন্য কোন জাতির কাছে থেকে নেওয়া হয়েছে। ইহাতে খুব

৫৮ ইনটার-কোর্স বিটুইন-ইণ্ডিয়া এণ্ড ওয়েষ্টার্ণ ওয়ার্লড, রলিনসন: পৃ ৯৫

বেশী হলে, আমরা স্বভাবগত মিল নিয়ে তর্ক করতে পারি। এই রকম তর্কের উপর নিঃসন্দেহে জোর দেওয়া যেত, যদি ঋগ্বেদে সেমিটিক মূলীয় শব্দ ধার করা হয়ে থাকে, কিন্তু যদি ঋণ বলেই ধরা যায় তবে এ রকম মাত্র দুটী শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মানা অর্থাৎ গহনা এবং স্বর্ণ নির্মিত বলে বর্ণিত—যাহা বাবিলোনীয় শব্দের 'মীন' বলে ধরা যেতে পারে। তারপর পরশু অর্থে কুড়াল। এই শব্দ এতদূর বিচ্ছিন্ন যে এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। অসুর শব্দ অসার শব্দের সঙ্গে এক করা যায় না ( জে আর এ এস, ১৯১৬ পৃঃ ৩৬৪, কীথ )

হপকিনস্ লিখেছেন, "আর ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব যে ঋগ্বেদে ৩৬০ দিনের বছর ব্যাবিলোনীয় বছর থেকে নেওয়া। আরও অসম্ভব কথা যে পবিত্র সপ্ত সংখ্যাটি ব্যাবিলোনীয় নবম কথাতে পরিণত হয়েছে।" ( হ্যাপকিনস্ অরিজিন অব রিলিজিয়ন পৃ ২৯১ )।

হল লিখেছেন, "অবশ্য তর্ক করা হয় যে ভারতীয় অক্ষর যাহা মেসপটেমিয়ার মাধ্যমে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে এসেছিল, তাহা ফিনিসীয়-লিপি থেকে উদ্ভূত—কারণ মোবাইট প্রস্তরে ইহার মত লেখা পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু এই অনুমান এত অনিশ্চিত যে ইহার উপর কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না।" ( এনসিয়েণ্ট হিষ্টরী অব দি নিয়ার ইষ্ট; হল, পৃ ৪৫১ )।

কিথ লিখেছেন, "মোবাইট প্রস্তরের অস্তিত্বকাল খৃঃ পূ ৫৫০। লোহা, তামা, ও ব্রোঞ্জের মাধ্যমে সুমেরীয় প্রভাব স্পষ্টতঃ সিদ্ধান্ত যোগ্য হয় নাই; যদিও বলা হয়েছে যে তামা ও লোহা মেসপটেমিয়ার মাধ্যমে এসেছে। ইহা বলা যেতে পারে যে—যদিও ইলিয়ট স্মিথ জোর দেন—যে বৈদিক কালে ভারতীয় চিন্তার উপর মিশরীয় প্রভাব আছে এবং তিনি বিশ্বাস করতে চান যে খৃঃ পূঃ ছয় শতকের ভারতীয় চিন্তাবিকাশের এই ধারা; কিন্তু তিনি ইহাতে ভারতীয় উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকাশের ধারা অস্বীকার করেছেন। এই সময় ইরাণের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধও ভালভাবে প্রমাণ

হয় না, যদিও ভারতের অগ্নিসংস্কৃতি ইরাণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে, অসুর' নামের মধ্যে অসর শব্দের বুৎপত্তি থাকতে পারে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্যক্তিগতভাবে কোন অসুরের নাম থাকতে পারে।" ( রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড ফিলজফি অব দি বেদস, কিথ, পৃঃ ৫, ৬, ১৫, ২৫ ও ২৬ )

কীথ অন্যত্র লিখেছেন, "সুতরাং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে মিটান্নীর আর্য্যগণ পূর্ব্বদেশ থেকে এই দেশে এসেছিলেন; তাদের প্রবেশের সুবিধা হয়েছিল, কাসসাইটদের কবিলোনীয়া আক্রমণের সুযোগ। যেকবিও এই মত গ্রহণ করেছেন যে ইহাদের দেবতা ভারতীয় এবং পূর্ব্ব ইরাণীয় জাতি কর্তৃক আনীত হয়েছিল। ( জে, আর, এস ১৯০৯ পৃঃ ৭২১ ) মৌলটন ও এই মতের কতকটা সমর্থন করেন।" ৫৯

হল লিখেছেন, খৃঃ পূঃ ৩০০০ বছর পুর্ব্বে ভারত যে মিশর ও ব্যাবিলনের সঙ্গে সমতুলাভাবে তার নিজস্ব পৃথক সভ্যতার অধিকারী ছিল, তাহার সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইহা ভারতের মাটীতে গভীরভাবে প্রবিষ্ট পারিপার্শ্বিকের উপর, উপকরণের সমাবেশের দ্বারা, বহু বৎসর ধীর সাধনার ফল; ইহা এতকাল ধরে বিকাশমান আছে; ইহা এখনও বিশেষভাবে ভারতীয় এবং বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। স্থাপত্য, শিল্প, পোষাক ও ধর্ম্মে—মহেঞ্জোদাড়োর ইতিহাস ভারতের যাহা প্রকৃতিগত তাহারই চিত্র উৎঘাটিত করে।" ৬০

কালদীয় ভাষায় বৈদিক শব্দের বিষয় বালগঙ্গাধর তিলক উল্লেখ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে খৃঃ পূঃ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বৈদিক সংস্কৃতি মেসোপটেমিয়ার রাজাদের নিকট পরিচিত ছিল ইহা তাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করেছিল। ( কালাডয়ান এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান

৫৯ ( ইণ্ডো এরিয়ান, কীথ, ভাণ্ডারকার কমেমোরেশন ভলিউম পৃঃ ৮৫ )।
৬০ নিউলাইট অন দি মোষ্ট এনসিয়েন্ট ইষ্টং হল, পৃঃ ২২০

বেদস্, বালগঙ্গাধর তিলক; ভাণ্ডাবকার কমেমরেশন ভলিউম; পৃঃ ২৯)।

র‍্যাপসন লিখেছেন, "ইরাণের ভাষা সবচেয়ে পুরাতন গাথার ভাষা, যাহা স্বয়ং জোরাষ্টারের দ্বারা কথিত পুরাতন পারসী ভাষার পরবর্তী ধর্ম্মশাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ। প্রথম ডেরিয়াসের থেকে সুরু করে (খৃঃ পূঃ ৫২০) এবং পরবর্তী ডেরিয়াসের সময় পর্য্যন্ত (খৃঃ প্রঃ ৩৩৮) যে শিলালিপি পাওয়া যায়—সে সমস্ত গুলিই ঋগ্বেদের স্তোত্র, যাহা ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। শুধু শব্দ ও প্রবাদ বাক্য নয়, সমস্ত কবিতার ছত্রগুলি, শব্দ ও বাক্য পরিবর্ত্তন না করেই ভাষান্তরিত করা যায়, যদিও শব্দের চেহারাটি আফগানিস্তানে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানের জন্য পরিবর্ত্তিত হয়েছে, আর যাহা ভারতে গিয়েছে—তাদের পরিবর্ত্তন অনেক কম হয়েছে।"

"যে কথাই হউক না কেন, খৃঃ পূঃ ১৫ শতকে যে আর্য্য জাতির শাখা এসিয়া মাইনরের উত্তরে পশ্চিম ব্যবিলন থেকে মিদিয়া পর্য্যন্ত বিরাট অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাহার সম্বন্ধে বেশ প্রমাণ আছে। (ক্যাম্‌ব্রিজ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া, র‍্যাপসন; পৃ ৬৬)

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় ভাষার মূল বসতি যেখানে, সেখানে ভাষা গভীরভাবে মূল প্রবেশ করায় বলে, পরিবর্ত্তন কম হয়, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাষা, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং সেখানে গভীরভাবে মূল প্রবিষ্ট না করতে পারায় এবং সহজেই বেশীভাবে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, বেশী পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই বেশী পরিবর্ত্তনের জন্যই পারসী ভাষাকে মূল না বলে ভারতীয় ভাষাকে মূল বলে স্বীকার না করে উপায় নাই।

## বাহ্লীক বা ব্যাকৃত্রিয়ার সংস্কৃতি

বাহ্লীক সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখানে নীচে দুজন পণ্ডিতের গবেষণা উদ্ধৃত করছি।

বাহ্লীক বা ব্যাকত্রিয়া সম্বন্ধে কেনেডি লিখেছেন, "ব্যাক্ত্রিয়ান ও ভারতীয়গণের মধ্যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্লিমেণ্টাইন প্লেকর্ডে আছে (পৃ ৯ ২০) যে ভারতীয় রাজ্যে ব্যক্ত্রিয়দের মধ্যে অগণিত সংখ্যায় ব্রাহ্মণ আছে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সঙ্গীরা লিখেছেন যে, কাবুলের পার্ব্বত্য-জাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে বহুস্থানে এবং পরবর্ত্তী লেখকদের গ্রন্থে কাবুল ও ব্যাক্ত্রিয়ার মধ্যে ব্রাহ্মণের বিষয়ে প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায়। ৬১

এস বি চৌধুরী লিখেছেন, "কিন্তু বাহ্লীকদের বিষয় অথর্ববেদ পরিশিষ্টে আছে, এখানে তারা শক, যবন ও তুখারের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় যে, বৈদিক বাহ্লিকগণ অনেক উত্তরের লোক হবেন। বাহ্লিকগণ প্রয়ই পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে; ইহাতে তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটী বড় যোদ্ধাজাতি বলে পরিচিত। প্রাচীন কাহিনীতে এরা ক্ষত্রিয়শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত বলে উল্লিখিত আছে। এতে এরা বাহ্লিক দেশের অধিবাসী বলে বর্ণিত। শতপথ ব্রাহ্মণের বাহ্লিকপ্রতিপিয় কৌরবগণের রাজা। ইনি সম্ভবতঃ মহাভারতের বাহ্লিকপ্রতিপিয়দের সঙ্গে এক। রামায়ণের একটী কাহিনীতে এতদূর বলা হয়েছে যে এতে মনে হয় কুরুবংশ বাহ্লিকদের দেশ থেকে এসেছেন। রামায়ণের এই স্থানে আছে প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র ইলা বাহ্লিক দেশের রাজা। ইনি এই রাজ্য তাঁর পুত্র শশবিন্দুকে দিয়ে মধ্যপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরে একটী নগরী স্থাপন করেন। এখানে তাঁর অন্য পুত্র পুরুরবা ঐল রাজ্য পান। এই কাহিনীর

---

৬১ কৃষ্ণ, ক্রিশ্চিয়ানিটী ও গুজারং কেনেডিং জে. এস. বি ১৯০৭, পৃঃ ৯৫৯ নোট।

সূত্রে কুরুবংশের পূর্ব্বপুরুষ ঐলদের সঙ্গে বাহ্লীকের রাজবংশ কর্দ্দমদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ডাঃ এইচ সি রায়চৌধুরী বলেন যে বাহ্লীকের রাজবংশ কর্দ্দমের নামে পারস্যের নদীর নাম এসেছে এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে কর্দ্দম রাজগণের বাড়ী ইরাণের বাহ্লীক দেশে এবং ভারতের কোন প্রদেশে নয়। কর্দ্দমনদী জরফসানের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত, ইহা বোখারার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। কৌটিল্য কর্দ্দমযণির উল্লেখ করেছেন, আর তাঁর টীকায় আছে কর্দ্দম নদী পারস্যে। এন এল দে দেখিয়েছেন যে ফসবোলের মতানুসারে বোখার সমরখন্দের সামান্য উত্তর দিয়ে প্রবাহিত, ইহা ভাগবতের হাটকী নদী এবং অন্যান্য পুস্তকের হিরণ্যবতী, ইহা অর্থ স্বুবর্ণ নদী। জরফসান কথার অর্থও স্বুবর্ণ পরিবেশক। ইহার এই নামের কারণ, উহা উর্ব্বরার আধার। হুয়েনসাং লিখেছেন বে হুয়েরসা তাকে বলেছেন যে উত্তরে অক্ষুর ধারে কোহোলো নামে দেশ আছে এবং এই রাজ্যের রাজধানীর নাম রাজগৃহ। এই চীন দেশীয় নামটি বর্ত্তমানে বালখ দেশকে নির্দ্দেশ করে। এই বালখই আফগান তুর্কিস্থানে অবস্থিত এবং বাহ্লীকদের রাজত্ব।" ( এথনিক সেটেলমেণ্টস্ ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ; এ স বি রায় চৌধুরী পৃ ১০৮ ও ১১১ )

## স্থমেরীয় সভ্যতা ও ভারতীয়

স্থমেরীয় সভ্যতা ও যে ভারতীয় তার কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে ঃ—

স্বামী শংকরানন্দ লিখেছেন, "সিন্ধু উপত্যকার পুরাতন অঞ্চল খনন করায়, সম্প্রতি এই বিষয়ে নূতনতর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উর এবং অন্যত্রে স্থমেরীয় অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে, এই অজানা বর্ণমালায় খোদিত অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। বর্ত্তমানে সিন্ধু সভ্যতা উপত্যকা খননের ফলে যে সমস্ত শীলমোহর এবং

খোদিত লিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে ঐ সুমেরীয় অঞ্চলের বর্ণমালার অজ্ঞতা এবং অসামঞ্জস্যের ধারণা অপসারিত হয়েছে। ঐগুলি এখন সিন্ধুসভ্যতার শীল বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

সুমেরীয় শীলমোহর সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কার হওয়ার পর, হল সাহেবের মতবাদ ( সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব এই মতবাদ ) প্রবলতর হয়েছে সুমেরীয়গণ যে ভারত থেকে ইউক্রেতীয় উপত্যকায় গিয়েছে—ইহা এখন বাস্তব সত্য।" ৬২

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার "প্রাচীন ইরাক" গ্রন্থে লিখেছেন, সুমেরীয় সংস্কৃতির পুরোধাগণের আগমন হয়েছিল পূর্ব্ব-দেশীয় পাহাড় অঞ্চল থেকে, গিরি সংকটের মধ্য দিয়ে, সম্ভবতঃ ৪০০০-৩৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে। এই সিদ্ধান্তই এখন করা হয়েছে।" ( হিষ্টরী অব সুমের এণ্ড আক্কাদ, লিওনার্ড কিং পৃ ৬৫ ) "ভারতের সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল ঐ সময়ের কাছাকাছি সময়ে, হয়তো বা তার কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে। সুতরাং একথা মনে ওঠা স্বাভাবিক যে সিন্ধুসভ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে জাতি সেই জাতিরই একটি শাখা সুমের দেশে গিয়ে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ সিন্ধুদেশের মাহেঞ্জোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হরাপ্পা নামক স্থানে, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণের ফলে, মিশরে পিরামিড সৃষ্টির সম সাময়িককালের ( খৃঃ পূঃ ৩০০০ ) সিন্ধুসভ্যতার যে বিস্ময়কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাই থেকে অনেক মনীষি এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন যে ভারতের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতাই সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অগ্রজ—জগৎসভ্যতার পথ প্রদর্শক।" *

"সুমেরীয়রা আরব বা হিব্রুদের মত সেমাইট জাতির মানুষ ছিল না। তারা যে ভাষা ব্যবহার করত, তার মধ্যে সেমিটিক শব্দের প্রয়োগ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত একেবারেই পাওয়া যায় না, যা থেকে এই

---

৬২ হিন্দু ষ্টেটস্ অব সুমেরিয়া, শঙ্করানন্দ, পৃঃ ৫

কথাই প্রমাণ হয় যে যারা সেমাইটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিল তারা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের” ( হিষ্টরী ও সুমের এণ্ড আক্কাদ লিওনার্ড কিং পৃঃ ৬৩ )

“গোড়া থেকে সুমেরীয় লেখনকে চিত্ররূপবর্জ্জিত দেখা যায়। সুমের ও সিন্ধুবাসীদের লিখন প্রণালী ছিল একই রকমের। উভয় দেশের আবিষ্কৃত শিলমোহর গুলিও একই রকমের। ভারতীয় সংস্কৃতি যে ব্যাবিলোনীয়ায় অপরিচিত ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুমেরের উত্তর দিকে অবস্থিত অক্কাড দেশের কোন মন্দিরে প্রাপ্ত একটি মৃৎপাত্রে ভারতের ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন থেকে ) * * হরাপ্পায় কয়েকটি শিলমোহর পাওয়া গেছে, সুমের দেশে যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে আক্কাদীদের রাজত্বকালে, সে দেশে হরাপ্পা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে সুমেরীয় সহরগুলিতে কারবার—সম্ভবতঃ তুলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্যে বেশ ভাল করেই জাঁকিয়ে বসেছিল।

“তারপর থেকে সুমেরীয় ও ব্যাবিলোনীয়গণের দীর্ঘকাল সহাবস্থান করতে দেখা যায়। কিন্তু এখানকার সভ্যতার ইতিহাসমঞ্চে সুমেরীয়দের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল এবং ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির ভিত্তিপত্তন ও বিবর্ধন যে তারাই করেছিল তাতে আর সন্দেহ নাই।”

সুমের দেশের প্রথম সেমিটিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আক্কাদের রাজা সারগণের সময়। সারগণ সেমিটিক জাতীয় হলেও, বিদেশী ছিলেন না। আক্কাদীয় সেমিটীকগণের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবেই সুমেরীয় সংস্কৃতি। তাই, কি সমাজ ব্যবস্থা, কি ধর্ম্মাচরণ,—কোন বিষয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনি, কিন্তু দ্বিতীয় সেমিটিক অভ্যুত্থান হয়েছিল পশ্চিম দেশ থেকে বিদেশী আক্রমণের ফলে।”

“নিনেভের নিকট টেপি গওরা নামক স্থানে সাম্প্রতিক খনন কার্য্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দের প্রাচীন সহর আবিষ্কৃতই হয়েছে, আর সেখানে

৬৩ ( সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ষ্টেটসম্যান, ডিসেম্বর ২৯৬০) প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৯।

পাওয়া গেছে—মন্দির ও সমাধি ছাড়াও সভ্যতার বিবিধ উপকরণ, যেমন কারুকার্য্যখচিত সিলমোহর অলংকার আর পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্যূতক্রীড়ায় পাশা। ভস্মীভূত নগর আসুরের অঙ্গারস্তূপের তলে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বগুলির নিদর্শন থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আসীরিয়ার আদিম অধিবাসীরা সে মিটীকজাতীয় মানুষ ছিল না, তারা ছিল—সুমেরিয়দেরই—জাতি, মেডিটেরিয়ানজাতীয় এবং তাদের সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ সুমেরীয়।"

পক্ষান্তরে সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সমূহ প্রাগ-ইতিহাসের উপর যে রশ্মি সম্পাত করেছে তা থেকে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে সিন্ধুসভ্যতাই জগতের প্রাচীনতম সভ্যতা এবং এই অঞ্চলে বা নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে সুমের দেশে তাম্রযুগের নূতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল। তাই যদি হয়, তবে আদিকালের আসিরীয় সংস্কৃতিরও উৎপত্তিস্থান যে সিন্ধুপাঞ্জাব অঞ্চল, সে বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

এ বিষয়ে আসিরিয়াকে ব্যবিলোনীয় কাহিনীরই প্রতিরূপ বলা যেতে পারে অর্থাৎ সেমেটিক প্রাধান্য সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়নি, বরঞ্চ সেমেটিকরা ঐ দেশীয় আচার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে পুরাতন পদ্ধতির জীর্ণ দেহে বলের সঞ্চার করেছিল।"

মিদীয়রাজ উভক্ষত্র আর্য্যজাতীয়। ইনি পারস্যের উত্তরভাগে উপনিবিষ্ট হন। ৬০০ খৃঃ পূঃ ক্যালডিয়ান ও মিদীয় মিলিত বাহিনী আসিরীয় রাজধানী অবরোধ করার ফলে, আসুরী সাম্রাজ্যের পতন হয়। ক্যালডিয়ান নবোপোলানসার ছিলেন—আসোরিয়ার রাজার ব্যাবিলননগরীর শাসকপ্রতিনিধি। নবোপোলানসারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন—মিদীয়রাজ উভক্ষত্র এবং মিত্রতাবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য নবোপোলানসারের পুত্র নেবুক্যাডনাসারের সঙ্গে আপন পৌত্রীর বিবাহ দেন এবং সন্ধি করেন। সন্ধির মর্ম্ম ছিল এই যে উভয়ের মিলিত উদ্যোগে আসীরিয়া সাম্রাজ্যের ভগ্নপ্রায় সৌধকে ভূমিসাৎ করা হবে।'

ক্যালডিয়ানরা নূতন কোন সভ্যতা গড়ে তোলেনি। নদী উপত্যকায় দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করে, ব্যাবিলোনীয় সভ্যতাকে তারা পুরাপুরি গ্রহণ করেছিল।" ৬৪

"তাম্রযুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে। বাবিলনে লৌহ যুগ প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। আসীরিয়রা ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ও ঐতিহ্যে সমাজের কোন ক্ষেত্রে পারম্পর্য্য ভঙ্গ করেনি। সুদীর্ঘ তিন সহস্র বৎসরের অধিককাল ধরে নানান পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে বাবিলোনীয়া। ভাগ্যবিপর্য্যয়ও ঘটেছে তার বিস্তর। সেমেটিক জাতির সংস্পর্শ ও বিভিন্ন অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে, সংস্কৃতি শুধু খোলসই বদলেছে, তার প্রকৃতিগত মৌলিক কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি।" ৬৫

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে দেখা গেল যে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতা—ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতারই আশ। এ বিষয়ে ইহার পরেই একটু ভাল করে আলোচনা করতে ইচ্ছা আছে। ইহা প্রায় খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছর আগেকার সময়ের বিষয়। তারপর যাযাবর সেমেটীক জাতির আক্রমণে এই সুমেরীয় জাতি পর্য্যুদস্ত হয়ে নানাদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। পরবর্ত্তী আসুরিয়া এবং আক্কাদীয় সভ্যতা এই সুমেরীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল। সিন্ধু ও সুমেরীয় জাতি বিস্তৃত হয়ে, সেমেটীক জাতির মিশ্রণে এবং পরবর্ত্তী ভারতীয় আর্য্যসংস্পর্শে নূতনতর কয়েকটী জাতিরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। ইহারাই কালডীয় ও ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতি। কালডীয় ও ফিনিসীয়গণ যে স্পষ্টতঃ মূল ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরও প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে। এই সময় ভারতের সীমানা বর্ত্তমান পারস্য ও খোটানের বাহিরে অনেকখানি নিয়ে বিস্তৃত

৬৪ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; প্রাচীন ইরাক, পৃঃ ৩০৯।

৬৫ প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৬৯, ২০৭, ২১৬, ২১৭, ২৭৬ ও ৩০৩।

ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল— এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, গ্রীস আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এই বৃহত্তর ভারতের লোকদ্বারাই উপনিবিষ্ট হয়েছিল। এরাই ছিল এই বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রভাবাপন্ন আদিবৈদিক আর্য্যজাতি। সিরিয়ান, যবন, গ্রীক, ব্যক্ট্রিয়ান প্রভৃতি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি প্রথম স্তরের বৈদিক আর্য্যজাতির অনুরূপ ছিল। এদের কিছু পরে আরও কয়েকটি আর্য্য-জাতির পরিচয় মিশর ও পশ্চিম এসিয়ার ভূগর্ভখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের নাম ছিল হিকশোস, হিট্টাইট, মিটান্নি, কাসসাইট্ প্রভৃতি। এরা ভারতীয় আর্য্যগোষ্ঠী বলে প্রমাণিত হয়েছে। হিব্রু, ক্যালডিয়ান ও কিনিসিয়ানদের সঙ্গে এই আর্য্যগোষ্ঠীর রক্ত মিশ্রিত হয়ে যায়। এরা সিরিয়া, এসিয়ামাইনর ইরাক, গ্রীস ফিনিসিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে নিজেদের চিহ্ন লুপ্ত করেদিয়েছিল। এই অঞ্চলে হয়েছে আর্য্যসংস্কৃতির প্রভাবের প্রাথমিক আদিবৈদিক গোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মিশ্র উপনিবেশ। একথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

## নর্ডিক তত্ত্ব

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক ভাষার সঙ্গে গ্রীক, রোমীয় ভাষার সাদৃশ্য দেখে ইউরোপীয় সমাজকে আর্য্যগৌরবে গৌরবান্বিত করার জন্য ইউরোপ থেকে নর্ডিক জাতিদ্বারা গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চল উপনিবিষ্ট হয়েছিল —এই মিথ্যা রচনা করেছেন। বৈদিক ভাষার প্রাধান্য—যা পশ্চিমদেশে দেখা যায়, তার মূল কারণই এই আদি বৈদিক ভারতের বিস্তৃতি। ইউরোপের নর্ডিক জাতি খৃঃপূঃ১৫০০ বছর আগে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ইউরোপে এ সময় সভ্যতার উন্মেষ হয় নাই। এখানে যারা থাকত তারা যাযাবর পশু পালক স্তরের অবস্থার মানবগোষ্ঠী। উপরে যে সমস্ত জাতির উল্লেখ করা গেল—তাদের উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের অপসারিত করার মত বুদ্ধিবল প্রয়োগ এদের

পক্ষে সম্ভব ছিলনা। নর্ডিক অনু-প্রবেশের মত এখন অচল। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই সময়ের ইতিহাসের পট-ভূমিকায় যারা বুদ্ধিবল, এবং যশগৌরবে উদ্ভাসিত তারাই এ বিষয়ে যথার্থ সম্মানের অধিকারী। ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রীক জাতির মূল—এ বিষয়ে পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে বিশেষতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইহারাই উপরে বর্ণিত জাতিগুলি ; তবে এই সমস্ত আর্য্যজাতিকে প্রকৃত পরবর্ত্তী বৈদিক স্তরের সংস্কৃতির বাহক বলে মনে করলে ভুল হবে। পরবর্ত্তী বৈদিক সভ্যতা আদিবৈদিক সভ্যতা থেকে ভিন্ন গতিপথে যাত্রা করেছিল—ইহা বিভিন্ন স্থানে যথাসময়ে আলোচিত হবে।

## বৈদিক সভ্যতার দুই স্তর

সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয় স্তর, যাকে আদিবৈদিক স্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বলা যায়, সেখানে সিন্ধু ও সুমেরের প্রায়ই এক রকম। এর কারণ—মূলতঃ সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার বিস্তৃতি বলেই নির্দ্দেশিত করা যায়, কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ প্রথম স্তরের পরবর্ত্তী অবস্থা, যাহার সঙ্গে আদিবৈদিক সংস্কৃতির যোগসূত্র পাওয়া যায় সেই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে পরবর্ত্তী ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির বেশী মিল পাওয়া যায় না। এই স্তরে বৈদিক সংস্কৃতি ক্রমবিকাশ সূত্রে পৃথক ধারা গ্রহণ করেছে। পশ্চিম এসিয়ার এই যুক্ত-সংস্কৃতি সুমেরীয় সভ্যতার প্রথম থেকে দেড় হাজার বছর পর্য্যন্ত প্রায় একরকমই ছিল। আক্কাদীয় সভ্যতার প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এই সভ্যতার মধ্যে বিশেষ ভিন্ন প্রবাহের সৃষ্টি হয় নাই। বড় বড় রাষ্ট্রের উদ্ভব সত্ত্বেও এবং গ্রাম্য সংস্কৃতির দেবতার মাধ্যমে ইহারা একই ভঙ্গীতে জীবন পরিচালিত করছিল। এই প্রকৃতির দেবতাগুলির গুণ স্পষ্টতঃ পৃথক ছিল, যদিও পরবর্তীকালে ইহাদের মধ্যে একদেবতার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। ভারতেও বৈদিক সভ্যতার আদিপর্বে এইভাবই প্রকাশিত হয়েছে। এই যুগে বা এই

স্তরের শেষে ভারতে বৈদিক সভ্যতা পৃথক ধারা গ্রহণ করল। বৈদিক ভারত মানসিক চেতনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হ'ল। পশ্চিম এসিয়ায় বা সিন্ধু সভ্যতার অন্য জাতিগুলির মানসিক চেতনা অতটা অগ্রসর হতে পারে নাই। তাদের চিন্তা ভোগ এবং ইন্দ্রিয়বিলাসের দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। বৈদিক ভাবনা মানবজীবনের মধ্যে সত্য, সুন্দর মঙ্গল ও অমৃতত্ত্ব অনুসন্ধানে রত হ'ল। বৈদিক মনীষীরা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই এই পরম শ্রেয়ঃ বা ভূমাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সকল দেবতার মধ্যে এক সর্ব্বানুস্যূত পরমচেতনা, সর্ব্ব কামনার কেন্দ্রীভূত অনন্ত অব্যয় সত্তাকে দর্শন করার ফলে, তারা সকল দেবতাকেই এক পরম সত্তার প্রকাশ ভাবে দর্শন করে, আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দ্দেশ দিলেন। ইহাই হল পশ্চিম এসিয়ার সঙ্গে বৈদিক সাধনার পার্থক্যের কারণ। এই দুই সভ্যতা তুলনা করার জন্য বৈদিক সংস্কৃতিকে দুইভাগেই ভাগ করতে হবে। (১) আদি বৈদিক সংস্কৃতি (২) পরবর্ত্তী বৈদিক সংস্কৃতি। আদি বৈদিক অবস্থায় বহু দেবতা আছেন। প্রধান দেবতার আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু সকল দেবতার মধ্যে একই শক্তি বা গুণের প্রকাশের ধারণা আসে নাই। এই অবস্থা খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে দেড় থেকে দুই হাজার বছরের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত উভয় সভ্যতার বেলায় একই রকম ছিল। তারপর পরবর্ত্তী বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই যুগে ব্রহ্মবাদী চিন্তার উন্মেষ হ'ল, যার ফলে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি পৃথক ধারা গ্রহণ করল।

এত নিকটে অবস্থান ও লোকের উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সত্ত্বেও উভয় সংস্কৃতির মিলন হয় নাই, কারণ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক গতিপথ গ্রহণ করেছিল। এই বিরোধী সংস্কৃতির বিনিময় জোর করে করেছিলেন, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। আলেকজেন্দ্রিয়া তার মাধ্যম। আর প্রেম দিয়ে করেছিলেন অশোক; যার সাক্ষ্য আছে—খৃষ্টীয় এবং মুসলিম ধর্ম্মে এবং সমস্ত জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

## সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণীত হয় নাই

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন, কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। প্রথমতঃ মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সঙ্গে পরবর্ত্তী বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে পারসিক সভ্যতার সম্বন্ধেও ঐরকম প্রহেলিকা—এক বৈদিক সভ্যতা হওয়া সত্বেও অসুর ও সুর নামের পার্থক্য অথচ এক দেবতাকেই দুই জায়গায় দেখা যাচ্ছে। তারপর হেলেনিক, ইহুদীয় এবং খৃষ্টীয় সভ্যতার সঙ্গেই বা ভারতীয় সভ্যতার সম্বন্ধ কি, এদের মধ্যে ক্রমবিকাশের যোগসূত্র আছে কি না এবং তাহা কি—এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা কোন পাশ্চাত্য বা দেশীয় পণ্ডিত করেন নাই বা করতে পারেন নাই; নানাপ্রকার স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তিতার জন্য প্রকৃত সূত্র ধরবার উপেক্ষাই ইহার প্রধান কারণ বলে মনে হয়। বর্ত্তমান লেখকের চেষ্টা যাতে এই সমস্ত অসংলগ্ন ভ্রান্তিমূলক গবেষণা যথার্থ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়।

## ভারতের মানবসভ্যতার স্তর বিভাগ

মানব সমাজের অজ্ঞাত অতীতের আদিম অবস্থার পর থেকে বর্ত্তমানের সুসভ্য অবস্থা পর্য্যন্ত ভারতের মানবের সভ্যতার বিকাশকে ৫টি স্তরে ভাগ করা যায়। আরও বেশী আদিম অবস্থায় গিয়ে লাভ নাই। এর আগের স্তরে মানুষ পশুপালক যাযাবর শ্রেণীর জীবন যাপন করত। মাটীর সঙ্গে স্থায়ী বসবাসের সম্বন্ধ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কৃষি শিল্প ছিল অজ্ঞাত।

### প্রথম স্তর

(১) প্রথমটি—প্রথম স্তর। সিন্ধুসভ্যতার নাগরিক অবস্থার আগে কৌমগত গ্রাম্য সমাজের যৌথ সামাজিক এই অবস্থাটিকে

নির্দ্দেশ করা যায়। তখন নগরগঠন বা বড় বড় দলগুলির একত্র সমন্বয় সাধিত হয় নাই। অগ্নি দেবতার অর্চ্চনা প্রচলিত; অগ্নিকে কেন্দ্র করে নৃত্যবাদ্যের উৎসব। এই সময়ের দেবতা মোটামুটিভাবে গ্রাম্যদেবতা; আদি মাতা ও আদি পিতা। পূর্ব্বপুরুষপূজা, বলিদান প্রভৃতি এ সময়ের বিশেষত্ব। টোটেম, মানা প্রভৃতি এদের আইন এবং বড় বড় ঋতু মহোৎসবে এদের দলগত সম্মেলন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দলের বাহিরে দলগত যৌনসংসর্গ, ব্যক্তিগত বিবাহবন্ধন নাই। ঘরগুলি নলের বেড়া এবং খড়পাতার ছাউনি। মাটীর মেঝে। ইহার সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। গ্রাম্য সম্পত্তি কৌমের দ্বারা যৌথভাবে ভোগ্য। অল্পস্বল্প কৃষিকার্য্য, শিল্প কার্য্য এবং পশুপালন অনেকটা অগ্রসর। সমাজ নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ এবং তাম্র যুগের আরম্ভ অবস্থায়।

## দ্বিতীয় স্তর

(২) দ্বিতীয় স্তরে মানব মন আরও বিস্তৃত হয়েছে। জাতিগঠন সম্পূর্ণ হয়েছে। বহু গ্রামের কৌম সমবায়ে নাগরিক সমাজ বা রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। বহু কৌমের দেবতা, সর্প, বৃক্ষ প্রভৃতি টোটেমের একত্র সমাবেশ হয়েছে। অনেক টোটেম মানা একত্র মিলিত হয়ে সমন্বয় সাধিত হয়েছে: দেবতা জাতিগত; পারিবারিক ও সামাজিক নীতি, বিধি ও নিষেধ এবং তার জন্য আচার ব্যবহারের কঠোরতা এসে গিয়েছে, যেমন, প্রসূতিচর্য্যা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের নিয়মাদি; কৃষিকার্য্যের জন্য প্রকৃতির উপর বেশী নির্ভরশীল হওয়ায়, প্রকৃতির দেবতাকে সমাজে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে; সূর্য্য, অগ্নি চন্দ্র, ঝড়বৃষ্টির দেবতা প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা-বন্দনার উদ্ভব হয়েছে। বংশগত বর্ণবিভাগ নাই। আদি পিতা ও আদি মাতার স্থান একটুও নামে নাই। পিতৃমাতৃ পূজা ও শ্রাদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। মন্ত্র ও আদিমাতার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির আবির্ভাব এই যুগেই হয়েছে। মন্ত্রশক্তি এবং দেবতার আবেশ, ভূতচিকিৎসা, বলিদান

প্রভৃতির প্রবল প্রসার; চিকিৎসা, গণিত, পুরাণ কাহিনী, সঙ্গীত—মোটামুটি ভাষার এই সময়ে, বিকাশমুখী গতি। পশুপালন, পোতারোহণে নদী বা বৃহৎ জলাশয় পারাপার, গোশকটের ব্যবহার প্রচলন, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও মন্দির, পৌরগৃহ নির্ম্মাণ, এ সময়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইহাই আদি বৈদিক যুগের সূচনা। এইটিকে মহেঞ্জোদাড়োর ও সুমেরের সভ্যতার অবস্থা বলা যায়। পুরোহিত পরিচালিত সমাজ; দিগ্বিজয় নাই।

এই যুগে ব্যক্তিগত বিবাহও সম্পত্তির উদ্ভব। এটিকে তামা বা ব্রোঞ্জ সভ্যতার যুগ বলা যায়। সমাজে এখানে পিতৃ পরিচালিত হলেও মাতৃতান্ত্রিকতা যায় নাই। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন এবং পিতৃগত সমাজ।

## তৃতীয় স্তর

(৩) এই স্তরে সমাজ আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পিতৃগত সমাজ, আইনরীতি নীতি খুব ভালভাবে বিধিবদ্ধ হয়। ভাষার উন্নতি, সমুদ্রে বাণিজ্য বিস্তার, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতিষ চিকিৎসা, অস্ত্রশস্ত্র, রথ প্রভৃতি—আত্মবিস্তারের বিস্তীর্ণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এই সময় বহু দেবতার সমন্বয় করা হয়েছে। বহু দেবতার মধ্যে প্রধানের আবির্ভাব হয়েছে। ইন্দ্র বা ইন্দ্রের মত দেবতা সকল দেবতার ক্ষমতা আকর্ষণ করে প্রধান দেবতা বলে গণ্য হয়েছেন।

সব দেবতা এক প্রধানের গুণেই বিশেষিত হচ্ছেন। সমাজ প্রবৃত্তি মুখী। কর্ম্ম ভোগ-মুখী—স্বর্গই লক্ষ্য। নগরগুলির সমবায় বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পরলোকের চিন্তা প্রবল; বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করে মহামহোৎসব। যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারোণ ও ঘৃতাহুতির ধূমে আকাশে ধূম্রাচ্ছন্ন; আদিমাতা ও আদি পিতা গ্রাম্য কোণে যোগশাস্ত্র ও তন্ত্র সাধনার মধ্যে উদ্বোধিত হয়ে পরবর্ত্তী বিরাট অভ্যুত্থানের

উদ্যোগী হয়েছেন। দেবতার ধারণা জাতিগত, যদিও মানসিক গুণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত। বর্ণবিভাগ হয়েছে; গুণগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। জীবনসাধনাও চারিভাগে বিভক্ত; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ধর্ম্ম ও নীতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত ও শাস্ত্র রচিত। সঙ্গীত, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ সমাজনীতি ও সূত্র প্রভৃতি নূতন নূতন বিদ্যার আবির্ভাব। শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি। গোযান, অশ্বরথ, উষ্ট্র, সমুদ্রপোত, লৌহাদি ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সভ্যতার সর্ব্বায়তন বিকশিত। জন্মান্তরবাদ এবং কর্ম্মবাদ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। স্বর্গ নরক এবং নানাপ্রকার সৎকার্য্য অসৎ কার্য্যের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ স্বরূপে বিরাট গল্প ও কথা-সাহিত্যের ও ব্রত এবং পার্ব্বনাদির সৃষ্টি। একদিকে যজ্ঞ, অন্যদিকে পিতৃতর্পণ; মন্ত্র, অভিচার; দৈবাবেশ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্যকলাপের অবির্ভাব। বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, দিগ্বিজয়, উপনিবেশ সৃষ্টি প্রভৃতি এই যুগের বিশেষত্ব। বিবাহ ব্যক্তিগত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ।

সব দেবতাই এক প্রধান দেবতার অধীন; তাঁর গুণে বিশেষিত হচ্ছেন, অথচ ব্রহ্মবাদ নাই। জীবন প্রবৃত্তিমার্গী, অথচ কর্ত্তব্যবাদে প্রতিষ্ঠা আছে। কর্ম্ম ভোগমুখী—স্বর্গই লক্ষ্য। এই স্তরটি আদি বৈদিক স্তর। এ সময় বর্ণবিভাগ আছে, কিন্তু উহা গুণ ও কর্ম্মগত। জীবনযাত্রার বিভাগ ৪টি, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। শেষ ২টি বিভাগ ব্যাপক নয়, ইহা অসাধারণ। এটিকে নূতন লৌহযুগ বলা যায়।

## চতুর্থ স্তর

(৪) এই যুগে ব্রহ্মবাদের উদ্ভব। এক অব্যক্ত, অনাদি, অচিন্ত্য, সত্তা, সর্ব্বভূতে অনুস্যূত। জীবনযাত্রা নিবৃত্তিমুখী। কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের উপর জীবন দর্শনের অধিষ্ঠান। ৪টি বিভাগ ও আশ্রম স্বীকৃত থাকলেও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যৌন-পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। ৪টি বিভাগ

থাকলেও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে। পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি—ভাগবত, শৈব প্রভৃতি মতের বিস্তার। যজ্ঞের স্থলে ধ্যান, জপ এবং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা আত্মবিকাশ ও ঈশ্বরলাভ। মনের ভূমির ঊর্দ্ধে আত্মবিস্তার। চিন্তাধারা সর্ব্বাত্মবাদী। বর্ণবিভাগ বংশগত। যুদ্ধ ও দিগ্বিজয় মন্দীভূত। সর্ব্বপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র এবং সমাজশাস্ত্র ও পুরাণের রচনা এবং শাস্ত্রচর্চ্চার ও বিচারের বিরাট বিস্তার; কিন্তু ভারতের বাইরে ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের সভ্যতা ভারতের বাইরে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

## পঞ্চম স্তর

(৫) এই ৪র্থ স্তর থেকেই আধ্যাত্মিক বিকাশ নানা শাখা এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নানা ধারায় অগ্রগতি লাভ করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চতুর্থ স্তর থেকেই বিশ্বমানবতার অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৩য় শতকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের বাহিরে মনোরাজ্যের এপারের জাগতিক উন্নতির জন্য সাধনা প্রবৃত্তিমুখী গতিলাভ করেছে আর ভারতের মধ্যে, উন্নতির সাধনা নিবৃত্তিমুখী আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, মনোরাজ্যের পরপারের দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মীগতি লাভ করেছে।

বৌদ্ধ জৈন, ভাগবত, শৈব, তান্ত্রিক মায়াবাদী, যোগী, নাস্তিক, অধ্যাত্মবাদী নিরাকার, প্রতীক বা সাকারবাদী, সহজবাদী, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নানা প্রকার মতের মাধ্যমে এই অধ্যাত্মবিকাশ পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। অবশ্য খৃঃ পুঃ তৃতীয় শতকের পরবর্ত্তী কালে ভারতের বাহিরে এবং ভিতরে সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক বিকাশের লক্ষণ অনুভব করা যায়। এই পরবর্ত্তীকালের আধ্যাত্মিক বিকাশের উৎপত্তিস্থল ভারত এবং মূল উৎস হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। ভারতের বাইরে এই ব্রহ্মবাদী স্তরের বিস্তার আরম্ভ হয়েছে উপনিষদ ও

বৌদ্ধধর্ম্মের মাধ্যমে, খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের পর থেকে। ইহার পূর্ব্বে বাণিজ্য ও উপনিবেশের মাধ্যমে, যা কিছু ঔপনিষদিক ও দার্শনিকতত্ত্ব বিস্তৃত হয়েছে, গ্রীক, এসিয়া মাইনরের মাধ্যমে এই বিস্তারের দ্বারা পশ্চিম এশিয়ায় বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মাধ্যমেই কার্য্যকরী ভাবে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এইজন্য ভারতীয় অধ্যাত্মবিকাশের আলোচনা করতে হলে পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস নৃতত্ব, ধর্ম্ম ও ভাষাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার হয়।

অধ্যাত্মবিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সভ্যতা পশ্চিম এশিয়া ও ভারতে প্রায় একই রকম। ইহাই সিন্ধু স্তর বা তার পূর্ববর্ত্তী অবস্থা। ইহা গ্রাম্য ও নাগরিক স্তর। নাগরিক স্তরে গ্রাম্য স্তরের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। এমনকি বর্ত্তমানযুগেও গ্রাম্য স্তরের সংস্কৃতির অভাব নাই। দ্বিতীয় স্তরটিতে দেবতা কৌমগত বা সমাজগত হলেও গুণগত বা বিশ্বগত হতে পারে নাই। তৃতীয় স্তরে, দেবতা গুণগত স্তরে উন্নীত হয়ে উঠেছে; যদিও এই স্তরে দেবতা রাষ্ট্রগত বা জাতিগত, তবুও এই সমাজে যথার্থ ধর্ম্মীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে। এই জন্য আমাদের তৃতীয় স্তর থেকেই প্রকৃত আলোচনার আরম্ভ হয়েছে। এই তৃতীয় স্তরের বিস্তৃতিই পশ্চিম এসিয়ার নিজস্ব ধর্ম্মীয় সাধনার ক্রমবিকাশ। ইহা ভাল করে আলোচনা করতে হলে, পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীনতম মানচিত্র আলোচনা প্রয়োজন।

## পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন মানচিত্র

এবার প্রাচীনকালের মানচিত্রের বিবরণ ডোনাল্ড এ মেকেন্জির "মিথস্ অব ব্যাবিলনিয়া এণ্ড এসিরিয়া" গ্রন্থ থেকে এবং শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "ইরাণের ইতিকথা" থেকে নীচে তুলে দিচ্ছি।

## (১) মেকেনজির মানচিত্র

পারস্য উপসাগর থেকেই আরম্ভ করা যাক্। (১) পারস্য সাগরে বেহেরিন দ্বীপ। পারস্য সাগরের উত্তর তীরে সাগর উত্থিত সিল্যাণ্ড, তার কিছু উত্তরে এরিদু—পারস্য সাগরের প্রাচীন বন্দর, এখানে দুই নদীর মোহনা—ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস। এখান থেকেই সুমের আরম্ভ।

এই মোহানা থেকে আরম্ভ এরেক, লারসা, তারপর উরুক। পারস্য সাগর থেকে টাইগ্রীস নদীর উত্তর দিকে যাত্রা করলে প্রথমে লাগাস, তারপর নিপ্পর। সুমেরের উত্তরেই ব্যাবিলন ছিল। সুমেরের পতনের পরে সমস্তটাই ব্যাবিলন হয়। তার উত্তরে আক্কাদ। আক্কাদের উত্তর-পূর্ব্বে আসুর রাজ্য; আসীরিয়ায় পশ্চিম এবং ব্যাবিলনীয়ার উত্তরে প্রাচীন মেস্পটেমিয়া, আসীরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইলাম এবং ইলামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মিদিয়া; আসিরিয়ার উত্তরে নাইরিয়া। নাইরিয়ার উত্তরে নাইরি ভূখণ্ড আর্ম্মেনিয়া, আর্ম্মেনিয়ার উত্তরে উরারাটু; ইহা আরারত পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গিয়েছে। ইহার পশ্চিমে বর্ত্তমানের এসিয়া মাইনর; এসিয়া মাইনরের দক্ষিণে সিরিয়া, তারপর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপাড়ের দক্ষিণ দিকে মুস্রি, তার উত্তরে ফিলিস্তিন এবং উহার পূর্ব্ব পার্শ্ব জুড়ে প্যালেষ্টাইন; প্যালেষ্টাইনের উত্তরে ফিনিসিয়া; তার উত্তরে লেবানন, তার উত্তরে সিরিয়া; ইহার পূর্ব্বে আমুরু। আমুরুর পূর্ব্বে আরব মরুভূমি। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরভূমির উত্তর অংশে তাবাল, তার উত্তরে মুসকী, মুস্কির পশ্চিমে সাইলিসিয়া। আরাবাট উপত্যকার উত্তরে হাট্টি। হাট্টিদেশ এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত। উহার পশ্চিমে লিডিয়া প্রভৃতি রাজ্য।

## (২) শচীনবাবুর মানচিত্র

শচীনবাবুর ইরাণের ইতিকথার মানচিত্রটি সহজ বোধ্য। তাতে আছে পারস্য উপসাগরের উত্তরে ইউফ্রেটিসের তীরে ব্যাবিলন; ব্যাবিলনের পূর্ব্বে ইলাম, ইলামের উত্তর-পূর্ব্বে বাহিস্তান পাহাড়,

তার উত্তর পূর্ব্বে মিদিয়া, মিদিয়ার উত্তরে উরুমিয়া হ্রদ। ব্যাবিলনের উত্তরে আসিরিয়া; আসিরিয়ার উত্তরে পারস্য ক্যাসপিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে পারস্য সাগরের উত্তর পূর্ব্ব কোণের পাশে পৌঁছল। পারস্যের পূর্ব্বে বাহ্লিক, সমরখন্দ, তুখার, কাশগড়, খোটানা প্রভৃতি দেশ।

## সিন্ধু সভ্যতার সীমানা

উপরের মানচিত্র থেকে দেখা গেল যে সিন্ধু সভ্যতা একটি ছোট খাট স্থানীয় সভ্যতা নয়। ইহা একটা নগর বা দুইটি নগরের সভ্যতার নিদর্শন নয়।

### (৩) ডাঃ মোড়ে ও কুঞ্জগোবিন্দবাবুর মানচিত্র

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সভ্যতার সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে, এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী মানচিত্রের দিকে নজর দেওয়া দরকার। বর্ত্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আগেকার পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশের উত্তরে হরপ্পা এবং দক্ষিণে সিন্ধু মোহনার কাছে মহেঞ্জোদাড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক সিন্ধুসভ্যতার স্থান অবস্থিত। বর্ত্তমানে আরও ভুখনন দ্বারা নূতন আবিষ্কার হয়েছে। ইহার দক্ষিণে চানহুদাড়ো, তারপর অসিরি—এইভাবে আরও দক্ষিণে এই সভ্যতার ভগ্নাবশেষ বিস্তৃত হয়ে, নর্ম্মদা তাপ্তির তীর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। চানহুদাড়োর পশ্চিমে বামপুর এবং তার কিছুটা পরেই পারস্য সাগর। এই পর্য্যন্ত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার পারস্য সাগরে বাহরিন দ্বীপে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে। ৬৬ বামপুরের পশ্চিমে স্তুক্তাসেন দোর—একেবারে পারস্য সাগরের তীরে; সেখানেও সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬৭

---

৬৬ হরপ্পা কালচার এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট, ডাঃ হেইনংসে মোড়ে, পৃঃ ৩ ও ৯।

৬৭ প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো, কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর বিবরণী পৃঃ ১৬৪ ও মানচিত্র।

## সিন্ধুসভ্যতার প্রসারই সুমের সভ্যতা

পারস্য সাগরের তীর পর্য্যন্ত সিন্ধুসভ্যতা বিস্তৃত। এই সিন্ধু সভ্যতার শেষ হ'তে না হতেই সুমেরীয় সভ্যতার সীমার আরম্ভ। এই সুমের সভ্যতাও আবার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটীস উপত্যকার অধিকাংশে বিস্তৃত ছিল। এই দুই নদীর উপত্যকায় দক্ষিণাংশই প্রাচীন সুমের। এখানেই উহার প্রাচীন নগর এরেক, এরিদু, লাগাস, উর, লারসা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল। এই নদী উপত্যকার বিষয়ে ঐতিহাসিক লিওনার্ড কিং বলেন, "খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ সহস্র বৎসরের মাঝামাঝি, সুমেরীয় সভ্যতার উদ্ভব বলে জানা গিয়েছে। এই সময়টিই যে এই সভ্যতার পত্তন—তাহা সঠিক বলা যায় না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে বাবিলোনিয়া আসার আগেই এই জাতি উচ্চ স্তরের সভ্যতায় উপনীত হয়েছিল। ইহাদের কীলক অক্ষরে লিখনের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি যাহা, এই সময়েই এদের আয়ত্ত হয়েছিল। লিখন প্রণালীতে চিত্রলিপি পদ্ধতিই সব চেয়ে পুরাতন; এই অবস্থায় এদের চিত্রাক্ষরের অবস্থা, অতিক্রান্ত হয়ে কীলকাক্ষরে এসে দাঁড়িয়েছিল।" ৬৮

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "এই সংস্কৃতির পুরোধাগণের আগমন হয়েছিল পূর্ব্বদেশীয় পাহাড় অঞ্চল থেকে গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে ৪০০০। ৩৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে—এই সিদ্ধান্তই এখন করা হয়েছে। ভারতের সিন্ধু সভ্যতাও উদ্ভব হইয়াছিল, ঐ সময়ের কাছাকাছিই, হয়তো বা তার কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে। সুতরাং একথা মনে ওঠা স্বাভাবিক যে সিন্ধু সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে জাতি, সেই জাতিরই একটি শাখা, সুমের দেশে গিয়ে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হরাপ্পা নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক

---

৬৮ হিষ্টরী অব সুমের অ্যাণ্ড আক্কাদ, পৃঃ ৬৫ লিওনার্ড কিং

খননের ফলে, মিশরের পিরামিড সৃষ্টির সমসাময়িক কালে (খৃঃ পূঃ ৩০০০) সিন্ধু-সভ্যতার যে বিস্ময়কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাই থেকে অনেক মনীষী এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন যে ভারতের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতাই সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অগ্রজ, জগৎ সভ্যতার পথ প্রদর্শক।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, "সুমেরীয় সংস্কৃতি প্রাচীন ভারত থেকে এসেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উলি মনে করেন, সুমেরীয় ও হরপ্পা সংস্কৃতি—উভয় সভ্যতাই বেলুচিস্তানের কোন প্রাচীনতর সংস্কৃতির বংশধর।" ব্যাবিলনের প্রাক-সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, "যে নবীনত্ব ও আবিষ্কার প্রাকসুমেরীয় সভ্যতার রূপ প্রকাশ করে, তাহা কি ব্যাবিলনের মাটীর নিজস্ব নয়?—এবং উহা কি ভারতীয় প্রেরণায় ফল? যদি তাই হয়, তাহলে কি সুমেরীয়গণ সিন্ধুদেশ থেকে এসেছে? তাও যদি না হয়, অন্ততঃ ইহা মনে করা যায় কি যে ইহা সিন্ধুদেশের নিকটতম স্থানের প্রভাবের ফল?" ৬৯

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক এবং কতকগুলি বৈদেশিক পণ্ডিতদের চেষ্টায় এখন ইহা সন্দেহের অতীতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে এই প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের নিজস্ব; এই অর্থে ইহার প্রভাব দীর্ঘজীবন রক্ষা করেছে, পরবর্ত্তী ক্রমবিকাশের মধ্যে বিশেষতঃ ধর্ম্মীয় এবং শিল্পকলার বিষয়ে, ইহার মূল খোঁজ করলে, ইহাকে স্থানীয় পরবর্ত্তী সভ্যতার ধারাবাহিকরূপেই প্রমাণ হয়। ইহা অন্ততঃ সিন্ধুদেশের নিকটতম স্থানীয় প্রভাবের ফল। এ বিষয় ডাঃ মোড়ে ও রাধাকুমুদবাবুর মত নিম্নে উল্লেখ করছি।

৬৯ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন হরাক, পৃঃ ২৭ ও ২৮

## প্রফেসর মোডের গবেষণা

বিখ্যাত জার্ম্মাণ প্রত্নতাত্ত্বিক হায়েনৎস মোডে বলেছেন—দিনেমার খননকারীদের বেহেরিন দ্বীপ আবিষ্কারের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয় মুদ্রিত হয়েছে। ইহাতে শীলমোহর, ষ্ট্যাম্পমোহর পাওয়া গিয়েছে, যাহা একেবারে নূতন এবং যাহাকে মনে করা যায় যে উহা স্থানীয়। এদের সঙ্গে দক্ষিণ মেসপটেমিয়ায় শীল খননে-আবিষ্কৃত মোহরের নিশ্চিত সাদৃশ্য আছে, আর তার সঙ্গে ভারতের উত্তর পশ্চিমের ঐ রকম বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এই বেহেরিন দ্বীপটি পারস্য সাগরে অবস্থিত এবং মেসপটেমিয়া সাগরতীর থেকে বেশীদূর নয়, আর সেখান থেকে উরুক এবং এরিত্থু খুব সহজেই যাওয়া যায়। অপরপক্ষে বেহেরিন দ্বীপ থেকে জাহাজে পারস্য ধরে সিন্ধুর মুখে যাওয়া যায়। ইহাই দাবী করা হয়েছে যে তৃতীয় সহস্রপূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বেহেরিনের বণিকগণ ভারত ও নিকটপ্রাচ্যের সঙ্গে অন্ততঃ সমুদ্র পথে বাণিজ্যের আদান প্রদান করত।” “মেসপটেমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে পাওয়া গিয়েছে যে উরনগরে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত বণিককুল ছিল, যারা ‘আলিক দিলমুন’ নামে আর এক বণিকদলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। এই শেষের দল উর আর দিলমুনের মধ্যে ব্যবসা করত, আর দিলমুনকে বলা হয়েছে এমন এক জায়গা, যেখানে অনেক ব্যবসায়দ্রব্য পাওয়া যেত। লেখা থেকে পাওয়া গেছে যে সেখানে তামার বাণ্ডিল, অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্য তামা, মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, লাপিস লাজুলি, হস্তীদন্ত, বাসনপত্র, চিরুনী, দুষ্প্রাপ্য কাঠ, আর এমন অনেক জিনিষ, যা মেয়েরা ব্যবহার করে—যেমন চোখের লাগান রং ইত্যাদি। এখানে লিখনে পাওয়া যাচ্ছে “মাকান ও মেলুইহার” নাম। এখানে অথবা বেহেরিন থেকে এগুলি নানা দেশে বিক্রি হোত অথবা এমন হতে পারে যে দিলমুন ভারতে অবস্থিত ছিল। শেষের এই মতটি আমেরিকার

সুমেরতত্ত্ববিদ পণ্ডিত এস এন ক্রেমারের সম্মতি আছে। ইনি দিল্লীতে এই বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। একথা ধরে নিলে আমাদের হরাপ্পার কথা বলা লাগেনা; বলতে হবে হইা দিলমুন সংস্কৃতি।" সুমের ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের কথা সন্দেহের অতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

লোথালের খনন-কার্য্যে প্রমাণ হয়েছে যে এই নগরটি ছিল বন্দর। এখানে কতকগুলি শীলমোহর পোড়া-মাটির মূর্ত্তিতে জাহাজ, বলদে টানা গাড়ী, আর তার সঙ্গে ভারী শলাকাবিহীন চাকা দেখা যায়,এতে প্রমাণ হয় যে, খুব ভারী জিনিষ বহন হোত। দূরান্তের' জিনিষ অবশ্য ভারবাহী জন্তুর পিঠেই নেওয়া হোত।' "গ্রাম্য সংস্কৃতি চতুর্থ সহস্র খৃঃ পূঃ থেকে সিরিয়া, উত্তর মেসপটেমিয়া, ইরানীয় উপত্যকা, পূর্ব্ব ইরানীয় সীমান্ত এবং ভারতের সীমান্ত অংশগুলি ব্যাপ্তকরে বিরাজ-মান ছিল। এই সকল স্থানে এমন কতকগুলি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাতে একই রকম আর্থিক ও সমাজিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যেমন মৃৎপাত্রের কৌশল, শীলমোহর ও মাদুলীর নির্ম্মাণ, মৃত্তা, ও বাসনপত্র, ধর্ম্মীয় বিশ্বাস, যেমন উর্ব্বরতা শক্তি এবং মাতৃ-দেবতার অর্চ্চনা আশ্চর্য্য ভাবে একই রকম। একটা বিষয়ে লক্ষ্য আকৃষ্ট করতে চাই যে ভারতে মাতৃ দেবতার মূর্ত্তির সংস্কৃতি নাগরিক সভ্যতায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রকের প্রভাব দেখা যায় কিন্তু সুমেরের স্থানীয় দেবতার অর্চ্চনায় প্রকাশিত দেখা যায় না, আর এই অর্চ্চনা নাগরিক দেবতার পূজায় পরিণত দেখা যায়, যাহা কালে আঞ্চলিকদের সমাজ এবং তারপর ঐক্যবদ্ধতার ফলে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ক্রীটের বেলায়, যদিও উহা পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট, তা হলেও একে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন ভাবে মাতৃদেবতার সংস্কৃতি উৎপন্ন করতে দেখা যায়, যার সাক্ষাৎ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না।

ভারত ও ক্রীটের মধ্যে এই রকম অনেক বিষয়ের সাদৃশ্য

আছে যাহা উপরে বর্ণিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু সিরিয়া ও ইরানীয় উপত্যকায় গ্রাম্য সংস্কৃতি যাহা নগরসভ্যতায় উন্নীত হয় নাই, তার সঙ্গে এই ক্রীট সংস্কৃতির সাদৃশ্য থাকায়—এই বিষয় দাবী করা যায় যে এই রকম গ্রাম্য সংস্কৃতি উত্তর পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে ইরাকীয় পূর্ব্ব উত্তর এবং পশ্চিম, উত্তর মেসপটেমিয়া এবং সাইপ্রাস দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধ ছিল।"

মাতৃদেবতার মূর্ত্তি সম্বন্ধে, বলতে পারা যায় যে মহেঞ্জোদাড়োর পোষাকপরা নারীমূর্ত্তির স্তন মুক্তাবস্থায়, অথচ মাথায় উচু মুকুট রয়েছে। তার নিকটবর্তী সাদৃশ্য রয়েছে ক্রীট এবং সিরিয়ায়; অপরপক্ষে পশ্চিম এশিয়ায় অন্যত্র ভিন্নপ্রকার নিয়ম দেখা যায়। এই সঙ্গে বলা যায় যে, সুমের ও মিশরে মাতৃদেবতা, যা পরবর্ত্তী ব্যাবিলনে পাওয়া গিয়েছে, তাহা সূক্ষ্মভাবের এবং কখনও কখনও বেহালার আকারের; এই রকম মূর্ত্তি আমরা উত্তর মেসপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর ও গ্রীক দেশে এবং উত্তর ইরাণে দেখি। হাসুন্নায় পোষাকী স্ত্রী মূর্ত্তি; আর ফরমো, তেল হালাথ এবং ক্রীটের নব্যপ্রস্তর যুগের মাতৃদেবতার মূর্ত্তিই সকলের চেয়ে পুরাতন মূর্ত্তি, যা পশ্চিম এশিয়ায় এবং পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত আবিষ্কারের হিসাবে হরপ্পার সংস্কৃতি আরও বেশী প্রাচীনকালের নির্দ্দেশ করে।"

"সিরিয়োক্রীট বিষয়ক মাতৃমূর্ত্তির কতকগুলি আনুসঙ্গিক জিনিষের সঙ্গে ভারতের মিল দেখা যায়, যেমন, মাতৃদেবতার সঙ্গে ঘুঘু, সাপ প্রভৃতি থাকা। ইহা বিশেষতঃ ক্রীটে দেখা যায়; ইহা নিশ্চয়ই বৃক্ষ পূজার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এই সকল নিদর্শন মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় দেখা যায়। লোথালে কতকগুলি পাত্রে সাপের এবং গাছের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মাতৃদেবতার মূর্ত্তির চারিদিকে ঘুঘু বেষ্টন করে আছে—এমন মাতৃদেবতার মূর্ত্তি ক্রীট, টেপ হিসসায় এবং মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গিয়েছে। ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

এই দুইটি সংস্কৃতির আর একটা সাদৃশ্য আগেই পাওয়া গিয়েছে—ষাঁড় সংস্কৃতির ব্যাপারে। ষাঁড়ের যুদ্ধের নিদর্শন হরপ্পায় ৩৫ নং মূর্ত্তিতে দেখা যায়। ক্রীটশিল্পে আরও ক্রীড়াশীল মূর্ত্তি দেখা যায়, যুবকদের যাঁড়ের উপর উঠে খেলা করতে দেখা যায়। ( ফিগ ; ৩৬ )। "সমবেত নৃত্য, চারজন বা সাতজনের মিলিত নৃত্যের চিত্র ভারতীয় অঞ্চলের ছবিতে দেখা যায়—এর সঙ্গে ইরাকীয় উপত্যকার ছবির সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় মাতুলী, শীল ও পাত্রের উপর আলঙ্কারিক চিহ্নগুলি কিডনি এবং হৃদয়ের আকারের, এর সঙ্গে সিরিয়ার নিকটতম সাদৃশ্য। মহেঞ্জোদাড়ো, চানহুদাড়ো ও ঝ ঝুকরের আটটি ঢাল সজ্জিত একটি অদ্ভুত মূর্ত্তির সঙ্গে ক্রীটের স্তম্ভলিপির তুলনা করা যায়। এই নিদর্শন ক্রীটে খুব প্রিয় ছিল। ক্রুশ, ( সরল এবং ধাপযুক্ত ), স্বস্তিকা, জটিল বেষ্টনীর নমুনা—ভারতের ষ্ট্যাম্পশীলের নিদর্শনরূপে ব্যবহৃত ; ইহার ঠিক জুড়ি পশ্চিম ইরাণ সিরিয়া ও ক্রীটের আবিষ্কারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।"

মহেঞ্জোদাড়োয় একটি পদকের শিকারদৃশ্য চিত্তাকর্ষক। একটি শিকারকে শিকারীরা ধনুর্বাণ নিয়ে সম্মুখীন হয়ে বাণ বিদ্ধ করেছে। ঠিক একই রকম দৃশ্যের শীল পাওয়া গিয়েছে সুসা থেকে এবং ক্রীট থেকে ; আর একটি পাওয়া গিয়েছে প্যালেষ্টাইনের মোগদ্দো থেকে।

পরবর্তীকালে ইহা আসীরিয়া শিল্পে নেওয়া হয়েছে। ইহা উল্লেখ করা যায় যে বানরের নিদর্শন দক্ষিণ মেসপটেমিয়ায় প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু ভারতীয় নিদর্শনগুলিতে ইহা খুবই বিশিষ্ট। এই শিল্পের স্বাভাবিক ভঙ্গী ও সৌন্দর্য্য ক্রীটেপ্রাপ্ত কতকগুলি বানরের মূর্ত্তিতে বেশ স্পষ্ট, কিন্তু মিশরের বানরের দৃশ্য অন্য প্রকারের।

আসুরের একটা স্তম্ভলিপির দেবতা, যিনি রক্ষাকর্ত্তা ও প্রভু, তাহাকে দুইটি ছাগকে খাওয়াতে দেখা যাচ্ছে ; আবার মিনেট এল বেইদায়, সিরিয়ার উপকুলে ক্রীট মাতৃদেবতাকেও ঐভাবে দেখা যায়। কারকেমিসের একটা ক্ষোদিত পাথরের একজন মানুষকে

জানুর উপর উপবিষ্ট এবং জন্তু পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। ইহা ভারতীয় মূর্ত্তির পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে পশ্চিমী শিল্পে, ভারতের প্রথা—যাহাতে পা' সমানভাবে শরীরের নীচে রেখে বসার কায়দা—তাঁহা দেখা যায় না। আমি জানি যে খাফাজি থেকে আনীত সুমেরীয় ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে এই ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু একটি ইরাণীয় শীলে, পশুর সৌন্দর্য্য—আমার ভাষায় বলছি, দেখা যায়। ইহা আমরুদের প্রাপ্ত হাতীর দাঁতের শীল। (ফিগ ৭৪) প্যালেষ্টাইনে প্রাপ্ত ক্রীটের শীলে ইহাই দেখা যায়।"

"ভারতের ক্ষোদিত চিত্রের নিদর্শন—একটি নৃত্যশীলা নারী (ফিগ ৭৭-৭৮), ভারতীয় শিল্পে শুধু নয়, ইহা পাশ্চাত্ত্য জগতে চালান হয়েছে। ইহার প্রমাণ—অল্প কিছু দিন আগে আরব উপকূলে এই রকম একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির দ্বারা, পাওয়া গিয়েছে।"৭০

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ডাঃ মোডের সর্ব্বশেষ আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই:

## ডাঃ মোডের গবেষণার সার

(১) ভারতের গোদাবরীতট পশ্চিম এশিয়ার সীমান্ত ও ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্যন্ত খৃঃ পূঃ চতুর্থ সহস্রকে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাহা প্রকৃতপক্ষে, একই সংস্কৃতির সভ্যতা। সুমের ও সিন্ধু সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

(২) এই দুই সংস্কৃতিরও মূলে আর একটি গ্রাম্য সংস্কৃতি এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছিল, যার থেকে এই নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। ঐ সংস্কৃতি আরও বহু প্রাচীনতর।

(৩) ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার সম্বন্ধ সুমেরীয়

---

৭০ দি হরাপ্পা কালচার ডাঃ হাইনৎনে মোডে পৃঃ ২, ৩৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১ ও ১২

সভ্যতা অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে ইরানের পূর্ব্ব-উত্তর এবং পশ্চিম-উত্তর মেসপটেমিয়া ও সিরিয়া এবং সাইপ্রাস দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল।

(৪) সিন্ধু সভ্যতায় বাণিজ্যব্যপদেশে সুমেরের বন্দর ও পারস্য সাগরের বাহিরিন দ্বীপে জাহাজ পথে সংযোগ ছিল।

(৫) সিন্ধু সভ্যতা ভারতের নিজস্ব সভ্যতা। ইহা বহিরাগত নয়। স্থানীয় পরবর্ত্তী সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে।

## সিন্ধু সভ্যতা জাতীয় নয় ইহা সাংস্কৃতিক

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মানচিত্রের দ্বারা কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সুবিস্তৃত সিন্ধুসভ্যতা গঙ্গাযমুনার সঙ্গম এলাহাবাদ থেকে দক্ষিণে গোদাবরী তট পর্যন্ত অনেক অনেক নগরের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে, আরব সাগরের তীর দিয়ে পারস্য সাগরের কুল, ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রিস উপত্যকা, ক্রীট এবং বর্ত্তমান ইরানের ও বেলুচিস্তানের বাসযোগ্য অংশ নিয়ে প্রসারিত ছিল। এই বিস্তৃত এলাকায় নানা প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট জাতির লোকের বাস ছিল। তাদের মিলিত সংস্কৃতিই সিন্ধুসংস্কৃতি। অন্য পথ ধরে এই সিন্ধুসভ্যতা বিস্তৃত হয়ে, ভারতের উত্তর, ইরানের পূর্ব্ব-উত্তর এবং পশ্চিম-উত্তর মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং সাইপ্রাস দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে—ইহা প্রফেসর মোড়ে দেখিয়েছেন।

ঠিক এইজন্য আর্য্যসভ্যতাকেও কোন বিশিষ্ট জাতির সঙ্গে সমগোত্রীয় মনে করা যায় না। আর্যগণ ভিন্ন জাতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাদের সংস্কৃতিকে একটি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি বলে নাম দেওয়া যায় না। এই বিশিষ্টতা দিতে গিয়ে অনেকে ভুল করে বসেছেন। দ্রাবিড় জাতীয় শব্দ বৈদিক তথা উত্তর ভারতের মাগধী-ভাষার মধ্যে বহুল পরিমাণে আছে; তাদের রক্তও যে নাই তাও জোর করে বলা যায় না। উহাও একটি মিশ্র সংস্কৃতি; সম্পূর্ণভাবে

বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর Vedic Retualismএ বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা এক জাতিতাত্ত্বিক সমষ্টিভুক্ত ছিল না; অথচ তারা ছিল একই সংস্কৃতিভুক্ত।

সিন্ধুসভ্যতা হচ্ছে মূল সভ্যতা এবং চতুপার্শ্বের জাতিগুলি কখনও সন্ধিসূত্রে কখনও বা বিবাহাদিসূত্রে মিলিত হয়ে পরবর্ত্তীকালে বৈদিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। সিন্ধুসভ্যতায় সকল জাতিরই দান আছে। ইহা দ্রাবিড় বা আর্য্য বা সুমের বা ক্রীট বা এলামের একচেটিয়া কিছু বলে প্রমাণ করা অসম্ভব।

## সিন্ধুসভ্যতা প্রাচীনতম
### রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মত

ইতিপূর্ব্বে হল সাহেবের মত—যে সিন্ধুসভ্যতা সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং উহা দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত, তাহা উল্লেখ করেছি; মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও ঐ মত। তিনিও সিন্ধুসভ্যতা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা দেখিয়েছেন। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "চিকাগো ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের ইরাক এক্স্পিডিশনে সুদূর উর এর নাম দিয়ে একটি শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে সিন্ধুসভ্যতা থেকে আনীত বস্তুর উল্লেখ আছে। ইহাতে সিন্ধুসভ্যতার কাল নির্ণয় নিঃসন্দেহে করা যায়। ঐ শীলমোহরে ব্যাবিলনে অজ্ঞাত জন্তু—যেমন হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি চিত্রের বিশিষ্ট ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইহা সিন্ধুদেশ থেকে আনা হয়েছিল এবং বাগদাদের এস্নুন্নাতে খৃঃ পূ ২৫০০ শতকের আগে পৌঁছেছিল। এখানে সিন্ধুর বিশেষ দ্রব্যের সাদৃশ্যজ্ঞাপক চতুষ্কোণ শীলমোহরে এককেন্দ্রিক চিহ্নবিশিষ্ট কৌশল যাহা মেসোপটেমিয়ায় নিশ্চিতভাবে পাওয়া গিয়েছিল, এবং মহেঞ্জোদাড়োতে যাহার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, নিশ্চিতভাবে তাহার ভারতীয় বিশিষ্টতাপূর্ণ মালা, আকাদীয় মালার মধ্যে গাঁথা ছিল এবং মহেঞ্জো-

দাড়োর বিশিষ্ট কিডনি আকৃতি বিশিষ্ট অস্থি যাহা মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া যায় নাই—তাহার দ্বারা ইহার উৎপত্তিস্থান বুঝা যায়।

এখানে ভূগর্ভ খনন কার্যের ফলে পরপর ৫টি স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যথা (১) লারসা স্তর (খৃঃ পূঃ ২১৮৬ ও ১৯৩১) (২) সারগণিক স্তর (৩) ও (৪) সারগণিক স্তর, ফলক ও শীলের ক্ষোদিত লিপিযুক্ত, (৫) উরের সমাধির সমসাময়িক বক্রীকৃত ইটের তৈরী বাড়ী। ইহাতে উর বাগদাদ থেকে প্রায় ১০০০ বছর পূর্ব্বকালীন স্তর বলে গণ্য হয়। ইহার কাল মিঃ উলির মতে খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছরের মত হবে। ইহা সত্য হলে ব্যাবিলনিক সভ্যতা মিশরের সভ্যতার চেয়ে আগেকার হয়। মিশরের সম্রাটবংশের সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ খৃঃ পূ ৩০০০ বছরের আগে নয়। এই সিদ্ধান্ত—সিন্ধু সভ্যতাকে আরও প্রাচীন বলে প্রমাণ করবে। যাহাই হউক এই সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়ো স্তরের শুধু এই প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নয়—ইহা ডঃ এইচ ফ্রাঙ্কফোর্ট (ইরাক ভুখননকারিদের ফিল্ড ডিরেক্টর)—দি টাইমস-এ ১৯৩২ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত পত্রে দেখিয়েছেন।" ৭১

খৃঃ পূঃ ৩৫০০ শতক পর্যন্ত সিন্ধু নাগরিক সভ্যতার বয়স বলে স্থির করা হয়েছে। এই সভ্যতা এত বিস্তৃত ছিল যে ইহার অনেক আগের একটি গ্রাম্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইহা উৎপন্ন হয়েছে, তাহাও প্রমাণিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরলে এই সভ্যতার স্থানীয় রূপ আরও অনেক প্রাচীন বলে প্রমাণ হয়ে পড়ে। ক্রীট, সুমের, ইলাম, মিশর সভ্যতাকে ইহার পরবর্ত্তী এবং ইহা থেকে সংযোগসূত্রে উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

## মার্শাল ও কুঞ্জগোবিন্দ বাবুর মত

মার্শাল—সিন্ধুসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনতত্ত্ব দেখিয়েছেন। কুঞ্জগোবিন্দবাবুও মার্শালকে সমর্থন করেছেন। কুঞ্জগোবিন্দবাবুও

৭১ হিন্দু সিভিলিজেশন ১ম খণ্ড রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২৭।

দেখিয়েছেন, "এখানকার শিল্প সমসায়িক ইজিপ্ত, সুমের ও ইলাম প্রভৃতি দেশের শিল্প অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানকার মত এত চমৎকার গৃহ অন্য কোথাও দেখা যায় না; এখানে যে স্নানাগার আছে এরূপ স্নানাগার এত প্রাচীনকালে কোথাও ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানকার মৃৎপাত্রের চিত্রও তুলনাহীন। সাধারণ বয়নকার্য্যের জন্য ইজিপ্তে প্রচলিত শনজাত সুতার পরিবর্ত্তে এখানে তুলার সুতা ব্যবহৃত হত। এখানকার লেখা ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকলেও ইহা যে অধিকতর উন্নত প্রণালীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সহর প্রতিষ্ঠার সময়েই যে অধিবাসীদের অত্যন্ত উন্নত প্রণালীর সভ্যতা ছিল—ইহা জোর করিয়া বলা যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা, গৃহ নির্ম্মাণে নিপুণতা এবং শিল্প কর্ম্মাদির উৎকর্ষ প্রভৃতি দ্বারা মনে হয় এই সভ্যতা বহু শতক পূর্ব্ব হইতেই সুরু হইয়াছিল এবং ইহার পত্তন এই দীর্ঘকালের ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ। "উর, কিস্, সুষা লাগাশ, উম্মা, তল, আস্মর, মস্থুলের নিকটবর্ত্তী টেপেগত্তরা এবং সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রায় ২৯।৩০টি শীলমোহরকে গ্যাড, ল্যাংডন, ফ্রাঙ্কফোর্ট, স্পাইজার, ঈঙ্গহোল্‌ট প্রভৃতি পণ্ডিত—সিন্ধু সভ্যতার বিশিষ্ট শীলমোহরের প্রণালীতে নির্মিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"৭২

## রাধাকুমুদবাবু ও ডাঃ হলের দ্রাবিড়তত্ত্ব খণ্ডন

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সিন্ধুসভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব দেখিয়েছেন। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মী লিপির সেমেটীকমূলত্ব সম্বন্ধে যুক্তির অসারত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি হলের দ্রাবিড় তত্ত্বের প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নাই। এই দ্রাবিড় তত্ত্বের খণ্ডন সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা যাচ্ছে।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর হিন্দুসিভিলিজেশন ১ম খণ্ডের

৭২ প্রাঃ মঃ, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী পৃঃ ৫৮, ৬০, ৬২।

৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "১৮৬৭ সালের প্রাক্কালে, মিঃ ই, টমাস সন্দেহ করেছিলেন যে আর্য্যগণ তাহাদের অভিযানের সময়ে তাদের নিজেদের কোন অক্ষর লিপি সৃষ্টি করতে পারেন নাই, কিন্তু যে সমস্ত দেশে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন সেই সমস্ত দেশের উপরই নির্ভর করেছিলেন; এই সব দেশের ভাষাতেই তাদের কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই পুরাতন মত অগ্রাহ্য হয়েছে এবং ব্রাহ্মীলিপির মূলে সেমেটিক লিপি আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ১ম সহস্রকে কিনিসিয়া থেকে আনীত হয়েছে। প্রায় ছয় শতক পরে প্রফেসার ল্যাঙ্গডনের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হওয়ার জন্য—যে ব্রহ্মীলিপিগুলি সিন্ধু চিহ্ন থেকে গৃহীত হয়েছে; ইহা সিন্ধু উপত্যকার প্রাগার্য্য-দের শীলমোহরে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে তিনি বলেন যে আর্য্য সংস্কৃতভাষিগণ তাদের নিজ ভাষাকে এই অক্ষরগুলির মূল্যদান করেছেন। ইহার অর্থ এই যে তাদের ভাবমূলক অর্থগুলি সংস্কৃততে অনূদিত করেছিলেন এবং ইহাদের বর্ণানুযায়ী অর্থ সংস্কৃত শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে বোধ হবে যে দ্রাবিড়ভাষীরাই ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আগমনের আগে ভারত অধিকার করেছিল। তারা এসেছিল উত্তর পশ্চিম থেকে; পথে তাদের ভাষা ব্রাহুইভাষীদের পথে রেখে এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল। মেসোপটেমিয়ায় ও ইরানে কখনও কখনও দ্রাবিড় আঞ্চলিক নামের চিহ্ন পাওয়া যায়, আবার মিটান্নীতে (খারিয়ান) কথিত একটি প্রাচীন ভাষায় দেখা যায় যে বর্ত্তমান দ্রাবিড়দের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল রয়েছে।"৭৩

আর্য্য আক্রমণ বা দ্রাবিড় আক্রমণের কাহিনী যে গল্প তাহা পূর্ব্বে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটাও একটা প্রমাণ যে বহিরাগত দ্রাবিড়দের ও আর্য্যদের আক্রমণ প্রমাণ করতে হলে তাদের ভারতে পরিচিত হওয়ার আগের স্থানটিতে তাদের

৭৩ হিন্দু সিভিলিজেশন পৃঃ ৪১ ও ৪২।

আক্রমণ করে জয় করার মত অবস্থা প্রমাণ হওয়া দরকার। খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতকের পূর্ব্বে মধ্য বা পশ্চিম এসিয়ায় এরূপ কোনও আর্য্য-জাতির পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দ্রাবিড়দের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর বৌদ্ধযুগে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে দ্রাবিড়নামের জাতি পাওয়া যায় না। মনুসংহিতার মধ্যে দ্রাবিড়দিগকে অন্যান্য জাতির সঙ্গে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলে বর্ণিত আছে।

## দ্রাবিড়ের জাতিতত্ত্ব

পি, টি, এস আয়েঙ্গার, তাঁর "দি এজ অব মন্ত্রসে"র ৭ পৃষ্ঠায় বলেন, "বৈদিক যুগের প্রায় এক হাজার বছর পরে দ্রাবিড় ভাষার জন্ম।" (এজঅব মন্ত্রস, ৭ পৃঃ ৭) গ্রীমার্স´ন বলেন, "তামিল ভাষার প্রথম রচনা রামচরিত, ১৩ হইতে ১৪ খৃঃ মধ্যে ; প্রাচীন কেনারি ভাষা দশ হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রবর্তিত হয়, তেলেগু রচনা সর্ব্বপ্রথম খৃঃ ১০৫০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ। ৭৪

নৃতাত্ত্বিকদের—এই মত যে দ্রাবিড়রা অধিকাংশ নাগ জাতি হইতে উদ্ভূত। নাগজাতি সমস্ত ভারতে বিস্তৃত ছিল।

গ্রীয়ার্স´ন অন্যত্র বলেছেন, "ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে ইহা বোধ হয় যে দ্রাবিড় ভাষা দক্ষিণের অসভ্য জনসমষ্টির ভাষা" হইতে উদ্ভূত হয়েছে। আর দ্রাবিড় জাতিটি অতি প্রাচীন কালে সুদূর প্রাচ্য—ভারতের মন-খেমের জাতির সংমিশ্রণ লাভ করেছে। ৭৫

রিচার্ডসন, দ্রাবিড়গণের মূলে প্রথমে নিগ্রয়েড মিশ্রিত মেলানেসীয় জাতির রক্ত আছে, বলেছেন। আর তারপর সর্পপূজক নাগজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্য জাতির তত্ত্বও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নাগজাতি চওড়ামাথা বিশিষ্ট, মধ্যম দৈর্ঘ্য এবং নাক সরু মোটা বিভিন্ন স্তরের। হ্যাডন তাঁর রেসেশ অব ম্যানের ৫৬ পৃষ্ঠায়

৭৪ লিঙ্গু-ইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ভল ৪, পৃঃ ২৮২ এবং জার্ণাল এ, এস, (১৯০) কৃষ্ণ মেনন পৃঃ ৭৬৩)।

৭৫ লিঙ্গু-ইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ভলু, ৬, পৃঃ ২৩।

বলেছেন, "অনার্য্যগণ যমুনাগঙ্গা উপত্যকায় প্রবেশ করে দেখল যে সর্পপূজা মতবাদের হলুদবর্ণ বিশিষ্ট নাগজাতি সেখানে রহিয়াছে।"

"তামিল, মলায়লম ও মঙ্গলী জাতির চওড়া মাথা, খর্ব্বকায় এবং মংলী জাতি বাদে, নাক মধ্যম। মলায়লমের মধ্যে মংলী জাতির ও তামিল, তেলেগু, কানাড়ী জাতির ঐ দুই বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। নায়ার, টিয়া, ভল্লালার, আগামুদায়া, তেলেগু, কাপু, বলিগা, গোল্লা, তুরিয়া, জেলেয়া, সকল ক্যানারীরা এবং অস্পৃশ্য হোলিয়াদেব নাক সরু, সুতরাং বেশীর ভাগ দ্রাবিড়রা চওড়া মাথা, খর্ব্ব, সরু নাক, ঢেউ তোলা চুল এবং এদের গায়ের রং নানারকম। তামিল ও মলয়ালিদের মধ্যে মংলীরক্ত কিছু আছে। এদেরও চওড়া মাথা। তেলেগু ও ক্যানারিদের মধ্যে কিছু গোল মাথা আছে। সম্ভবতঃ এদের মধ্যে বাঙালী রক্ত আছে।" ( Some Dravidian affinities, Richards. )

দ্রাবিড় ইতিহাসের মধ্যে তোলাকাপ্যাম প্রভৃতি পুরান তামিল সাহিত্য থেকে যে প্রমাণ পাওয়া, যায় সেই সকল আলোচনা করে কনকসভাই, "তামিল ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে" গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তামিল দেশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে দাক্ষিণাত্যের আদিম পার্বত্য ও মৎসজীবীদের পরবর্ত্তী প্রথম বিজেতারাই নাগগণ। এই আদিমদের নাম ছিল বিল্ববর ও মীনবর। নাগেরা ভীগণা কালীদেবীর উপাসক ছিলেন। ইহাদের প্রথম শ্রেণী ছিল আরিভার। ইহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। বড় সহরের বাহিরে ইহাদের আশ্রম ছিল। আরিভারের পরবর্ত্তী শ্রেণী ছিল উলাভার। এরা কৃষক, অভিজাত ও ভূম্যাধিকারী। তাদের ভাল্লালও বলা হইত। চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজারা ও তামিলদের ছোট ছোট সর্দ্দারেরা বল্লাল জাতি সম্ভূত। বল্লালেরা গঙ্গাকুল, কারণ তারা গঙ্গা উপত্যকার শক্তিশালী গঙ্গারিদই জাতির বংশর।"৭৬

৭৬ তামিল ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে, কণক সভর্ষে পৃঃ ২২৭।

পুরাতন তামিল গ্রন্থে, নাগ প্রভৃতি জাতি হইতে দাক্ষিণাত্যের সভ্যতার বিস্তার হয়েছে, তার উল্লেখ আছে। কেরল, মলয়ালম, চের, চোল, পাণ্ড্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মারাভার, বল্লাল, থিরায়ার বনবার, মোরিভার প্রভৃতি জাতি, পূর্ব্বভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট হয়েছেন—একথা পুরাতন তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায়। কেরল শব্দটি চের থেকে এসেছে। চেরগণ যে উত্তরপূর্ব্ব ভারতবাসী—একথা কনকসভাই দেখিয়েছেন।

ডাঃ দত্ত দ্রাবিড়মূলীয় সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন,

"True from our investigation, we arrive at the conclusion that Rigvedic India included the greater part of Northern India. though the East and the south were not unknown to the travellers of the Age. Moreover the sample of urn burial discovered in Travancore, the extreme Southern part of India may lend colour to the view that the Indo—Aryans might have wandereded there as well. The tradition of the Nambudri Brahman corroborates the sugsestion sufficiently. ৭৭

মালয়ালম গেজেটীয়ার বলেন যে মালয়ালমের সকল উচ্চ জাতিই বহিরাগত। ফারগুসন ও কনকসভাই, নেপালী ও মালয়ালম ভাষার সম্বন্ধ, স্থাপত্যরীতি ও বৈবাহিক আচারের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে সিদ্ধান্তও করেছেন যে উহারা একই জাতি।

"প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের আগে কোন ব্রাহ্মণ উপনিবেশ দাক্ষিণাত্যে হয় নাই ( তামিল ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে, কনকসভাই, পৃঃ ২১৩ ) এইচ রায় চৌধুরী প্রমাণ করেছেন, "খৃষ্টপূর্ব্ব নয় শতকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে এবং জনক রাজাকে খৃষ্টপূর্ব্ব শতকের পূর্ব্বে ধরা যায় না। বিদেহরাজাদের পরবর্ত্তী কালে

৭৭ Vedie Retualism, Dr. B. N. Dutt, p 141

( অর্থাৎ চম্পবাসী রাজ্যের ব্রহ্মদত্তদের সময়ে ) আর্য্যগণ বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন—একটির নাম বেরার অর্থাৎ বিদর্ভ, তারপর দণ্ডক, কলিঙ্গ ও অশ্বক। এই রাজ্যগুলি বাদে দাক্ষিণাত্যের দূরবর্ত্তী দেশগুলি অনার্য্য জাতিদ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ইহারা শবর, পুলিন্দ এবং সম্ভবতঃ মুটিব। ৭৮

"কেরলপুত্তম নামে একটি মালয়াল প্রাচীন পুস্তকে আছে যে পরশুরাম মালানাদকে সমুদ্র থেকে উত্থিত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা উপনিবিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তারা সাপের ভয়ে পালিয়ে যান, তখন তিনি শূদ্র জাতি আনান, ইহারা পূর্ব্বঘাট মালার লোক; সমস্ত পেরুমালই বহিরাগত।৭৯

রায়চৌধুরী বলেন, "যদিও দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল অরণ্য পরিবৃত ছিল, আর আর্য্য ঔপনিবেশিকরা গোদাবরীর উত্তর তীর অধিকার করে রেখেছিল। ঋষিরা তুঙ্গভদ্রা এমন কি সিংহল পর্যন্ত অণুপ্রবেশ করেছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতকে বেশ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে কাত্যায়ণ ও মেগাস্থিনিসের বিবরণের সময় আর্য্যগণ পাণ্ড্য রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছেন।" ৮০

প্রিজুলস্কি বলেন, "যদি আমার মতই ঠিক হয় তবে এই যে বর্ত্তমান দ্রাবিড়গণের রক্ত যদিও মিশ্রিত, তবুও ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী বলিয়া ধরিতে হইবে; আরও যদি ইতিহাস অনুসরণ করিয়া যাওয়া যায় তবে বুঝা যাইবে যে ইহারা এখানে আগে থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়রা যে বাহির হইতে অভিযান করিয়া আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না;

৭৮ বোম্বাই গেজেটীয়ার ভল পার্ট পৃঃ ৩০৯ এবং এপি, ইণ্ডিকা, ভল ১ পৃ ৮।

৭৯ গেজেটীয়ার অব মালাবার, পৃঃ ২৫।

৮০ Study of Indian Antiquities, H. C. Roy Choudhury (p 60 t 62)

সুতরাং আমাদের জ্ঞানের বর্তমান সীমার মধ্যে প্রাক্‌দ্রাবিড় কথাটির কোন অর্থ হয় না। কেহ যদি মুনুজ স্তস্রব হওয়ার আগেকার, আদিম "দ্রাবিড়ভাষী" নাম ব্যবহার করতে চান, তবে আমার প্রস্তাব যে প্রাক্‌দ্রাবিড়শব্দ ব্যবহার না করে দ্রাবিড়মূলীয় শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

গেট বলেন, "সমস্ত ভারতের মধ্যে মুণ্ডাদের একপ্রকায় শারীরিক-গঠনের মিল দেখলে, মুণ্ডা ও দ্রাবিড়রা যে অনাদিকাল থেকে এখানে বাস করছে, তাহা বোঝা যায়। এই দীর্ঘকাল ধরে পরস্পর বিবাহ, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিকপ্রভাবে ইহাদের দলগত প্রভেদ নষ্ট হয়েছে এবং এক একটি জাতিতাত্ত্বিক এককে পরিণত হয়েছে। কোন প্রাগার্য বহিরাগমণের প্রমাণ না থাকায়, ইহা সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে বর্ত্তমান অধিবাসীরা সেই প্রস্তরযুগের অস্ত্র যাহারা তৈরী করেছে তাহাদেরই বংশধর। (Pre Dravidian or Proto Dravidian, I H Q Vol 4, Prejulisky).

ভাণ্ডারকর লিখেছেন, "সভ্যতা বলতে যাহা বুঝা যায় তাহা দাক্ষিণাত্য খৃঃ পূঃ ৩৫০ শতকের পূর্ব্বে দেখা যায় না—ইহা ইতিহাসের সিদ্ধান্ত। ৮১

## সিন্ধু সভ্যতার জাতি

### ভূমধ্যসাগরীয় নয়

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় লিখেছেন, "ইউরোপ, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের যেসব প্রদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী, সেইসব স্থানে যে জাতীয় লোক বাস করে, মোহেঞ্জোদাড়োতে তদনুরূপ লোক ছিল বলিয়া অস্থি-কঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে।"

"দক্ষিণ ভারতের নৌকাপরীক্ষা দ্বারা শ্রীযুক্ত জেমস্ হর্ণেল স্থির করিয়াছেন যে আদি দ্রাবিড়জাতি ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের

৮১ আর্লি হিষ্টরী অব ডেকান, ভাণ্ডারকর পৃঃ ১৫।

অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের নৌকার নমুনা মিশর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে যাযাবররূপে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। সেখানে বহুকাল থাকার পর সম্ভবতঃ সেমীয় প্রভৃতি জাতির বিতাড়নে পূর্বমুখে সরিতে সরিতে কিছুকাল সিন্ধু উপত্যকায় বাস করে"। "ভূমধ্য সাগরের ক্রীত দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসোপটেমিয়া, এসিয়া মাইনর এবং সুমের বেলুচিস্তান, মোহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও আদিনল্লুর প্রভৃতির ভিতর দিয়া বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির মধ্যে সমাজ ও কৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য বা ঐক্যের ধারা যে প্রবাহিত— ইহা পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করিয়াছেন।" "উল্লিখিত দুইপ্রকার মস্তকবিশিষ্ট জাতি ছাড়া প্রশস্ত মস্তক বিশিষ্ট আরও একপ্রকার জাতির বাস ছিল। ইহাদের মস্তক শীর্ষদেশে উন্নত, নাসিকা অপ্রশস্ত ও উন্নত ছিল। এই জাতীয় লোক অষ্ট্রেলিয়া হইতে পামীর বা কাশ্মীরের উত্তর দিক পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমানে ভারতের বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র বেলুচিস্তান প্রভৃতি প্রদেশেও এই জাতির লোক দেখা যায়" ৮২

## কুঞ্জগোবিন্দবাবুর মত ভ্রান্তিমূলক

গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত উদ্ধৃতিতে এই কথাই বোঝা যায় যে উত্তর ভারতই এই জাতীয় লোকের মূল উৎস। ভূমধ্যসাগরতীর বা অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ প্রাচীন উচ্চক্রমের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেখানে এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, সেখানে ভূমধ্যসাগরতীরের প্রাচীনতম সভ্যতার কষ্টকল্পনার মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার কোন মূল্য নাই। হর্নেল সাহেবের নৌকাপরীক্ষার প্রমাণেও বিশেষ কিছু লাভ নাই, কারণ যদি ক্রীট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পশ্চিম এসিয়া ও ভারতে দ্রাবিড় বিচরণ ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি দেখা যেয়ে থাকে, তাহলে ঐ সংস্কৃতিকে কখনই দক্ষিণ ভারতের

---

৮২ দ্রঃ মহেঞ্জোদাড়ো ; কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী ; পৃঃ ৬৬, ১৩৯ ও ৬৭।

নিজস্ব দ্রাবিড় সংস্কৃতি বলে দাবী করা যায় না। ক্রীট সভ্যতা দ্রাবিড় জাতীয় নহে; ক্রীট দ্রাবিড় জাতির মূল বাসস্থান হলে, সুমেরীয় জাতিও দ্রাবিড়, ঐ সঙ্গে গ্রীক, হিট্রাইট, কাসসাইট, মিডিস, বাহ্লিক, পারসিক প্রভৃতি সকল জাতিই দ্রাবিড় হয়ে পড়ে। উক্ত অঞ্চলটি অতি বিস্তৃত। এত বড় বিস্তৃত অঞ্চলে, যেখানে শত শত জাতির জন্ম হয়েছে, সেখানে প্রাচীনতমকালে দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু-সভ্যতার মত উচ্চস্থানে—উহার মতই বৈশিষ্ট্যলাভ করেছিল—ইহা কোন প্রত্নতত্ত্ব বা নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসে প্রমাণিত হয় নাই।

প্রকৃত পক্ষে যেমন দ্রাবিড় সভ্যতা—কিছু ভারতের বাহিরের সভ্যতা নয়, সিন্ধুসভ্যতাও কোন একটি বিশিষ্ট জাতির সভ্যতা নয়। ইহা নাগরিক সভ্যতা। ইহার বিরাট এলাকার মধ্যে অনেক জাতির লোকের বসতি ছিল। সিন্ধু সভ্যতাতে ভারতের মধ্যের ও বহির্ভারতের অনেক জাতির অবদান ছিল।

ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ লিখেছেন যে মাথার খুলির মাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় না যে আর্য্যজাতি একটি জাতিতাত্ত্বিক সমষ্টি। বৈদিক আর্য্যকে একটি বিশিষ্ট জাতি বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। কোন বিশিষ্ট খুলির আকৃতিকে ভিত্তি করে আর্য্য বা বৈদিক মানুষ বলে প্রমাণ করা যায় না। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে এই খুলিগুলিই বর্ত্তমান ভারতীয়ের স্কন্ধের উপর বিদ্যমান রয়েছে। ৮৩

## আর্য আক্রমণতত্ত্ব ও গোস্বামী মহাশয়

### মার্শালের মত খণ্ডন

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ "বহিরাগত আর্য্য জাতি" বলে গোস্বামী মহাশয়ের তথা বৈদেশিক পণ্ডিতদের যে, সিদ্ধান্ত হয়েছিল—এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানে অচল। এই বিষয়ে কয়েকটি নৃতাতাত্ত্বিক কারণ দিচ্ছি।

৮৩ বৈদিক রিচুয়ালিজম, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ১৩৮।

### ( ১ ) জলবায়ু পরিবর্ত্তন

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী নিজেই তাঁর প্রাগৈতিহাসিক মহোঞ্জোদাড়ো পুস্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "মজুমদার মহাশয়ের আবিস্কৃত স্থান বর্ত্তমানে মনুষ্য বসতি হইতে অনেক দূরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর এই স্থানে আর কেহ বসতি করে নাই। স্যর আরেল ষ্টাইনের ন্যায় মজুমদার মহাশয়ও মনে করেন স্থানীয় রুক্ষ আবহাওয়াই এই সকল বসতির অধঃপতনের ও পরিত্যাগের কারণ। তিনি অনুমান করেন, তত্রত্য অধিবাসীরা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে আর্দ্র আবহাওয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ ম্যাকে আরও মনে করেন যে ইহারা পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া জলবায়ুর মধ্যে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে।" জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এই অঞ্চল ও মধ্য এসিয়ায় ইরানের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ—বাহ্লীক কাসপিয়ান তীরবর্তী গোবিমরু অঞ্চল প্রভৃতি মনুষ্যের বাসযোগ্য স্থান—শুষ্ক এবং জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে ভারত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আরব সাগরতীর ধরে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এই কারণেই। সুতরাং এই অঞ্চলের বাস—অযোগ্য হওয়ার জন্যই যে মহেঞ্জোদাড়ো, নাল প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীদের স্থান ত্যাগের কারণ—তাহাতে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয়ের এই যুক্তি তারই বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়। ভারতীয় আর্য্যরাই জল বায়ুর রুক্ষতার জন্য ভারত ত্যাগ করে বাহির হয়েছিল। স্বামী শঙ্করানন্দের উদ্ধৃতিতেও এই যুক্তিই দেখান হয়েছে। ইহা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে ইহাতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল থেকেই ভারতীয়েরা বাহিরে উপনিবিষ্ট হয়েছে। ইহা গোস্বামী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ।

### ( ২ ) আর্য্য আক্রমণ তত্ত্ব

প্রফেসর মোড়ে দেখিয়েছেন যে এই নাগরিক সভ্যতার মূলে বিস্তৃত এলাকা ব্যাপী গ্রাম্য সভ্যতা ছিল। গ্রাম্য সভ্যতা এবং

নাগরিক সভ্যতাও ভারতের পশ্চিমভাগের বিরাট অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ায় এই সিন্ধু সভ্যতার এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এতবড় বিস্তৃত এলাকার সভ্যতাকে এককালে বর্ব্বর আর্য্যেরা ধ্বংস করে ফেলেছিল—এই রকম যুক্তিকে যুক্তি বলে ধরা যায় না। অবিসংবাদিতভাবে দেখা যাচ্ছে, আর্য্যগণ, ভারতের বাহিরের লোক হলেও, তারা এই সংস্কৃতির পরিবেশের অন্তর্গতই ছিল। মধ্য এসিয়া আসিরিয়া, এসিয়া মাইনর বা উরারটু থেকে যদি আর্য্য আক্রমণকারীরা সত্যই এসেই থাকে—তবে তারা এই সংস্কৃতিরই লোক ছিল—তবে তাদের বৈদিক সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে ভিন্ন বলে ধরা হচ্ছে কেন? তাদের বৈদিক সংস্কৃতি প্রমাণ হলে, তারা ভারত থেকে উপনিবিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তারা কি নিজ সংস্কৃতিকে নিজেরা ধ্বংস করেছে? আর আক্রমনকারীরা এত বেশী সংখ্যক হতে পারেনা, তাতে এত বড় বিরাট অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সমজাতীয় সিন্ধু সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি দ্বারা অভিভূত এবং অধিকৃত করে ফেলেছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য ও বাস্তব যুক্তি—ইদার সম্পূর্ণ উল্টা।

এই বিষয় এই পুস্তকে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

### (৩) বৈদিক সভ্যতার বয়স

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখেছেন: "পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের কাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি" সিন্ধু সভ্যতার পতনের কাল দ্বারা তিনিও ঐ মতের সমর্থন করতে চান। অর্থাৎ তিনি মনে করেন ঋগ্বেদের আর্য্যরা খৃষ্টের জন্মের মোটামুটি দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে প্রতিকুল প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে ক্ষীয়মান সিন্ধু সভ্যতায় সম্মুখীন হন। এবং স্বীয় সুস্থ সবল দেহের শৌর্য্যবীর্য্যে ও দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে ইহাদের উন্নত সভ্যতার বিলোপসাধন করেন। উক্ত যুক্তি যে অচল তাহার প্রমাণ পশ্চিম এশিয়ায় ও মিশরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণেই

দেখা গিয়েছে। খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকের পূর্ব্বেই বৈদিক সভ্যতার কাল বলে স্থির করা হয়েছে। যদি খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতককে ভারতযুদ্ধকাল বলেই ধরা যায়, তাহলেও বৈদিকযুগ তার বহুপূর্ব্বেই ধরতে হয় এবং এই বংশগত ধারা অনুসারে ধরলেও, ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ২০০০ থেকে ২৫০০ বছরের মধ্যে হবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতের কথাই এই। কোন যুক্তি দ্বারাই ঋগ্বেদকে খৃঃ পূঃ দুই হাজারের এদিকে আনা যায় না। ইহা স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি তাঁর "ঋগ্বেদের সভ্যতা" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন। ৮৪

ঋগ্বেদের সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেছেন "চাষার গান"। আমরা দেখিয়েছি যে এই সংস্কৃতি অতুলনীয় এবং অত্যন্ত উন্নত প্রকৃতির। মধ্য এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার বা মিশরের কোন সভ্যতাই বৈদিক সভ্যতার সমকক্ষ অবস্থায় আসে নাই। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনায় দেখান হয়েছে এবং পরে যথাস্থানে অনেক আলোচনা হবে। পশ্চিম এশিয়ায় খৃষ্ট পূর্ব্ব দু'হাজার থেকে পৌনে দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিটান্নী, কাসসাইট, হিট্টাইট প্রভৃতি জাতির অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। এদের সভ্যতার অবস্থা বৈদিক সভ্যতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন, আর এদের মূল বা উৎপত্তি সম্বন্ধে ও জানা গিয়েছে। তুলনায় উহাকে হীন অবস্থাই বলতে হয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থার বাহিরের আর্য্যজাতি—উহার ১৫০০ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী সিন্ধুসভ্যতাকে নাগাল পায়না। এই সময়ের আগে মধ্য এশিয়ায় কোন উন্নত আর্য্যজাতিরও ইতিহাস নাই। সুতরাং বাহিরের থেকে আর্য্যজাতি ভারতে গিয়েছে, একথা প্রমাণ হয় না। প্রকৃত সত্য, পরে সুবিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে যে ভারত থেকে আর্য্যজাতির ঔপনিবেশিক শাখা মধ্য এশিয়ায় এসে ব্যাবিলনে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, মিটান্নী প্রভৃতি তারই শাখা।

৮৪ : ঋগ্বেদের সভ্যতা, পৃঃ ২২, প্রবন্ধাবলী, ৫ম ভাগ।

## ( ৪ ) সিন্ধু সভ্যতায় অশ্ব ছিল না।

সুমেরে খৃঃ পূঃ ২০০০ বছর আগে অশ্বের ব্যবহার জানা ছিল না। কাসসাইটগণ সুমেরে অশ্ব আমদানী করেন। হাম্মুবারি অশ্বকে "পূর্ব্বদেশীয় গর্দ্দভ" বলে বর্ণনা করেছেন। হিকশোসগণ সর্ব্ব প্রথম পশ্চিম এশিয়ায় অশ্ব আমদানী করে। অশ্ব ব্যবহারের প্রচলন বৈদিক যুগের সমসাময়িককালেই হয়েছে বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। ইহা নূতন লৌহযুগের সভ্যতার উপকরণ। অশ্ব যদি সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসকারী হয় তবে ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও এই এক যুক্তি প্রয়োগে, অশ্বকেই ধ্বংসকারী বলতে হয়। দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে ব্যাবিলনের সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল কি ?

অশ্বের ব্যবহার, সিন্ধু যুগে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বৈদিক যুগের অশ্বই বৈদিকদের সৌভাগ্যের হেতু। এই অশ্ব ব্যবহার প্রচলন হয় বৈদিক যুগেই। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যাবিলোনীয়ায় খৃঃ পূঃ ২১০০ অব্দে, অশ্ব গৃহপালিত পশুরূপে প্রচলিত হয়েছে। শচীন্দ্র নাথ লিখেছেন, "ব্যাবিলোনীয়ায় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায়, খৃঃ পূঃ ২১০০ অব্দের একটি লিখিত বিবরণে। অশ্বের নাম দেওয়া হয়েছে "পূর্ব্ব দেশের গর্দ্দভ"। হাম্মুরাবীর রাজত্বের পর পূর্ব্বঅঞ্চল থেকে কাসসাইটরা ব্যাবিলোনীয়ায় অশ্ব নিয়ে এসেছিল—মিশরে যেমন অশ্ব এনেছিল হিকশোসেরা।" ৮৫ লৌহের মত অশ্বের ব্যবহারও শিক্ষা করেছিল আসীরিয়া, আর্য্য জাতির কাছ থেকে।

সুতরাং জানা যাচ্ছে বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরেরও বেশী আগে অশ্ব গৃহপালিত পশু ছিল না। ইহা "পূর্ব্বদেশীয় গর্দ্দভ" নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং অশ্বরোহী বৈদিকগণের আবির্ভাব কাল—এই গৃহপালিত পশুর আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে। বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইহা একটি বড় সাক্ষী।

৮৫ প্রাচীন ইরাক পৃঃ ১৭৩।

বলা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতায় অশ্ব ছিল না; বৈদিক সভ্যতার ইহা অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে।

সিন্ধু সভ্যতার যুগের অশ্ব এবং গর্দ্দভের অস্তিত্বের প্রমাণ এখন পাওয়া গিয়েছে। ( E. J. Ross. A site in Northern Calecolithic Beluchisthan ) Journal of near Eastern Studies Vol. No. 4. Chicago 1946 p. 146.

ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সিন্ধুতীরবাসীরা উট, ঘোড়া ও গাধার সাহায্য লইত বলিয়া ডাঃ পুইলান মনে করেন। বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশে ঐ যুগেও অশ্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে এখানেও অশ্ব বিদ্যমান ছিল।

পক্ষান্তরে বেলুচিস্থানের রণমুণ্ডে নামক স্থানে প্রাক্ মহেঞ্জোদাড়ো যুগেও অশ্ব এবং গর্দ্দভ বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ৮৬

উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা গেল যে অশ্ব ভারতের প্রাচীন সীমানার মধ্যে বেলুচিস্তানেই ছিল বলে প্রমাণ হয়।

## ( ৫ ) আর্য্যগণ কুটীরবাসী ছিলেন

গোস্বামী মহাশয় তাঁর পুস্তকের ৬৯ পাতায় লিখেছেন "পরন্তু আর্য্যদের সম্বন্ধে বেদে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ইহারা প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন। নাগরিক জীবন সম্বন্ধে কিছুটা জটিল অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহাদের তেমন পারদর্শিতা ছিল না। বৈদিক আর্য্যদের, মহেঞ্জোদাড়োবাসীদের মত বড় বড় পোড়া ইটের অট্টালিকা ছিল না, পরন্তু মনে হয় ইহারা বাঁশ বেত প্রভৃতি দিয়া কুঁড়েঘর তৈরী করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। এইসকল এবং আরও অনেক উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবনের বিকাশ মহেঞ্জোদাড়োর পুরাবস্তু পর্য্যালোচনা করলে সম্যক প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আর্য্যদের বেদ, সেরূপ কোন প্রমাণ বহন করিয়া আনে নাই।"

৮৬ প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃঃ ৩৫, ৪২ ও ৭০।

গোস্বামী মহাশয়ের এই যুক্তিটির উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে বড় বড় অট্টালিকা, কেল্লা এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের কথা আছে—উহা অসুরদের ছিল। অসুররা সুরদের সগোত্রই ছিল, তাহাদের সংস্কৃতিও বৈদিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল না। বড় বড় যাজ্ঞিক সংস্কৃতির বিষয় ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে—ইহা ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ আচরণীয় সংস্কৃতি। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ সংস্কৃতিগুলি সমস্তই মান্য করতে ক্রটি করতেন না। তীর্থ, শ্রাদ্ধ, গৃহপূজা প্রভৃতিতে কোন সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল না। কোন রাজ্যের বিশিষ্ট দেবতা অন্য রাজ্যের দেবতার উপর আধিপত্য করার চেষ্টায় বিবাদ বাধত। যেমন ইন্দ্রপূজক, নাগ, যক্ষ পূজকের মধ্যে বিবাদ। ইহা জাতিগত বিবাদ নয়; ইহা ছিল ভ্রাতৃব্য বিবাদ। সুতরাং এদের যদি বৃহৎ অট্টালিকা এবং দুর্গ ইত্যাদি থাকা স্বীকার করা যায়, তবে ইন্দ্রপূজকদের বাঁশের ও খড়ের ঘর থাকায় কল্পনাটি কৌতুকজনক নয় কি? ইহা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

## (৬) লৌহাস্ত্র ব্যবহার

এই কথা বলা হয় যে বৈদিকরা লৌহ ব্যবহার জানতেন না। বৈদিকগণ—যাঁহারা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, লৌহঅস্ত্র ব্যবহার না জানা থাকলে, দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়াই অসম্ভব। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে অথর্ব বেদের সময় লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ৮৭

ডাঃ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ঋগ্বেদে স্বর্ণ ও লৌহ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বহুস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক্ল যজুর্বেদেও স্বর্ণাদি ছয়টি ধাতু যথা স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, সীসা ও রঙের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীসক প্রভৃতি ধাতুর মাতুলী গলায় ধারণের দ্বারা ব্যাধি আরোগ্যের কথা বহুশঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৮৮

৮৭ Hindu civilisation p. 30.

৮৮ হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ডাঃ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "খেলের স্ত্রী বিশপলার জঙ্ঘা পক্ষীর একটি পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল। "হে অশ্বিদ্বয় তোমরা রাত্রিযোগে বিশপলাকে গমনের জন্য এবং শত্রুন্যস্ত ধন লাভার্থ লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।" ৮৯

স্বামী মহাদেবানন্দগিরি, বেদসংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "শিল্পবাণিজ্য, সমুদ্রযান, সুবর্ণময় বস্ত্র, নানা অট্টালিকা, সভাগৃহ জলাধার, লৌহপাত্র, শকট, ঘোড় দৌড়ের মাঠ, পুত্তলিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চ, জল সেচনের প্রণালী, ঘটীরন্ধ্রে জল উত্তোলন, সেতু, কূপ খনন, দেবালয়, পুষ্করিণী, সহস্রস্তম্ভগৃহ, ত্রিধাতুগৃহ, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার তন্তুবায়, চিকিৎসক, শ্রমজীবী, ছুতার, বৈদ্য, কলসীপূর্ণ সুবর্ণ, সূর্য্যের সপ্ত প্রকার রশ্মি—ঋগ্বেদে আছে। দ্বাদশ রাশি, ২৭ নক্ষত্র, চান্দ্রমাস সৌরমাস, অধিমাস, বিনা চাকার রথে আকাশে গমন এবং "ঋক ১।৫।৬৮, ১।৮।১।৪, ১২।৯৬।৩ মন্ত্রে লৌহ বজ্রের উল্লেখ আছে। ঋ—৫।৯।৫ মন্ত্রে কর্ম্মকারের ভস্ত্রা যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৯০

"শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার ত্রিংশৎ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ধনুঃশরের উল্লেখ দেখা যায় যথা, ইষুকার, হৈত্যে ধনুষ্কারং কর্ম্মণে জ্যাকারং দিষ্টায়।" এই সংহিতাকার বহু স্থানে ইষুকার, হেতি, ধ্বনি ও ধনুর বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। পুরাকালে যে আর্য্য ঋষিগণ ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণের যুদ্ধশিক্ষা সৌকর্য্যের জন্য ধনুর্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাই ধনুর্বেদ নামে খ্যাত। ইহা ছিল লৌহ নির্ম্মিত। সিন্ধু সভ্যতায় তীর-ধনুকের প্রচলন ছিল কিন্তু উহা তাম্র বা ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত।

পুরাকালে, যজ্ঞরক্ষার্থ ঋত্বিকগণ আয়ুধ ধারণ করিলেন যথা, অথর্ববেদে "ঋষী নাব অন্যায়ুধম্" ( অথর্ব ৬।১৪।৩২, কৃষ্ণ যজুর্বেদে ১-৫-৬-৭ ), ইষু, সুর্ম্মী, ধনু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সুর্ম্মী বা লৌহ নির্ম্মিত ছোট কামানের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে

৮৯ ভারতবর্ষ ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৯-২০০, ২০৪, ১১২, ২১২, ১৬।

৯০ ঋগ্বেদের সভ্যতা, পৃঃ ১৮৫, ১৮৬ ; মহাদেবানন্দ গিরি।

সীসক গোলকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—"সীসয়াধ্যাহবরুণ" ঙ্ক ত্বাং সীসেন বিধ্যামো যথা লোহসোহবীবহা।" (১।১৬।২।৩ ঋগ্বেদে—স্থিরাবঃ সন্ত্বায়ুধাপরামুদে" (১।৩৯।২)। আমাদের আয়ুধ সকল শত্রুগণের অপনোদনার্থ সুদৃঢ় হউক।" ৯১

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের শেষে সুমেরে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ও বল্লম জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার হোত। সেখানে তীর ধনুকের আমদানী করেছিল সেমেটীক আক্কাডীয় বিজেতা সারগণ। সারগণের রাজ্যকাল অনুমান খৃঃ পূঃ ২৬৫০ সাল। ইহা সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জের অস্ত্র।

লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে আসসুর সম্রাটেরা খৃঃ পূঃ ৭০০ শব্দের কাছাকাছি। ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত—এই উভয়বিধ শিল্পেই ব্রোঞ্জের পরিবর্ত্তে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটরা লোহার ব্যবহার করত, তারা ছিল আর্য্য জাতি। লৌহের ব্যবহার আসীরিয়রা শিক্ষা করেছিল সম্ভবতঃ সেই জাতির কাছ থেকে।" ৯১ ক

## (৭) আর্য্যরা মৎস্য ব্যবহার করতেন না

গোস্বামী মহাশয় মার্সালের মতই লিখেছেন যে আর্য্যগণ মৎস্যাশী ছিলেন না। মৎস্য ভক্ষণ সম্বন্ধে বেদে উল্লেখ না থাকলেও—যারা মাংসাশী তাদের পক্ষে মৎস্য বলে উল্লেখ না করলেও উহা ভক্ষণে কি বাধা থাকতে পারে? ঋগ্বেদে মৎস্যের উল্লেখ না থাকায় যে উহা আর্য্যদের অভক্ষ্য ছিল, ইহার প্রমাণ কোথায়ও নাই। আর মৎস্য না খাওয়ায় সভ্যতার বিকাশে কি বাধা থাকতে পারে—ইহাও অবোধ্য। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ঋগ্বেদে একস্থানে মাছের কথা আছে। (১৩, ৬৮, ৮) একটা সুক্ত আছে ৮, ৬৭) যেখানে মাছেরা জালে ধরা

৯১ ( Vashistha's Dhanurbeda Sanhita page ⁄০ & ৶০ )

৯১ক ( প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৮২ )

পড়ে প্রার্থনা করছে। (ঋক ৮) এই সুক্তকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা পরিষ্কার যে ঋগ্বেদে মাছের কথা আছে। আর এই প্রমাণও নাই যে বৈদিক মানুষ এ সময় মাছ খেত না। কিসের জন্য মাছকে জালে ধরা হোত? হয়তো এমনও হতে পারে যে ইহা পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা, যারা মাছ ছেড়ে ছিল, তারা তাদের শাস্ত্রে মাছবন্ধ করার জন্য—পরে বিধিনিষেধ করার জন্য মাছের দিয়ে প্রার্থনা করিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বেদাধ্যায়ণরত ব্রহ্মচারীর পক্ষে মাংস ও জলজন্তু ভক্ষণ নিষেধ ছিল। গৃহস্থাশ্রমে নিষেধ দেখা যায় না। ৯১খ

## (৮) গাভীর প্রতি শ্রদ্ধাভাব ছিল না

মহেঞ্জোদাড়োয় অশ্বের বিষয় না থাকলে ও পরবর্ত্তী যুগে অশ্ব পালিত পশুতে পরিণত হয়েছে; সুতরাং এতে কোন সংস্কৃতির ধারায় ব্যত্যয় হয় নাই। সিন্ধু সভ্যতায় বৃষের আদর—বেদেও বৃষের আদর ছিল। পরবর্ত্তী যুগে বৈদিকদের মধ্যে বৃষভবাহন মহাদেবের ও যমের মহিষবাহন বলে পূজা করা হত। মুদ্রায় এ রকম বৃষের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। বেদে গাভীকে মাতৃদেবতা বলে কোথাও পূজা করার কোন প্রমাণ নাই, ইহা পরবর্ত্তী পৌরাণিককালে উদ্ভূত হয়েছে—গাভীর প্রতি মাতৃ-জ্ঞান—সভ্যতা বিকাশের অসহায় হয় না। ইহা পরবর্ত্তী বৈদিক যুগের মানুষের সংস্কৃতি বলে পরিচিত হলে, সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ধারায় কোন বাধা হয় না।

## (৯) সিন্ধু সভ্যতায় ব্যাঘ্র নাই

ব্যাঘ্রের বিষয় বেদে নাই, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় আছে—এ কথায় সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধতা প্রমাণ হয় না।

সিন্ধুসভ্যতার পরবর্তীকালে, বৈদিক আর্যদের সময়, হয়তো ব্যাঘ্রজাতি, সিন্ধুদেশে থেকে পূর্ব্বাঞ্চলে এসেছিল। ব্যাঘ্র শুষ্ক জল

---

৯১ খ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পৃঃ ৪৯।

বায়ুর দেশে বাস করে না। আবার এমনও হতে পারে, হয়তো বাঘ ছিল, ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ প্রয়োজন হয় নাই; এটাতো জুলজিকালসার্ভে নয় যে সব জন্তুর উল্লেখ না থাকলে ঐ জন্তু ছিল ছিল না বলে প্রমাণিত হবে।

হরাপ্পায় বাঘের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। হরাপ্পায় ব্যাঘ্রের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে; সুতরাং মার্শালের বাঘ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত এখন অচল।

## ( ১০ ) আর্য্যদের সময় বেদে মূর্ত্তি পূজা ছিল না

"বেদে মূর্ত্তিপূজা ছিল না, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সিন্ধুসভ্যতায় মূর্ত্তিপূজা ছিল।" এই কেহ কেহ বলেন—এই কথাটির পিছনে কোন যুক্তি নাই। এরকম ভাবের সিদ্ধান্ত কোন গবেষকের পক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়। মহেঞ্জোদাড়োতে মূর্ত্তিপূজা থাকলে, পরবর্তীকালে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন বন্ধ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। মূর্ত্তি বা প্রতীকপূজা মানুষের মনের ধর্ম্ম। প্রতীক ছাড়া চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব। সেই জন্য মানুষ যখন জান্তব স্তরে, অবিকশিত মনের অবস্থায় থাকে, তখন তার মূর্ত্তি বা প্রতীক অবশ্যম্ভাবী। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আরাধ্য মূর্ত্তির গুণই চিন্তায় বিষয় হয়ে পড়ে। তখন মূর্ত্তির উপর লক্ষ্য কম হয়ে পড়ে। সেইজন্য বৈদিকস্তরে গুণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মূর্ত্তিকে সর্ব্বক্ষেত্রে আবশ্যক বলে মনে করে নাই বলেই মূর্ত্তির প্রচলন কমে গিয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর সময় অপেক্ষা বৈদিক সভ্যতা উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ছিল। সামাজিক উচ্চতর স্তরে, মানসিক গুণের বৃদ্ধির সঙ্গে, বাহ্য প্রতীক কম ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্র সাধারণ দেবতা নয়—ইহারা ছিলেন যাজ্ঞিক দেবতা। যাজ্ঞিক দেবতার গুণই আসল, প্রতীক গৌণ।

বেদের পরবর্ত্তী কালে মূর্ত্তিপূজা এবং উহার অপ্রয়োজনীয়তাও ব্রহ্মবাদের মধ্যে ছিল, বলেই প্রমাণিত হয়। পাণিনির সময় মূর্ত্তিপূজা

প্রচলিত ছিল। শিব ও স্কন্দ মূর্ত্তি গৃহে প্রতিষ্ঠিত বা পণ্য রূপে ব্যবহৃত হত। ৯২

এই মূর্ত্তিগুলি জনসাধারণের কৃষ্টির পরিচায়ক। ইহা সিন্ধু সভ্যতারই নিদর্শন। এই সময় অন্যান্য দেবতার নাম ও পূজার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার অর্চ্চার বা মূর্ত্তির উল্লেখ নাই। তখন মাতৃদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল; পার্বতী পূজা—মৃড়ানী, ভবানী, সর্বানী ও রুদ্রাণী-রূপে মহামাতৃকার পূজা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। সুতরাং বৈদিক যুগে, মহামাতৃকার রুদ্রাণীরূপে পূজা প্রবর্ত্তিত হওয়ার বিষয় ইহাতে নির্দ্দেশিত হয়। বৈদিক যুগে মাতৃকা পূজা ছিল, ঋগ্বেদে তার প্রমাণ আছে—ইহা পরে আলোচনা করা হবে যে পিতা ও মাতা সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে, পূর্ব্বপুরুষ পূজা থেকে এবং বেদেও পূর্ব্ব-পুরুষপূজা ছিল।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক সভ্যতাকে মূর্ত্তিসংস্কৃতিবিহীন বলে ঘোষণা করেছেন। মার্সাল এই মতটি সিন্ধু সভ্যতার আলোচনায় আরও দৃঢ় করেছেন। এই দেখা দেখি—অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ও এই মতেরই সমর্থন করেছেন। অনির্ব্বাণও বৈদিক দেবতাকে অমূর্ত্ত বলেছেন। সুতরাং এই মতটিকে সংশোধন করা বিবেচনা করি। প্রাথমিক স্তরের বৈদিক দেবতা—প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় ধর্ম্মীই ছিল—ইহা বলা হয়েছে। তাহাদের মূর্ত্তি ব্যবহারের বেশী প্রচলন ছিল না বা ঋগ্বেদের মধ্যে উহার বিশেষ উল্লেখ ছিল না। দেবতার নরাকার এবং নরের গুণাগুণ থাকার কথা বেদে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞ ও হোমের ব্যাপারে মূর্ত্তির বা প্রতীকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না বলেই যজ্ঞোপকরণে মূর্ত্তির প্রচলন ছিল না। এখানে অগ্নিই ছিল একমাত্র প্রতীক।

## গ্রাম্য দেবতা

যেখানে দেবতার প্রতীক স্থির ভাবে প্রতিষ্ঠিত—যেমন কোন গুহা, পর্ব্বত বৃক্ষ বা গৃহকোণ—সেই সমস্ত স্থানে শিলা বা অঙ্কিত প্রতীক

৯২ ইণ্ডিয়া এ্যাজ নোনটু পানিনি, পৃঃ ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮।

অবশ্যই থাকত। এইগুলি ছিল জনসাধারণের নিত্যআচরণীয় সংস্কৃতি। সেখানে নৈবেদ্য উৎসর্গ, স্তবপাঠ এবং পূজা দেওয়া হ'ত। এইগুলিই গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিচয়। যজ্ঞসংস্কৃতিগুলি রাজকীয় বা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পরিচয়। এই পার্থক্যটি শুধু ভারতের ছিল এমন নয়, সুমেরেও এই ব্যবস্থা ছিল—ইহা প্রফেসর ডোনাল্ড লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সমস্ত দেবতাই শিব ও মহাদেবীর সংস্কৃতি বা উহার রূপান্তর। এই সংস্কৃতিই উত্তর কালে নাগরিক সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়ে দেবমূর্ত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল। ইহা সিন্ধু সংস্কৃতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে; সুমেরেও ইহার পরিচয়ের অভাব নাই; হিট্টাইট, হিকসোস, মিটান্নীদের বেলায়ও এই মূর্ত্তির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সহজেই এই প্রশ্ন মনে হতে পারে যে যদি বৈদিক সভ্যতাই সিন্ধু সভ্যতার সন্তান হয়, তবে সেখানে মূর্ত্তির প্রচলন নাই কেন? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর যে গ্রাম্য সংস্কৃতির অবস্থায় মূর্ত্তির আবির্ভাব না হলেও নাগরিক সভ্যতার অবস্থায় এই সমস্ত সংস্কৃতির জাতিগুলি মূর্ত্তি ব্যবহার আরম্ভ করেছিল। ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিতেও উহা ছিল কিন্তু যজ্ঞীয় সংস্কৃতিতে অগ্নির মাধ্যমে অর্চনার কাজ চলার জন্য, মূর্ত্তি ব্যবহার আবশ্যিক ছিল না। উহার প্রমাণ বেদেই আছে।

"ভারতীয় শক্তি সাধনায়" আছে, "ঋগ্বেদে অন্ততঃ পক্ষে ইন্দ্রের প্রতিমা বা প্রতীকের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ মণ্ডলের একটি ঋকমন্ত্রে বলা হয়েছে দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে কিনিবে? (ঋ বে ৪।২৪।১০)। এই ইন্দ্র ক্রেতার বৃত্রদের অর্থাৎ শত্রুদের বিনাশ করলে পর এঁকে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। "আবার একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, "হে বজ্রবান ইন্দ্র, তোমাকে মহামূল্যেও বিক্রয় করব না, হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র, সহস্র সংখ্যক ধনেও তোমাকে বিক্রয় করব না, দশ সহস্র মূল্যেও বিক্রয় করব না। হে বহু ধনের অধীশ্বর, অপরিমিত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় করব না। (ঋ ৮।১।৫)।" উক্ত মন্ত্রদুটিতে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য প্রতীক বা প্রতিমার

কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে। অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—হে মনুষ্যগণ, অর্থাৎ ঋত্বিক গণ, তোমরা শাস্ত্র, যাগ, স্তুতির দ্বারা ইন্দ্র এবং অগ্নির স্তব কর এবং নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা তাদের শোভিত কর (ঋ, ১৷২১৷২)।" ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও দেবতার প্রতীক ব্যবহারের নিদর্শন আছে। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণে স্বর্ণপত্রের উপর খোদিত সূর্য্যমণ্ডলকে সূর্য্যের প্রতীক রূপে ব্যবহার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। (শ, ব্রা, ৭৷৪৷১৷১০)।

পঞ্চবিংশ মহাব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে দেবপ্রতিমা ও দেবায়তনের উল্লেখ আছে। ৯২

সূত্র সাহিত্যেও দেব প্রতিমার উল্লেখ আছে, যেমন পারস্কর গৃহ্য-সূত্রে দেবপ্রতিমার নির্দ্দেশ করা হয়েছে। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে ঈশান, মাঢ়ুষী, জয়ন্ত প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তির নির্দ্দেশ করা হয়েছে। আর ঋগ্বেদ সংহিতায় যে প্রতীক বা প্রতিমার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, পানিণির সময় (অনুমান খৃঃ পূঃ ষষ্ঠাব্দ) পর্যন্ত সে প্রথা বরাবর চলে এসেছে। তিনি বলেছেন যে সব দেবতার প্রতিকৃতি জীবিকার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিক্রয় করা হয়না—সেই সব দেববাচক শব্দের উত্তর কন্‌ প্রত্যয় হয় না। ঐ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি লিখেছেন, সোনার আশায় মৌর্য্যরা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত।" কাজেই দেখা যাচ্ছে ঋগ্বেদের সময় থেকে সনাতন ধর্ম্মীদের মধ্যে দেবতার জন্য প্রতীক ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এরূপ মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে।"৯৩

সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতার উত্তরাধিকার সূত্রে মূর্ত্তির প্রচলন যে বৈদিক যুগে হয়েছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মূর্ত্তি সংস্কৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিষয়ে বৈদিক সভ্যতা, সুমের এবং মধ্য এশিয়ার সভ্যতার সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নাই।

৯২ ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ১০৷৫, দ্রঃ D. H. I. 2nd Ed. 1956 p 69।

৯৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৮৮৩, ৮৮৪।

তবে বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির বেশী খ্যাতি প্রতিপত্তি হওয়ায়, যাজ্ঞিক ক্রিয়ার পক্ষে মুর্ত্তি প্রয়োজনীয় না থাকায়, কালক্রমে মূর্ত্তির প্রতি আকর্ষণ উঠে গিয়েছিল, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মন্ত্র এবং যাজ্ঞিক নিয়ম ও প্রথার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে, দেবতার গুণের উপরই লক্ষ্য পড়েছিল, তার মূর্ত্তি গৌণ হয়ে পড়েছিল। এইজন্যই দেখা যায়—মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—দেবতার আকৃতির স্থান নিতান্ত গৌণ। এই অবস্থাটি মূর্ত্তির অভাবের বা অমূর্ত্ত সংস্কৃতির অবস্থা বলা চলে। এই অবস্থাটিই ছিল বৈদিক প্রথম স্তরের অবস্থা। পারসিক ধর্ম্ম এই বৈদিক প্রথম স্তর থেকে উদ্ভূত। এই জন্যই অমূর্ত্ত সংস্কৃতির প্রতি জরাথুষ্ট্রের এতটা আকর্ষণ। এই আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণটি হল বৈদিক সর্ব্বাত্মবাদ থেকে পৃথক হয়ে অহুরমজদার একাধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মূর্ত্তি বা প্রতীক একটা বড় বাধা—এই বিষয় ইতি পূর্ব্বে আলোচনা করেছি।

## (১১) আর্য্যদের মাতৃসংস্কৃতি ছিল না

আদিম যুগে প্রতি ঘরে ঘরে, ঘরের কোণে, কোন শিলা বা পিতৃমাতৃস্মৃতির পরিচয়ে কোন বস্তু বা অর্চ্চা প্রতিষ্ঠা হত। এই সংস্কৃতিটি, এখনও বর্ত্তমানে আদিম মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতির সমাজে প্রচলিত আছে। মাতৃপিতৃ পূজার সংস্কৃতি সিন্ধুসভ্যতায় যেমন ছিল, তেমনিই বৈদিক সংস্কৃতিতে ছিল। ঋগ্বেদে উহা স্পষ্টতঃ দেখা যায় নাই বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাকে উপেক্ষা করেছেন। ইহা অন্যান্য বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অগ্ন্যাধানের জন্য যে তিনটি বেদীতে অগ্নি রাখা হত, তারমধ্যে দক্ষিণাগ্নি পিতৃযাগ। সুতরাং যজ্ঞের সঙ্গে পিতৃপূজা একত্রে গাথা ছিল। পরবর্ত্তী যুগে পানি-নির সময় প্রমাণ আছে—মাতৃপিতৃ পূজা শ্রাদ্ধাদি পিতৃপক্ষতে হোত। ৯৪ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে সমস্ত পূজাদি করার আগে পিতৃতর্পণ করা হয়;

৯৪ ( ইণ্ডিয়া এ্যাজনোনটু পানি নি, জয়োসোয়াল, পৃঃ ৩৮৬ )

ইহা প্রাথমিক কর্ত্তব্য। প্রতি তীর্থে দেবপূজা করার আগে শ্রাদ্ধতর্পণ সম্পন্ন করতে হয়। ঐ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে। সুতরাং মাতৃপিতৃ পূজা বৈদিক সভ্যতায় যে একটি প্রধান অঙ্গ ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা উল্লিখিত না থাকার কারণ যে ইহা যজ্ঞপ্রকরণে থাকার কথা।

যজ্ঞ—রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ছিল। রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে যজ্ঞের রূপ এবং যজ্ঞদেবতার পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রমাণ—পরবর্ত্তী হিন্দু সভ্যতা। যজ্ঞের বিরোধ করে একটি পরবর্তী ঔপনিষদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। শুধু বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য নয়, পরবর্ত্তী দর্শনগুলিতেও যজ্ঞবিরোধ যথেষ্ট আছে। এই জন্যই কখনও বলা যায় না যে বৈদিকদের আক্রমণ করে পরবর্ত্তী পুরাণ ও দর্শন সাহিত্য প্রবর্ত্তকগণ উহাকে নির্ম্মূল করেছে।

এই সংস্কৃতি রাজ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় ছিল। এই মাতৃ-পিতৃ সংস্কৃতি সর্ব্বসাধারণের সংস্কৃতি রূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল। সুমের সভ্যতায়ও এই সত্যটির পরিচয় পাওয়া যায়। ডোনাল্ড এ মেকেঞ্জি, লিখেছেন, "ব্যাবিলোনিয়ার ধর্ম্ম দুই প্রকার। ইহাতে রাষ্ট্রীয় উপাসনা ও পরিবারগত উপাসনা—দুইই ছিল। মন্দিরের ধর্ম্ম ছিল সমাজের প্রাচীনদের ধর্ম্ম, বিশেষ ভাবে রাজার, যিনি সাধারণের রক্ষী ছিলেন। পরিবারিক ধর্ম্মগৃহে করা হ'ত—পর্ণকুটিরে বা সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে এবং ইহার মধ্যে আদিম যুগ থেকে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল—তাহার আচরণের প্রতিষ্ঠানরূপে ইহা বর্ত্তমান ছিল। বাইবেলে উল্লিখিত মহাঅগ্নুধানের এবং নরমেধে যজ্ঞের কথা—যাহা ব্যাবিলনে প্রচলিত থাকার কথা আছে, তাহা এই পারিবারিক ধর্ম্মীয় ক্রিয়ার সঙ্গে নিঃসন্দেহভাবে যুক্ত ছিল; ঠিক এমনি স্বর্গের রাণীর প্রতি মহোৎসবে কেক নিবেদন করা, জেরেমিয়া নিন্দা করেছেন; আর এই ব্যাপার জেরুসালেম এবং অন্যান্য নগরে অনুষ্ঠিত হত। পারিবারিক ধর্ম্মের জন্য কোন মন্দির লাগতো না। ক্রীটে কোন মন্দির

ছিল না; দেবতার গৃহ সমস্ত বিশ্বে—এই দেবতার বৎসরের মধ্যে ঋতুবিশেষে কোন পর্বতচূড়ায়—না হয় কুঞ্জে, না হয় গুহা প্রভৃতিতে আবির্ভাব হত।" ৯৫

উক্ত উদ্ধৃতিতে যাহা দেখা গেল—সুমেরে যাহা হোত, বৈদিক কালের মাতৃপিতৃপূজার ব্যাপারে তাহাই হোত। ইহা ছিল জনসাধারণের ধর্ম্ম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—মাতৃপিতৃ পুজার ব্যাপারে মূর্তির কোন প্রয়োজন হোত না। সিন্ধুযমুনার সভ্যতায় ও পারিবারিক ধর্ম্মের বেলায় মূর্ত্তির দরকার হোত না। মাতৃ দেবতার ক্ষোদিত মূর্ত্তি যাহা পাত্রে বা সীলে পাওয়া গিয়েছে—উহা পূজায় ব্যবহৃত হওয়ার আবশ্যক ছিলনা এবং তাহার প্রমাণও নাই।

## (১২) বেদে স্ত্রী দেবতার স্থান নীচে

তারপর কথা—বেদে পুরুষ দেবতার স্থান, স্ত্রী দেবতার উপরে, ইহা বলা হয়েছে। এই কথা ঠিক নয়। মাতৃপিতৃস্মৃতিতে গ্রাম্য দেবতা স্বাধীন। তাঁহাকে মন্দিরের সঙ্গে পরবর্ত্তী কালে যুক্ত করা হয়েছে। প্রধানতঃ এই দেবতার স্থান গৃহস্থের গৃহাভ্যন্তরে এবং মাঠে বা গ্রামের বৃক্ষতলে কোন প্রতীকের সঙ্গে যুক্তভাবে নিদিষ্ট ছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলে এই নিয়মই প্রচলিত। ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামের মাতৃদেবতার ইতিহাস সম্বন্ধে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলে ইহার সত্যতা প্রামাণিত হবে। ভারতের একান্নটি পীঠ, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মীয় সাধনার বৃত্তান্ত এই গ্রাম্য দেবতার সঙ্গেই সংযুক্ত। এই পীঠগুলির ইতিহাস প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে সংযুক্ত। সুতরাং বৈদিককালে—প্রধানমাতৃদেবতার অস্তিত্বের বিষয় কোন সন্দেহ নাই। মাতৃপূজা সম্বন্ধে যে যুক্তি, শিব পূজা সম্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি আছে। শিবপূজা প্রকৃত পক্ষে পিতৃপুরুষ পূজা। ইহা বৈদিক যুগেও ছিল। মাতৃদেবতা এবং পিতৃদেবতা এখানে সমান মর্য্যাদায়—প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

৯৫ Donald Macenzic, M.B. and A. page XXXV.

## ( ১৩ ) সিন্ধুসভ্যতায় অগ্ন্যুত্থান ছিল না

অগ্ন্যুত্থান ও আহুতির কথা বলা হয়েছে। সুমের ও সিন্ধুসভ্যতায় দেবতার কাছে বলিদান, নৈবেদ্য দান—এসমস্ত প্রচলিত ছিল। এই সংস্কৃতির সর্ব্বত্র, অগ্নিতে উৎসর্গিত জন্তুর বিশিষ্ট অঙ্গ নিবেদন করা নিয়ম ছিল। সুমের, আসিরিয়া ব্যাবিলন, গ্রীস, প্যালেষ্টাইন—সর্ব্বত্রই এই প্রথা। সিন্ধুসভ্যতার লেখমালার ভাষা নির্নীত হয় নাই; হ'লে, উহাই প্রতীয়মান হোত। যতটুকু জানা গিয়েছে, তাতে ঐ সব আচার ব্যবহারে সুমেরের সঙ্গে একত্বই প্রমাণ হয়।

এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করছি। বৈদিক যুগের যজ্ঞসংস্কৃতিই সিন্ধু যুগের বলিদান ও অগ্নির মাধ্যমে ভোজ্য উৎসর্গ—পরস্পর ক্রমবিকাশের নিয়মে যুক্ত। ইহা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। স্বামী শংকরানন্দও লিখেছেন যে সিন্ধুঅট্টালিকায় অগ্নি-বেদীর অস্তিত্ব ছিল।

সুমেরে ও ব্যাবিলনে অগ্নিপূজা ছিল এবং সেখানে বৈদিকদের মত অগ্নির মাধ্যমে অন্য দেবতাকে ভোজ্য নিবেদন চলত। পারসিক এবং ভারতীয়ের বৈদিক যজ্ঞ প্রায় এক রকম। অগ্ন্যুত্থান পারস্যে ছিল। সিন্ধু সুমেরের অগ্নিপূজা এবং যজ্ঞসংস্কৃতি অপেক্ষা বৈদিক যজ্ঞ ক্রমবিকাশের নিয়মে অনেকটা জটিল। সিন্ধু, সুমের বা ইহুদীদের যজ্ঞে সরলভাবে ভোজ্য বা পশুর মাংস দেবতাকে নিবেদন করা হোত বৈদিক যজ্ঞের জটিল ক্রিয়াকর্ম্মও মন্ত্রশুদ্ধির জটিলতা এবং কড়াকড়ি ছিল না। শুধু এইটুকু মাত্র তফাৎ।

## ( ১৪ ) বৈদিক যুগে শিবপূজা ছিল না

তারপর শিবলিঙ্গ ত্যাগের কথা। এই বিষয়ে আগে আলোচনা করেছি এবং পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। বৈদিক যুগে শিব-পূজা প্রচালিত ছিল। শিবপূজা যূপাকার প্রস্তরে—পিতৃপুরুষের

প্রতীকভাবে পূজিত হোত। বৈদিক রুদ্র ও উমা এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটদের দ্বারা পূজিত হতেন। শিবসংস্কৃতির মূল সিন্ধু সংস্কৃতি হলেও উহা বৈদিক যুগে ক্রমবিকাশের নিয়মে উন্নত হয়েছিল। তার প্রমাণ—যোগশাস্ত্র ও উপনিষদের সময় শিবারাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

"সিন্ধু সভ্যতার যোগরূঢ় মূর্ত্তি—হস্তিব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ পরিবৃত্ত অবস্থার ত্রিমুখ মূর্ত্তিটিকে মার্শাল শিবপশুপতির আদিরূপ বলে মনে করেছেন"।

"পাশুপত মতের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। মনে হয়, পাশুপত মতাবলম্বীরাই প্রাচীনতম শিবোপাসক সম্প্রদায়। পতঞ্জলি যাদের শিবভাগবত বলেছেন, অনুমান করা যায় তাদের সঙ্গে এই পাশুপতদের যোগাযোগ ছিল।"( D. H. I p 49 ) উক্ত উদ্ধৃতিমতে সিন্ধু সীলের যোগারূঢ় মূর্ত্তিকে যোগীশ্বর পশুপতি শিব বলে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। ইহাতে বৈদিক যুগের শিবের সঙ্গে সিন্ধু শিবের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এই পাশুপত মত অবৈদিক নয়। শতরুদ্রীয় মন্ত্রে রুদ্রকে একাধিকবার পশুপতি বলা হয়েছে। কাজেই বলতে হয় বৈদিকরা শিবকে নিজেদের দেবতা বলে স্বীকার করেছেন।

পাশুপতসূত্রধৃত পাশুপত মত যে বেদানুসারী, তার সুনিশ্চিত প্রমাণ, এই যে—এই মতের ভিত্তি তৈত্তরীয় আরণ্যকের ৫টি মন্ত্র। লিঙ্গপুরাণে দেখা গেল লকুলীশশিষ্যদের বলা হয়েছে বেদপারগ ব্রাহ্মণ। কূর্ম্মপুরাণেও বেদমার্গী পাশুপতদের কথা আছে।" ৯৬

## মার্শালের গবেষণা

মার্শাল সিন্ধুসভ্যতার মধ্যে শিবলিঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। এটি মার্শালের গবেষণার ভুল। মার্শালের আবিষ্কৃত প্রস্তর—শিবলিঙ্গ নয়।

---

৯৬ ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৭।

উহা মাতা বা পিতার প্রতীক সমাধিপ্রস্তর। এই মাতৃাপতৃ পূজার প্রতীক গ্রাম্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকারসূত্রে সিন্ধুসভ্যতার স্তরে পাওয়া গিয়েছে। শিবের লিঙ্গপূজা পাণিনির সময় ছিল না; এমন কি বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকে ভারতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রবর্ত্তন হয় নাই। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা আছে। লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন হয়—ব্যাবিলনে এবং সেখান থেকে যায় মিশরে। ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতের শিব পূজা পশ্চিমএশিয়ার মত যৌনসংস্কৃতিযুক্ত এবং কামচর্চ্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত তত্ত্ব। এবিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে।

লিঙ্গ অর্থে চিহ্ন। পাণিনি ইহার এই অর্থই করেছেন অর্থাৎ তাঁর পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয় অর্থে লিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হত না। শৈব পাশুপতেরা এই চিহ্ন অর্থেই লিঙ্গ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। ভাগবত, মনুসংহিতা প্রভৃতিতেও চিহ্ন অর্থে লিঙ্গ শব্দের ব্যবহার আছে। পিতৃপূজার সমাধি স্তম্ভ থেকেই আদিমতম স্তর—গ্রাম্যসভ্যতায় শিব-লিঙ্গের প্রচলন হয়েছে।

"স্তম্ভ যে শিব লিঙ্গের আকার নির্ণয়ের অন্যতম কারণ—তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুমারস্বামী কুষাণ যুগের শেষের দিকের একটি শিবমূর্ত্তির বিবরণ দিয়েছেন। মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ দণ্ডায়মাণ একটি স্তম্ভসদৃশ প্রতীকের গায়ে উৎকীর্ণ। ( D. H. I. Page 462 ) এই স্তম্ভকে শিব লিঙ্গের আদিরূপ বলা যায়।"

শিব পুরাণাদিতে শিব লিঙ্গের আবির্ভাব কাহিনীতে দেখা যায় শিবের স্তম্ভমূর্ত্তিই শিব লিঙ্গের আদিরূপ।

কেউ কেউ মনে করেন, বৈদিক যূপই শিবলিঙ্গের আদিরূপ। যূপই বৈদিক মতে ব্যবহৃত স্তম্ভ। মহাভারতে যূপস্তম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত যূপস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে।

## বেদের রুদ্রই শিব

"ঋগ্বেদে তিনটি সম্পূর্ণ সূক্তে রুদ্রের স্তুতি করা হয়েছে। আর একটি সূক্তের প্রথম ৫টি থাকে আছে রুদ্রের স্তুতি। একজায়গায় বলা হয়েছে রুদ্র পূজনীয় বহুবিষধরযুক্ত হার ধারণ করেছেন ( ঋ ২৩৩,১০)

ঋগ্বেদের রুদ্র যজ্ঞবিরোধী নন। তাকে মেধপতি অর্থাৎ যজ্ঞপালক এবং যজ্ঞসাধ অর্থাৎ যজ্ঞসাধয়িতা অর্থাৎ যজ্ঞকারয়িতা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ঋত্বিক—রুদ্রের শুধু স্তবস্তুতি করতেন না, চরু, পুরোডাশাদি তাঁর উদ্দেশে আহুতি দিতেন। ( ঋ, ১৷৫৩৷৪,৩,২৷৩৩৷৪ )

রুদ্র যে কৃষির দেবতা, তা যজুর্বেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ( বা, সং, ১৩৷১৯, ১৮,৩৩ ইত্যাদি ) আমরা দেখেছি অদিতি, মা মহাদেবীর অন্যতম রূপ। আর ঋগ্বেদেই অদিতিকে রুদ্রদের মাতা বলা হয়েছে। এদিকে রুদ্রদেবকে বলা হয়েছে রুদ্রদের পিতা। কাজেই জগদম্বা, অদিতির সঙ্গে রুদ্রের সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট করে বলা না হলেও ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। "ঋগ্বেদের সময়েই রুদ্রকে মা মহাদেবীর পতি মনে করা হতো।

একটি ঋকে রুদ্রকে বলা হয়েছে 'গাথাপতি'। নির্ঘণ্টু অনুসারে গাথা, বাকের নাম। আর বাক্—মহাদেবীর অন্যতম নাম। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে গাথা সংস্কৃতিটি প্রাচীন মন্ত্রসংস্কৃতির পরিচয়, কারণ ইহার ভাষা ও ছন্দ প্রাচীন। বরেন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন যে গাথা প্রাকবৈদিক সংস্কৃতির পরিচয়। ৯৭

রুদ্রের পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায়। এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিকে বলা হয়—শতরুদ্রিয়। পরবর্ত্তীকালে রুদ্রের যখন নাম, উপাধি, গুণাগুণ, কার্য্যকলাপ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে, তাদের অনেকগুলি এই সব মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।

---

৯৭ Language & Scripts in Ancient India
—Barendra Kumar Bhattacharjee p. 45

একটি মন্ত্রে তাকে ময়োভব, শংকর এবং ময়স্কর বলা হয়েছে। ( বা সং ১৩।৫১ ) ঐমন্ত্রে রুদ্রকে বলা হয়েছে শিব এবং শিবতর।

যজুর্বেদে রুদ্রকে নীলগ্রীব, ভূতপতি, জটাজুট-ধারী দেখা যাচ্ছে। পরবর্ত্তী কালের মহেশ্বরের ভাবটি যুজুর্বেদেই দানা বেঁধেছে।

অথর্ববেদে রুদ্রের পরিচয় আরও ব্যাপক। অথর্ববেদেই রুদ্রের কালের স্রষ্টারূপ প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী কালে বিশেষ করে কালের স্রষ্টারূপ ও সংহারকরূপ উভয়ই প্রকটিত হয়েছে। (অ, ১১।২।৯) যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে একাধিকবার রুদ্রকে বলা হয়েছে পশুপতি। একটি মন্ত্রে রুদ্রকে বলা হয়েছে, "তোমার পশুগুলি ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা—মানুষ, অশ্ব, মেষ ও ছাগ ( অ, ১১।২।৩ )।

উপনিষদের যুগে রুদ্রই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্ট করেই রুদ্রকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যজুর্বেদ বিবৃত ২টি রুদ্রমন্ত্র আলোচ্য উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ওই উপনিষদে রুদ্র শিবে পরিণত হয়েছেন।

বৈদিক দেবতারা ঝড় বজ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন রুদ্র দেবতাকে। একটি ঋকে তাঁকে বলা হইয়াছে বৃহৎ রুদ্র। (৫।৩৩।১০)

অন্য একটি ঋকে দেখা যায় তিনি ভুবনের পিতা। (২।৩৩।৩) কাজেই দেখা যায় রুদ্র যে জগৎপিতা এবং জগদম্বার পতি এ ধারণা ঋগ্বেদের সময় অপরিচিত ছিল না।

রুদ্র জগৎপতি ( বা সং ১৩।৮,২৯ )।

## শিব জনের দেবতা

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ঋগ্বেদে শিব নামে একটি জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ( ঋ-৭।১৮।৭ ) রাজা সুদাস পকথ, ভুলান, বিবাণী প্রভৃতি যে সব জনদেব দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে পরাভূত করেন শিব তাদের অন্যতম জন। ঐতিহাসিক যুগে ( মৌর্য্যদের অব্যবহিত

পরে ) শিব বলে একটি জনের কথা জানা যায় ঝং জেলার দক্ষিণাংশ এবং রাবিনদীর নিম্ন উপত্যকা এই শিবদের এবং মালবদের অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ এরাই ঋগ্বেদোক্ত শিবজন। কেননা ঐ সময়ই দেখা যায় যে ঐ সময় ঋগ্বেদোক্ত পূরুজনও তক্ষশীলার দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলে রাজত্ব করছে। আমাদের মনে হয় শিব ·ছিলেন এই শিবজনের আরাধ্য বেবতা। ঋগ্বেদের সময় ইনি রুদ্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন এবং সেই থেকে রুদ্রকেও শিব বা কল্যাণময় বলা হয়েছে।"

ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র বিরাজমান রুদ্র ভগবান। তিনি হৃদব্য অর্থাৎ অন্তর্যামী। ( বা সং ১৮।৫২,৫৩ )

রুদ্র যে বিরাট, তিনি যে মহাদেব, ঈশ্বর এবং জগতের ভর্ত্তা তা ঋগ্বেদেই ব্যক্ত হয়েছে। একটি ঋকে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত জগতের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ এবং বলবানদের মধ্যে সবচেয়ে বলবান বলা হয়েছে।" ( ২।৩৩।৩ ) ৯৮

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি আলোচনায় দেখা গেল যে বৈদিক রুদ্র শিবই জনসাধারণের মধ্যে প্রধান দেবতা বলে পূজিত হতেন। ইনি ছিলেন সর্ব্বসাধারণের দেবতা। বৈদিক আর্য্য, পারসিকদের সঙ্গে পৃথক হওয়ার আগে এই শিবকেই মহান অসুর বলে পূজা করতেন। পরে ইন্দ্র বৈদিক আর্য্যদের রাজন্যদের মধ্যে বিশিষ্ট দেবতারূপে পূজিত হলেন, কিন্তু শিব বৈদিক আর্য্যদের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পূজ্যই থেকে গেলেন। এই শিবই সিন্ধু সভ্যতার যোগী শিবপশুপতি। ক্রমশঃ পৃথক হওয়ার পর পারসিকগণের মধ্যে শিব মহানসুর বা অহুর মজদা বলে পরিচিত হতে লাগলেম। বৈদিক আভিজাত্য-সমাজ ইন্দ্র পূজা গ্রহণ করলেও রুদ্র শিবকে ছাড়েন নাই। গ্রাম্য সমাজে শিবই আদি পিতা এবং উমা বা অম্বিকা, আদিমাতা থেকেই গেলেন।

৯৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা, উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ১২৯, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৪, ২১৫, ১০২, ২৯৬, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮।

## যোগী পশুপতি

সিন্ধু সভ্যতার মহাযোগী শিবের ক্রমবিকাশই যোগশাস্ত্র। বৈদিক শাস্ত্রে যোগদর্শনের ক্রমবিকাশের রূপায়ণটি নিরূপণ করা অসম্ভব নয়। উপনিষদে ইহা বিশেষভাবে স্পষ্ট। সিন্ধু সভ্যতার যোগী শিব পশুপতি। বৈদিক যুগের ব্যবহারিক পশুপতি শিব থেকেই তাত্ত্বিক পাশুপত মতের সৃষ্টি হয়েছে। যোগী শৈব তাত্ত্বিক মতের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন মতই পাশুপত মত। তাত্ত্বিক যোগীমতের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ব্যবহারিক যোগীমত ছিল। উহাই সিন্ধুর বা বৈদিক রুদ্রশিবের যোগমত। এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলটিতেই বৈদিক আর্য্যদের উদ্ভব দেখা যায়। এই জন্য অনুমান করা হয়েছে যে বৈদিক আর্য্যরাই সিন্ধু সভ্যতাকে নির্ম্মূল করেছে। এই অনুমান ঠিক হতে পারতো যদি সিন্ধুসভ্যতা প্রকৃত পক্ষে নির্ম্মূল হয়ে যেত। সিন্ধু সভ্যতার সকল সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক জাতিগুলির মধ্যে প্রবলভাবে জেগে আছে।

## (১৫) মৃৎপাত্রে শব সমাধি

একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে—সিন্ধুসভ্যতায় মৃৎপাত্রে শব সমাধি দেওয়ার বিষয় দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক সভ্যতার প্রথা মৃতকে দাহ করা। সুতরাং ঐ দুটি পৃথক সভ্যতা না হয়ে যায় না।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "ডায়েলেক্‌টিক্‌স অব হিন্দু স্পিরিচুয়ালিজম" গ্রন্থে লিখেছেন, "উভয় সভ্যতার একত্ব তুলনা করে বলা যায় যে মৃৎপাত্রে শবসমাধির বিষয়, যাহা সিন্ধু সভ্যতায় জানা যায়—সেই স্থানেই গৃহ্যসূত্রে মৃৎপাত্রের শবসমাধির বিষয় লেখা আছে। উহা নিশ্চয়ই বৈদিক পাত্র হবে। এতে দেখা গেল যে আংশিক সমাধি, যাহা সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে বেদের সমাধি প্রথার একত্ব আছে।" ডাঃ দত্ত লিখেছেন :—

"Then Marshall paraded the facts, about the

disposal of the dead. body, which according to him were peculiar to the Indus Verbly people. This he divided as (a) Complete burial (b) fractional burial (c) Post Cremation burial. But we already pointed out the fact that the Rigveda has mentioned primarily two modes of disposal of the dead body without Cremation and with cremation. Regarding these two modes, the complete burial was in vogue in the Rigvedic period (X. 18. 11). This mode was carried out in the age of the Brahmanas as well. (Satapatha Brahmana. ) As regards Marshal's fractional (13.8.1 9) burial" unearthed in the Indus Valley Civilisation, I again beg to point out that the Rig Veda speaks of fractional or partial Cremation as it says, O, Ogni "Do not burn him completely. Do not scorch him, do not cut into pieces the skin and his limbs (RV, X, 16, 1). Thus the Rig Vedic cremation was a partial one. The Rik gives the clear hint that the body did not use to be completely burnt into ashes. The seventh Rik of the same Sukta gives us another hint that the whole body would not be used to be burnt in Cinders, otherwise the wrapping up of the body with a cow skin would have no significance. Further it is there in the next verse. Thus we see that the Rigveda hymn on cremation, speaks of partial burial. The Atharva Vedic funeral aiso hints at partial cremation

(AV, 18 36). In Taittirya Sanhita and, Apastumba Srautsutra, we get detailed accounts of this method of the disposal of the dead which explain the Vedic rites, (Vide Petrimedha)

In Ashvalayana Grihyasutras, the rules for the disposal of the dead, are given in which after cremation, the gathering of the bones is to take place. In it we get a minute description of the mode of urn burial. There can not be any mistake about the mode of the burial as also it is evinced by the discovery at Lauriah by Dr. Block, which the excavator himself observes to belong to Premauryan epoch. Comparing these similarities, we may maintain that as the location of the Indus Valley burial rites, has been discovered in the same place, where the Vedic people lived, the urn burials mentioned in the Grihyasutras must be the same as the Jar burials of Marshall's Indus Valley cevilisation. Speaking of the mode of Sepulchre at Harappa, Marshall says, "In two cases, they are accompanied by animal bones." But we have already seen that the dead body, being wrapped up in cowhide (X, 16, 7) a goat being apparently burnt with it to act as a guide to the next world. According to Atharva Veda, draft ox was presumably for the dead to ride on the next world. This mode may explain the reason why bones of quadrupeds were found in Jar burials at Harappa, Marshall says.

"At both Mahenjodaro and Harappa, a class of large widemouthed urn has been brought to light and also bones of small quadrupeds, birds or fish and frequently a variety of other small objects, such as beads, bangles with ashes and charcoal. On the other hand the following funeral verse in the Atharva Veda (XVIII, 4, 2) says, "The Gods, the seasons arrange the sacrifice, the oblations, the sacrificial cake, the laddles, the implements of sacrifice with them do thou go by roads that the gods travell, by which they that have sacrificed go the heavenly way. Thus the urnburial of the Vedic people is the same as the Post Cremation system mentioned by Marshall. Thus we see that the modes of funeral customs of Indus Valley civilisation as portrayed by Marshall coincide with those of the Vedic people."[১১]

## ষ্ট্রুকভেলের সিদ্ধান্ত

"এই সমস্ত তুলনার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি যে সিন্ধু সভ্যতাতে ভারতীয় আর্য্যগণ আগন্তুক নয়। সংস্কৃতি, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সাদৃশ্য দ্বারা এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না যে সিন্ধুসভ্যতায় ভারতীয় আর্য্যের অস্তিত্ব ছিল। হরাপ্পায় তাদের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে—আমরা এ বিষয়ে পাঠককে ইউ. এস. এস. আর. এর অ্যাকামেডিয়ান, ষ্ট্রুকভেলের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করছি, "সিন্ধু সভ্যতার মানুষ ছিল হুররি। বাগজোকাই

১১ ( Vedic Retualism p. 137 ).

লিপি থেকে জানি যে এরা মিটান্নীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং হুররির সংস্কৃত ভাষামূলীয় সম্বন্ধ আছে। লিপিতেও বৈদিক দেবতাদের পরিচয় আছে। নিঃস্বার্থ পণ্ডিত লোকের সিদ্ধান্ত যে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষের সিন্ধু সভ্যতায় অস্তিত্ব থাকা লক্ষ্য করার বিষয়। ইহা আমাদের নিজ সিদ্ধান্ত যে ভারতীয় আর্য্যগণের এই সভ্যতায় অস্তিত্ব ছিল।"১০০

১০০ ( Vedic Ritualism p. ২৩-২৪ )

# তৃতীয় অধ্যায়

## সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও লিপি

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখেছেন, "সিন্ধু উপত্যকার অক্ষর নানাপ্রাণী ও বস্তু চিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শীল এবং মোহরের অক্ষর পংক্তিতে মনুষ্য যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর ধনুক বা শৃঙ্খলিত মল্লক্রীড়ারত, চক্রারোহী প্রভৃতি। মাল্য, হংস, পতঙ্গ, বৃক্ষ, এবং লতা, পাতা, ঘর, চেয়ার টেবিল, তীর, ধনুক, এমন কি মন্দির প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্নের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ সময়কার আদি এলাম, প্রাচীন সুমের, ক্রীট, ও মিশরের চিত্র লিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই লেখায় যে রীতিমত একটা বর্ণমালার উদ্ভব হয় নাই ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ণমালার সৃষ্টি হইলে এত অসংখ্য চিহ্নের আবশ্যকতা হইত না। এই গুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনিব্যঞ্জক আর কতকগুলি ভাবব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হয়। এখানকার অক্ষরের সঙ্গে, প্রাচীন সুমেরীয় আদিম এলামবাসী, প্রাচীন ক্রীটবাসী এবং হিট্টাইট জাতির চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

ল্যাঙ্গডন, মহেঞ্জোদাড়ো চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। সিন্ধুলিপির বহু চিহ্নিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি ব্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। ওয়াডেল বলেন, শীলমোহরের ভাষা সংস্কৃত এবং তাহাতে ভৃগু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ পড়িয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ডাঃ প্রাণনাথ প্রফেসর ল্যাঙ্গডনের নির্দ্দেশমত ব্রাহ্মী ও আদি ইরাকীয় ও আদি

ইরাণীয় লেখার সাহায্যে সিন্ধুসভ্যতার বহু সংখ্যক শীলমোহরের পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলেন।১০১

দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কর্জন সাহেব লিখেছেন যে সংস্কৃতই আর্য্যগণের আদি ভাষা। ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদি বাসস্থান বলিয়া ভারতবর্ষের সেই আদি ভাষা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ভারত হইতে আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্যত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সেই দেশের ভাষার সহিত আর্য্যগণের ভাষার অনেক শব্দ মিশিয়া আছে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈশালীতে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী ও সিন্ধুসভ্যতার অক্ষর একত্র পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এক শীলমোহরে খৃঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মীলেখার পাশে নিম্নলিখিত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ শীলমোহর দ্বিভাষায় লিখিত। (আর্ক, সার্ভে ইণ্ড; এন রিপ, ১৯১৩-১৪, পি এল নং ৮০০) ইহাতে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় অক্ষরের ধারাবাহিক সম্বন্ধেই প্রমাণিত হয়।

"অধ্যাপক ল্যাঙ্গডন মনে করেন, মহেঞ্জোদাড়োর অক্ষর হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য যে আছে ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে স্যার ক্যানিংহাম এই চিত্রলিখন হইতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বপ্রথম অনুমান করেন। সিন্ধুতীরের অক্ষরের মধ্যে সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থচিহ্নাদির প্রয়োগ হইত ইহা কেহ কেহ মনে করেন। এইগুলি পরবর্ত্তীকালের ব্রাহ্মী অক্ষরের চিহ্নের মতই; ইহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

চেকোশ্লাভিকিয়ার প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্রোজনি মনে করেন, সিন্ধুসভ্যতায় লিপিরা অধিকাংশ চিহ্নই, প্রাচীন হিট্রাইট

১০১ প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদাড়ো, পৃ ১৩৭।

জাতির শব্দবাচক হিরোগ্লিফিক লিপিমালার মত। এ জাতীয় কীল-কলিপির সঙ্গে এখানকার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। সিন্ধুসভ্যতার এই অজ্ঞাতলিপি হইতে অজ্ঞাত ভাষা সম্বন্ধেও তিনি বলেন যে ইহাও ইন্দোইরোপীয়ান ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং হিট্টাইট গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ারাল পূর্ব্বোক্ত বি চিহ্নিত শীলমোহরের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি স্যর কনিংহামের উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন যে এই লেখা পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রলিপি অপেক্ষা পুরাতন ব্রাহ্মীলিপিরই অধিকতর সমীপবর্ত্তী।

ইহা মিশরীয় ও সুমেরীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত সেইস, গ্যাড, সিডনি স্মিথ, ল্যাঙ্গডন ও স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি প্রভৃতি মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গ্যাড বলেন, "লিপির গঠন প্রণালী ডান হইতে বামে। সিন্ধু উপত্যকার লিপি একস্বরসূচিত অক্ষরমালার সৃষ্টি এবং স্বতন্ত্র বর্ণমালায় সৃষ্টি তখনও হয় নাই বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। লেখাগুলিতে ব্যক্তি বিশেষের নাম ও উপাধি উল্লিখিত থাকা, এবং ঐ নামগুলি ইন্দো আর্যভাষায় লিখিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

গ্রীক খৃষ্টীয়যুগে উত্তর পশ্চিমভারতে প্রচলিত লাঞ্ছনাময় মুদ্রায় কোন কোন চিহ্নের সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় শীলমোহরেরর চিহ্নের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনিই প্রথম স্থির করেন।" ১০২

## সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্ব

"ম্যাক্সমুলার বলেন, "পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃতই শ্রেষ্ঠ ভাষা। গণিতশাস্ত্র যেমন জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ ভাষা বিজ্ঞানের মূলীভূত।" প্রফেসর বোপ বলেন, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাষা পূর্ণবয়ব সম্পূর্ণ, অধিকতর ভাবদ্যোতক, সৌন্দর্য্যশালী ও শব্দ চাতুর্য্যময়।" সমালোচক শ্রেজেল

১০২ প্রাগৈতিহাসিক, মহেঞ্জোদাড়ো ; পৃঃ ১২৭-১৩০

বলেন, সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বলিয়াই উহার নাম সংস্কৃত।" "সার উইলিয়ম হাণ্টার বলেন, "ইউরোপীয়গণ যে সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই তাহাদের ভাষা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। মিঃ পোকক বলেন, গ্রীক ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন।" অধ্যাপক হীরেন বলেন, "সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীন জেন্দ ভাষার অঙ্গীভূত।" মুনেডুবোর মতে—বর্ত্তমান ইউরোপের সকল ভাষার অঙ্গীভূত সংস্কৃতভাষা।" ডাঃ ব্যালাণ্টাইন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, সকল এরিয়ান বা ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন। খ্যালাণ্টাইনের এতদুক্তির সমর্থনে অধ্যাপক বোপ বলেন—এককালে সংস্কৃতভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা ছিল। কর্জনের সিদ্ধান্তের পোষকতা করিয়া মিঃ মুইর বলিয়াছেন, "আর্য্যগণ কখনই পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বরং সেই সকল দেশের সভ্যজাতিরা ভারতীয় আর্য্যগণের বংশ হতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।" ১০৩

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে ভাষাতত্ত্বেও সিন্ধু ও সুমের সভ্যতার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল এবং ঐ সম্বন্ধের ধারা বহন করেই বৈদিক সভ্যতার বিকাশ। সিন্ধু সভ্যতার চিত্রলিপির ধারা বহন করেই সুমেরীয়, এলামীয়, ক্রীটীয় ও হিট্টাইট চিত্রলিপির উৎপত্তি। এই বিষয় সম্বন্ধে সাংস্কৃতিক প্রমাণই যথেষ্ট। জাতির উৎপত্তি, বিচরণ ও কীর্ত্তিকলাপ বিষয়ে আলোচনা করলে এই বিষয়ে দৃঢ় মত প্রকাশে কোন বাধা থাকে না।

ব্রাহ্মী অক্ষরই বর্ত্তমানে বৈদিক অক্ষরের নিদর্শন। এই ব্রাহ্মী অক্ষর সিন্ধুর অক্ষর থেকেই উৎপন্ন। সম্প্রতি প্রাপ্ত শীলমোহরে ব্রাহ্মীর সঙ্গে সিন্ধুলিপির চিহ্ন দেখলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে ব্রাহ্মীলিপি সিন্ধুলিপির সন্তান। পাশ্চাত্ত্য মত, যাহা এখনও ভারতের বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বর্ত্তমানে প্রচলিত, যে ভারতীয় আর্য্য-

১০৩ ভারতবর্ষ, দুর্গাদাস লাহিড়ী ; ২য় ভাগ ; ৩২,২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা।

গণের কোন লিপি ছিল না, উহা বিদেশাগত—এই মত আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। যদি সিন্ধুসভ্যতার লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপি আগত হয়ে থাকে এবং হিট্টাইট, ক্রীট, এলামীয় প্রভৃতির সঙ্গে সিন্ধুলিপির সম্বন্ধই প্রমাণিত হয়ে থাকে, আর এইসব সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়েই যদি সিন্ধুলিপির উদ্ভব হয়ে থাকে বলে প্রমাণিত হয়, তবে আর ক্রীট বা ফিনিশিয় বর্ণমালাই ভারতীয় বর্ণমালার জন্মদাতা—এই সিদ্ধান্ত করা অবাস্তব কথা হয়ে পড়ে! ইতিপূর্ব্বে কতক কতক আলোচনা হয়েছে তবুও যখন আমরা এর পরে জাতিগতভাবে আলোচনা করব; তখন এ বিষয় আরও প্রমাণ দেওয়া যাবে। এখন শুধু এইটুকু প্রমাণে আমরা দৃঢ় হ'তে পারছি যে সিন্ধুলিপি থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি হয়েছে। এ বিষয়ের জন্য সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার না হলেও বিশেষ অন্যমত হতে পারে না।

## সিন্ধুভাষার সঞ্চরণ

সিন্ধুসভ্যতা যেমন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন, ইহার ব্যবহৃত ভাষা ও লিপিও তেমনি সকলের চেয়ে প্রাচীন। ভারতের অভ্যন্তরে এই সিন্ধুভাষাই ব্যবহারিক সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা যাহা প্রাদেশিকরূপে রূপায়িত। উহা ভারতের মধ্যে বহুরূপে রূপায়িত। আর ভারতের বাহিরেও উহা বহুরূপে রূপায়িত। প্রাচীনকালে এই রূপায়ণগুলির লিপির নাম সুমেরীয়, হিট্টাইট, আরামাইক—ফিনিশিয়, সেবীয়, গ্রীক, জেন্দ, পহ্লবী প্রভৃতি। আবার এই গ্রীক থেকে ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃতকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা নামে অভিহিত করে, উহার নাম কেন্তুম ও সতম দুভাগে ভাগ করেছেন। তারা সংস্কৃতকে রাশিয়ায় উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং ঐ সংস্কৃতভাষী জাতি নাকি—এক ভাগ ভারত দখল করেছে আর অন্য

ভাগ ইউরোপে বাস করছে। যাই হোক এই মতটি যে ঠিক নয় তা আমি পরে বিশেষভাবে দেখিয়েছি।

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দিক থেকে বহু প্রমাণে, ইতিপূর্ব্বে দেখান হয়েছে যে সিন্ধু সভ্যতাই উপরে যে কয়টি সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের উৎপত্তির মূল। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। পরে আরও প্রমাণ বার হবে। লিপির প্রমাণে, সিন্ধু-লিপির সঙ্গে সুমেরীয়, হিট্টাইট, আরামাইক, ফিনিসিয়, সেবীয়, জেন্দ, পহ্লবী প্রভৃতি একই বর্গের। যা' কিছু তফাৎ হয়েছে, সেটা দূরত্ব এবং বিভিন্ন আধারে লেখার জন্য হয়েছে। এই হাতের লেখার পার্থক্যটি মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে কতই না পৃথক হয়! তার প্রমাণ সকলেরই জানা আছে যে, স্বাক্ষরের বৈশিষ্ট্যতার জন্যই দলিলপত্রের মূল্য হয়ে থাকে।

ভারতের ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি অন্য প্রকার। ইহা ভাব প্রকাশক লিপি নয়—ইহা ধ্বন্যাত্মক বর্ণলিপি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইহার মূলে। এই লিপিও ছিল সাধারণের নাগালের বাহিরে, বৈদিক মহাঋষির গোপন ধন। পরবর্তীকালে ইহা সাধারণের হাতে আসে—এই ব্যাপার খৃঃ পূঃ নবম শতকের পর। এই সময়ই সিন্ধুভাষার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি যথা পৈশাচী, সৌরসেনী, মাগধী, দ্রাবিড়ী, জেন্দ প্রভৃতি ভাষাগুলি ব্রাহ্মী লিপিকেই আশ্রয় করে। কালক্রমে নব্য পারসিক ধর্ম্মের প্রভাবে পারসী, পহ্লবী প্রভৃতি আরামাইক লিপির পথ অনুসরণ করে।

আর ভারতে তখন ছিল নাগজাতির বিরাট প্রভাব। গান্ধার থেকে আসাম এবং সিংহল পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে নাগ জাতির সঞ্চরণ চলছিল প্রবল প্রতাপে। এই বিষয় অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। নাগজাতি যে লিপি ব্যবহার করেছিল, তাহাই সমস্ত ভারতের লিপিরূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। বলা বাহুল্য এই লিপি ব্রাহ্মী লিপিরই সন্তান। পণ্ডিতগণ লিপির পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন, নাগরী লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

সিন্ধুভাষা মূলে থাকলেও ভারতীয় লিপি বৈজ্ঞানিক ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে বৈদিক ভাষায় সংগঠিত হওয়ায়, ইহা ভারতের বাইরে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া থেকে পৃথক গতি লাভ করেছিল। এই বৈদিক ভাষার উৎপত্তি সিন্ধুর উপত্যকায়। ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব স্থান ও গান্ধার-পাঞ্জাব অঞ্চল। এখান থেকে ঐ লিপি একদিকে সৌরসেনী মাগধীরূপে, অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে সিন্ধু গোদাবরী তীরে বিস্তৃত হ'ল নাগরী, তামিল প্রভৃতি আকারে। আর উত্তরে কাবুল উপত্যকায় অক্ষুতীর ধরে কাশ্যপ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল ব্রাহ্মীলিপি—জেন্দ, পৈশাচীর মাধ্যমে।

মূলে ছিল এই সিন্ধুলিপি, লিপির পার্থক্য জন্মাল পশ্চিম এশিয়ায়—উহা আরামাইক, তথা ফিনিশিয় ও সেবীয় বণিক ব্যবহৃত-লিপি গ্রহণ করার ফলে। ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে মূল শব্দগুলির কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষ, পারস্য, এশিয়া মাইনর গ্রীস প্রভৃতি যেখানে যেখানে সিন্ধুসংস্কৃতির লোক গিয়েছে, সেখানে ভাষার মূল শব্দ এক—সিন্ধুর শব্দ। লিপির পার্থক্য হয়েছে বটে কিন্তু উহা বসতকারী লোকের সংখ্যা ও প্রভাবের অনুপাতে। যেখানে যেখানে সংস্কৃত বৈদিক ভাষার সংস্কৃতির লোক বেশী গিয়েছে যেমন, পারস্য, বাহ্লিক, ভরুক, খোটান, কুচী, সমরখন্দ, আর্ম্মেনিয়া, এসিয়া মাইনর, গ্রীস, প্রভৃতি অঞ্চলে সিন্ধু তথা বৈদিক মূল শব্দের অস্তিত্ব প্রবলভাবে আছে দেখা যায়; কিন্তু লিপির বেলায়—এই সমস্ত স্থানে যেখানে ব্যাবিলোনের প্রভাব বেশী পড়েছে সেইখানে আরামাইক লিপি—তথা ফিনিশিয় লিপির প্রচলন হয়েছে। উহা প্রধানতঃ বামাবর্ত্ত অর্থাৎ খরোষ্ঠি। সুতরাং সিন্ধুর প্রভাবের অনুপাত পরিমাপ করতে হলে অর্থাৎ যেখানে বেশী সিন্ধু সংস্কৃতির লোক বেশী সংখ্যায় উপনিবিষ্ট তাহা বুঝতে হলে, সেই দেশের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কত বেশী আছে তা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। সিন্ধুভাষা ও সংস্কৃতি মূলে ছিল বলেই পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে শব্দ ও সংস্কৃতির এত

সাদৃশ্য। সিন্ধুলিপির সঙ্গে ফিনিসিয়, তথা আরামাইক, হিট্টাইট, আদিপারসিক আদিইলামীয় লিপির এবং এদের সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়েছে। এইসকল দেশের লোক উপনিবিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য স্থান থেকে আগত, কারণ উপনিবেশের সময় এদের সংস্কৃতি আদিম-স্তরের ছিল না। আর এদের উত্তর ভারত ছাড়া অন্য কোথাও আদিম নিবাস বলে জানা যায় নাই, কারণ উত্তর ইউরোপে ঐ কালে ঐ রকম উন্নততর সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল না। মধ্যএশিয়ায় অক্ষু উপত্যকা বা বাহ্লীক ও মেদ দেশের সংস্কৃতিটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। উহার সংস্কৃতি ভারতীয়। সুতরাং একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একটি মূল সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকার যুক্তি আপনা আপনিই আসে। ঐরূপ সংস্কৃতির অস্তিত্ব একমাত্র সিন্ধু উপত্যকাই দেখাতে পারে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আরও যথাস্থানে করা হবে।

সিন্ধু সভ্যতার স্থানটি গান্ধার, বালুখ ও সিন্ধু অঞ্চল। এখানকার প্রাচীনভাষা-সংস্কৃতের ব্যবহারিক কথ্য ভাষা। এই ভাষাটি পরবর্ত্তী সাহিত্যে পৈশাচী প্রাকৃতের রূপে পরিচিত দেখা যায়। এই প্রাকৃতের বিভিন্ন শাখা—মাগধী, তামিল, সৌরসেনী, পহ্লবী, জেন্দ, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি। সুতরাং এই ভাষার অঞ্চলগুলি থেকেই সিন্ধুর প্রকৃত অধিবাসীর ভাষা অনুমান করা সহজ। উহা ছিল সংস্কৃতের ব্যবহারিক ভাষা বা প্রাকৃত। এই সিন্ধু অঞ্চলবাসীরা প্রধানতঃ নাগ-উপাসক ছিল। এদের পরবর্ত্তী নামই নাগজাতি। এদের ব্যবহারিক লিপির নাম দেবনাগরী। পূর্ব্বে—ব্যাকরণ হওয়ার আগে এদের লিপি ছিল—চিত্রাক্ষর ও ভাবাক্ষরের সমাবেশ—যাহা সুমের, ইলাম, হিট্টাইট, ফিনিশিয়ায় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে ভারতের বাহিরে গিয়েছে। ব্যাকরণবদ্ধ ঐ সিন্ধুভাষাই ভারতে দেবনাগরী বলে পরিচিত হয়েছে।

## ব্রাহ্মীলিপি তথা নাগরীলিপি

এই সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলের প্রধান নগর ছিল তক্ষশীলা। গ্রীয়ার্সন বলেছেন যে, মাগধীভাষার লিখিত সংস্করণ যে পালি, উহা তক্ষশীলায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত।১০৪

সুতরাং অতি প্রাচীন কাল থেকেই গান্ধার অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে মগধের ভাষার সম্বন্ধ ছিল এবং ঐ সম্বন্ধ মূলগতই ছিল। ইহার কারণ যে এই ভাষা নাগেদেরই নাগরভাষা।

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "গুহালিপির অক্ষর পরীক্ষা করলে নাগরী লিপির মূল দেখা যায় না, কিন্তু নাগরীলিপিকে গুপ্তলিপি থেকে উদ্ভূত বলা যেতে পারে। গুজরাটে যে নাগরীলিপি ব্যবহার করা হয়, তাহা নাগরব্রাহ্মণদের দ্বারা—হয় গৌড়, নয় মগধ, নয় গুজরাটের অঞ্চল থেকে আনীত হয়েছে। আমি যে সমস্ত প্রমাণ দিয়েছি তাতে প্রমাণিত হয় যে অনেক ব্রাহ্মণ, প্রাচীনকাল থেকে গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। এঁদের দ্বারাই নাগরীলিপি গুজরাটে প্রচারিত হয়েছে।" ১০৫

আচার্য্য ক্ষিতি মোহন সেন লিখেছেন, "বরোদা সেন্সাসে আছে যে নাগরব্রাহ্মণদের পুস্তকে দেখা যায় যে তারা নাকি নাগবংশ জাত। ১০৬

কনকসভাই লিখেছেন, "১৮০০ বৎসর আগেকার সময়ে নাগেরা তামিলের রাজা ছিলেন। ইহাদের আবিষ্কৃত অক্ষরই দেবনাগরী। এই অক্ষর নাগরদের এবং তাঁরা উত্তরপূর্ব্ব ভারত থেকে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন।" ১০৭

---

১০৪ Hisory of Sanskrit languages; Winternitz Vol II p. 603 )

১০৫ জে. এস. বি. ১৮৯৬, পৃঃ ২১।

১০৬ জাতিভেদ, ক্ষিতি মোহন সেন।

১০৭ Tamils 1800 years Ago, Kanaksavai, p. 41.

কনকসভাই আরও লিখেছেন, নাগরী শব্দটার উৎপত্তি নাগর শব্দ থেকে। তামিল দেশে, নাগর, নাগরপথন, নাগরকোট, নাগল পুরম প্রভৃতি স্থানের নামের অভাব নাই। নাগ জাতিই ভারতীয়দের একটা মূল শাখা। ইহারাই নাগরঅক্ষর ও নাগরীভাষার জন্মদাতা। এই লিপি নাগেদেরই লিপি।" ১০৮

## পৈশাচী ভাষা

গ্রীয়ার্সন বলেন, "ঋগ্বেদের আভিজাত্যধর্ম্মের যাগযজ্ঞ, গান্ধার অঞ্চলেই বেশী হত। ঋগ্বেদ এই অঞ্চলেই সংগৃহীত হয়েছিল। সেই জন্য ঋগ্বেদের ভাষার মধ্যে পৈশাচী প্রাকৃতির সম্বন্ধ বেশী—এই ভাষা তক্ষশিলা বিদ্যালয়ের কথার মাধ্যম ও শিক্ষাদানের বাহন ছিল।"১০৯

তক্ষশিলায় ব্রাহ্মীলিপিই প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হোত। ব্রাহ্মীলিপির প্রাদেশিক সংস্করণ নাগরলিপি বা নাগেদের লিপি। পার্শী বা পহ্লবী ভাষা—ব্যবহারিক সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হলেও জরাথুষ্ট্রের নবপারসিক ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর ব্যাবিলনের লিপি পারস্য-সম্রাটের রাজধানীর ভাষার লিপি হোল'। ব্যাবিলনীয় লিপি ছিল ফিনিশিয়। এই ফিনিশিয়ার লিপি ছিল আরামাইক লিপির জননী। উহা খরোষ্ঠী অর্থাৎ উহা বামাবর্ত্ত—উহার লেখার গতি দক্ষিণ দিক থেকে বামে। এই লিপি গ্রহণ করার কারণ, এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেখা পড়ার কাজ ফিনিসিয়ার লিপিতেই পশ্চিম এশিয়ায় চলত। প্রথমে তাহা ছিল দক্ষিণাবর্ত্ত পরে হয় বামাবর্ত্ত। ( Alphabet, David Diringer p. 297 ).

ভারতীয় বৈদিক অধ্যাত্মবিদ্যার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন ছিল না। ভারতে ব্যবহারিক কাজকর্ম্ম সিন্ধুলিপির সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারাই চলত। ভারতের প্রভাবের বাইরে উহার কাজ চলত ফিনিসিয়-

১০৮ Tamil 1800 years ago Kanaksavai

১০৯। হোম অব লিটারেরি পালি, গ্রীয়ার্সন, ভাণ্ডারকার কমেমোরেশন ভলিউম পৃঃ ২৭১।

লিপিতে। সিন্ধুলিপির চিহ্নগুলি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য ভারতে ব্রাহ্মী এক বিষয়ে ফিনিসিয়ুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা সত্ত্বেও যাদের পারসী সাম্রাজ্যের সঙ্গে আদান প্রদান কম ছিল অর্থাৎ অক্ষুউপত্যকাবাসীদের, যারা কুচী, সমরখন্দ, খোটান, খসগড় প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী। এদের ছিল ব্রাহ্মীলিপির অঞ্চল। ১১০

"যখনই আমরা এই নিঃসন্দেহ সত্য আলোচনা করি যে পৈশাচী প্রাকৃত তক্ষশিলার চারিদিকের ভাষা ছিল এবং পৈশাচী ভাষা পালির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তখন আমাদের এই সিদ্ধান্ত করার প্রবল যুক্তি আসে যে সাহিত্যের পালি, মাগধী ভাষার সাহিত্যিক সংস্করণ, যে মাগধী তখন ভারতের ব্যবহারিক ভাষা ছিল। কারণ তখন ইহা তক্ষশিলার বিদ্ব্যাবিদ্যালয়ের কথিত ভাষা এক সাহিত্যের শিক্ষার বাহন ছিল। ইহা শিক্ষিত বৌদ্ধদের ভাষা ছিল এবং মার্জিত রূপে ইহা সাহিত্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।" ১১১

উপরের এই উদ্ধৃতিতে ইহা প্রমাণ হল যে সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন তথা আদিবৈদিক যুগের ভাষার জন্মস্থান হরাপ্পার সংস্কৃতিরই অঞ্চল ছিল এবং পিশাচ জাতিই যথার্থ বৈদিক সংস্কৃতির মূলে ছিল। পিশাচ জাতি সিন্ধু সংস্কৃতির জাতি—সেইজন্য আর্য গণ্ডীর মধ্যে তার স্থানই নাই বটে কিন্তু তার ভাষাটি বৈদিকেরা গ্রহণ না করে পারে নাই। বৈদিকের এই ভাষাটির সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের খুবই সাদৃশ্য ছিল বলেই তক্ষশিলায় পৈশাচী প্রাকৃত তথা মাগধী কথ্যভাষারূপে প্রচলিত হতে পেরেছিল। পৈশাচী প্রাকৃত সম্ভবতঃ সিন্ধু লিপিতেই প্রথম প্রচলিত হয়।

উপরের সাক্ষ্যে আমরা সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার ঘনিষ্ঠতা এবং ক্রমবিকাশের সূত্র দেখতে পাচ্ছি। সিন্ধু ও গান্ধার প্রদেশ ছিল নাগঅধ্যুষিত অঞ্চল। পৈশাচী ভাষাও নাগদেরই কথ্য ভাষা।

---

১১০ Descriptive account & antiquities of Afganistan by H. H. Willson, page 122, 123.

১১১ হোম অব লিটারারি পালি ভাঃ ক, ভলিউম, পৃঃ ২৭১।

নাগেদের মধ্যে অনেকে বেদ মন্ত্র রচয়িতা ঋষি ছিলেন। নাগেদেরই কোন শ্রেণীর নাম পিশাচ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব। কালক্রমে ঐ নামটি ঘৃণাব্যঞ্জক অর্থে গৃহীত হয়েছে। প্রাচীনকালে হয়তো, পিশাচ নামটি হীনতাবাচক ছিল না। কালক্রমে যাজ্ঞিক লিপি যাহা ব্রাহ্মী তাহা প্রবর্ত্তিত হলে নাগেরা সিন্ধুলিপির চিহ্নগুলিকে ত্যাগ করে ধন্যাত্মক ব্রাহ্মী লিপি গ্রহণ করে। ব্রাহ্মীলিপি থেকেই নাগরীলিপির জন্ম।

## ইন্দো ইউরোপীর জাতি

### নর্ডিকতত্ত্ব

নর্ডিক বা ইন্দো-ইউরোপীয়তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা হয়েছে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করছি। পরে ভাষাতত্ত্বে আরও আলোচনা আছে। পার্জিটার মনে করেন যে উত্তর পশ্চিম থেকে কোন জাতি ভারতে উপনিবিষ্ট হয় নাই। গঙ্গার উৎপত্তি স্থানকে তারা সবচেয়ে পবিত্র মনে করেন—ইহা একটি বড় প্রমাণ। সাহিত্য আলোচনায় মনে হয় তাহারা পূর্ব্বাঞ্চল থেকেই পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছিলেন। ১১২

ডাঃ দত্ত এই কথার সমর্থনে তার পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ডাঃ কীথ, তাঁর রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলজফি অবদি বেদজ গ্রন্থের ৯, ১০, ১৩, ২৪, ২৬ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করেছেন যে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে আর্য্যগণের ভারতের বাহির থেকে আসার বা তাদের ঋণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১১৩

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, তাঁর "বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়" নামক প্রবন্ধে ( সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪২ ) দেখিয়েছেন যে বৈদিক কৃষ্টির মূলে ভারতের প্রভাবই বিদ্যমান। ১১৪

১১২ ষ্টোডিজ ইন সোসিয়েল পলিটি, ডাঃ বি, এন দত্ত পৃ ৯৪

১১৩ রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলজফি অবদি বেদজ গ্রন্থ ৯, ১০, ১৩, ২৪, ২৬ ও ৩৯।

১১৪ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪২।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত ইক্ষু, ধান্য প্রভৃতির নৈবেদ্য বা পিণ্ড প্রাচ্য-ভারতেরই বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার ইক্ষু ও ধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সিন্ধু যুগের পরে বৈদিক যজ্ঞ বা বৈদিক বিশেষত্বপূর্ণ আহবনীয় দ্রব্য এবং উপকরণ, যজ্ঞের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রূপান্তর লাভ করেছে এবং বৈদিক যুগের পূর্ব্বেই উহার সংস্কৃতি যে গঙ্গা উপকূলে ধান্য ও ইক্ষু অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল,তাহার প্রমাণের অভাব নাই, কিন্তু ঐ বৈদিক যজ্ঞসংস্কৃতিকে তার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫০০ হাজার বছরের পূর্ব্বে সিন্ধু-সংস্কৃতিরই বিকাশ বলে মনে করতে হবে।

ডাঃ পঞ্চানন মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল অব লেটার্স (ভলুম—১, ১৯২০, পৃঃ ১৭৫, ১৭৬, ১৯৩) তে লিখেছেন যে ভারতের প্রাচীন অধিবাসীরা সংখ্যায় বহু ছিলেন, তাদের অবস্থান খুব উঁচু সভ্যতার স্তরেই ছিল, ইহারাই সমুদ্র ও ভূমির মাধ্যমে পারশ্যও মিশরে বিস্তৃত হয়েছিলেন। ভারতেই তাহাদের সভ্যতার প্রথম বিকাশ। ১১৫

রিপ্লে লিখেছেন, "আর্য্য সম্বন্ধের মতপ্রবর্ত্তক ম্যাক্সমুলার তাঁর শেষ বয়সে ইংলণ্ডে বুঝেছিলেন যে তাঁর অধিকাংশ কল্পনাই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং ঘোষণা করেছিলেন—যে নৃতাত্ত্বিক,আর্য্য-জাতি, আর্য্যকেশের কথা বলেন; যারা গোলমাথা সম্বন্ধীয় অভিধান বা লম্বা মাথা সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের কথা বলেন, তাহাদের মত একই পাপে পাপী।" ১১৬

হাটন লিখেছেন, "আর্য্য শব্দ জাতিবাচক বা গোত্রবাচক নয় ইহা সংস্কৃতিবাচক।" ১১৭

ব্রিফল্ট লিখেছেন, "বৈজ্ঞানিক ধারণার খুব সুবিধা হবে যদি

১১৫ জার্নাল অব লেটার্স (ভলুম—১, ১৯২০, পৃঃ ১৭৫, ১৭৬, ১৯৩)।

১১৬ Replays Race of Europe, page 3.

১১৭ Caste in India Hutton, page 5.

আর্য্য শব্দটি আমাদের অভিধান থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়। ইতিহাসে আমরা শুধু সেই আর্য্যদেরই দেখা পাই, যারা মিদ্দিস এবং তাঁদের মধ্য এশিয়া সম্ভূত শাখা, যাদের মধ্য থেকে ভারতের প্রাচীন বা বৈদিক আক্রমণকারীদের পাওয়া যায়।" ১১৮

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে আর্য্য-আক্রমণ সম্বন্ধে ব্রিফণ্টের সময় কোন মধ্য এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই—এইজন্য ব্রিফণ্ট মধ্য এশিয়াবাসীদ্বারা আর্য্য আক্রমণের বিষয় লিখেছেন। ব্রিফণ্ট আরও দেখিয়েছেন যে বেদ ভারতেই প্রণীত হয়েছিল; উহাতে কোন বৈদেশিক উপনিবেশের প্রমাণ নাই। ব্রিফণ্ট যে মেদ জাতি থেকে আর্য্য আক্রমণকারীদের উদ্ভব বলেছেন—ঐ মেদ জাতি যে ভারতের বৈদিক আর্য্যদেরই গোষ্ঠী—ইহার প্রমাণ পারশ্য প্রসঙ্গে এবং ভাষা প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

নীচে "আর্য্য" সম্বন্ধে গবেষকদের আলোচনার গ্রন্থতালিকা দেওয়া হল:

রিসলিনসনের আলোচনা—জে এ এস বি, ভল ১৬, পৃঃ ১, ৪৪, ৪৭।

পার্জিটারের আলোচনা-শক সম্বন্ধে প্রবন্ধ—আর এ এস, ১৯১৯, পৃঃ ৩৬১।

ভিন্সেণ্ট স্মিথের আলোচনা—জে আর এ এস, ১৯০৩, পৃঃ ২৬।

ব্রিফণ্টের আলোচনা—মাদার্স—১নং ভলিউম; পৃঃ ৩৩৪।

## ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক

উত্তর ইউরোপে আর্য্যত্বের মূল উৎপত্তির কাহিনী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। ডাঃ দত্ত লিখেছেন, "Since the closing of the first World war, a new hypothetic biotype called the 'Proto-Nordic came into existence. This biotype is supposed to have had its origin in Asia and from

১১৮ মাদার্স, ব্রিফণ্ট, ১ নং ভল্ পৃঃ ৩৯১.

there, it migrated to North Europe, where it took the form of full fledged Nordic. But it is a sugar-coated pill, it does not satisfy the National Chauvinism of German Society. To them, still the Germanic race is the original Aryan biotype which goes out to the world as the "Herren Volk" (Master people). Thus the question of the identity of the Aryan biotype has entered the phase of purely political nature.

But since the second world war, the anthropologists of Soviet Russia are busying themselves with the question. We have already referred to the opinion of the acamedician V V Struvel. Recently in a book entitled, "Soviet Anthropolgy", the Docent M. Levin has criticised the Nordic theory and its proponents claim that the Indo-European languages were created by a Northern Race. Thus a new chord has been struck in the note of Aryan Controversy by a new class of Anthropoligists.

## জাতিতত্ত্বে বৈদিক জাতি নর্ডিক নয়

We have already seen that the Gods of the Veda, by no means can be metamorphised into whites of European Variety or the Nordics of the North European type.

In Mandala Rv. 1,122,14; Rishi Kakshivanta prays for a beautiful son with golden ears. That means an ideal beautiful Arya of Rigveda will be a

brunette. This again is tantamount to the colour of a fair complexioned Hindu of present day.

Further, we read of a lady, giving birth to a black brown or brown child in X 65.12. Again in X 31.11 we hear that Kanva Rishi was of black color. Still again in 10 Rik 36, the Rishi says," ত্রসদস্যু, the son of Purukestraya gave me 50 friends, he is the greatest among the donors Arya and satpati. Then in the next Rik the Rishi says, "On the river banks, the leader of the darkskinned people, ত্রসদস্যু donated me food and wealth". Here the famous Vedic king is described as black or brown and is also an Arya. Again the complex of X 42 hymn is named কৃষ্ণ আঙ্গিরস. The adjective betrays his complexion. Further, the Rishi Sabasya Atreyu of the Atri clan (V, Ss. and 12 : VIII 37 and 38) had been of dark colour. Again Asita Devala of the কাশ্যপ Clan is clearly marked out as a man of black complexion. Further another Rishi of the আঙ্গিরস clan is named কৃষ্ণকায়। (X 42). Again অথর্ববেদ্ refers to golden colour of man (19, 24, 8). Further, while incantating charm to promote the growth of the hair on the head, this Veda says, "May the hair grow as reedy, may they cluster black about thy head (VI, 133). Again the বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র says, "A passage of the revealed text (শ্রুতি) declared, "Let him kindle the sacrificial fire, while his hair is still black" (1,135). Thus taking all

these evidences of skin colour and hair colour of Vedic literature it can be sefely said that the Vedic people were of Brunette variety of mankind. That means that they were as fair as light skinned Hindus of to day. These evidences set at naught the contention that the Vedic people were Nordic or Proto Nordic". ১১৯

## ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা

ইন্দো-ইউরোপীয় শ্রেণীতে ভারতবর্ষের ভাষাকে ফেলা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ভাষা তত্ত্বের নিয়ন্তা। তাঁর মতে, "আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের দিকে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি রুষ দেশের অন্তঃপাতী ইউরোপ ও এসিয়া জুড়িয়া বিদ্যমান বিশাল সমতলভূমিতে তাহাদের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইখানে তাহাদের ভাষা—প্রাচীন আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষা সমূহের আদি জননী নিজ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়।" ১২০

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ৮টি শাখা—(১) ইন্দো-ইরাণীয়, (২) আর্ম্মাণীয়, (৩) বালতোশ্লাবিক (৪) আলবানীয়, (৫) গ্রীক, (৬) ইতালীয়, (৭) কেলতীয়, (৮) জার্ম্মানীয়। প্রথম চারিটিকে এক শ্রেণীভুক্ত করে নাম হচ্ছে—কেন্তুম্। অপর চারটিকে এক শ্রেণীভুক্ত করে নাম—সতম্।

কেন্তুম বিভাগের এই ভাষাকে আর্য্যগোষ্ঠীভুক্ত করার জন্য নর্ডিক মতবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। রুষিয়ার দুটি ভাগ একটি ইউরোপের মধ্যে—অন্যটি এশিয়ার মধ্যে। এই মাঝামাঝি অবস্থার জন্য রুষিয়াকে এই আর্য্যভাষার জননী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

---

১১৯ Vedic Ritiualism, page 132.

১২০ 'ভাষার ইতিহাস'—মুরারিমোহন সেন, পৃঃ ১৪।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়েছি নর্ডিক তত্ত্বটির কোন মজবুত ভিত্তি নাই। নৃতাত্ত্বিকগণ এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। আর্য্য আগমণতত্ত্বকে *নৃতাত্ত্বিকেরা উপহাস করেছেন। ইতিহাসের দিক—যাহা প্রত্নতাত্ত্বিক* অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তাতেও নর্ডিক তত্ত্ব বা ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব দাঁড় করাবার উপায় নাই। এ বিষয়ে পশ্চিম এশিয়ার জাতিতত্ত্ব এই গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাহ্লিক, পারসী, শক, মেদ, মিটান্নী, কাসসাইট, হিট্টাইট আর্ম্মাণী, যবন প্রভৃতি জাতির উপনিবেশ পশ্চিম এশিয়ায় বা দক্ষিণ রাশিয়ায় ছিল। এই জাতিগুলির আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বছর থেকে খৃঃ পূর্ব্ব নবম শতক মধ্যে। এর আগে আর এদের ইতিহাস নাই। খৃঃ পূর্ব্ব ২০০০ বছর পূর্ব্বে রাশিয়ার উত্তর, দক্ষিণে বা উহার সীমানার দক্ষিণে কোন সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির সংবাদ প্রাচীন সাহিত্য বা প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন এখানে যাযাবর জাতির যাতায়াত ছিল।

ভাষা সভ্যতার বাহন। ভাষা বিস্তৃতির পরিচয় পেতে হলে তার সভ্যতারও বিস্তৃতির খবর পাওয়া চাই। দুঃখের বিষয় এই ইউরোপ-আর্য্যমতবাদের উৎসাহী উদ্যোক্তারা এই খবর দিতে পারেন নাই। সুতরাং এই মতবাদের মূল ভিত্তিই শূন্যে প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত জাতিগুলির মধ্যে হিট্টাইট, মিটান্নী, কাসসাইট, ইত্যাদি বাদ দিলে, অন্য জাতিগুলির বিকাশের পরিচয় খৃষ্ট পূর্ব্ব অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হয় না; আর হিট্টাইট প্রভৃতিও যে খৃষ্টীয়পূর্ব্ব দুই হাজার বছরের উপরের সংস্কৃতির জাতি নয়, তাহার পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা পাওয়া গিয়েছে। এদের ভাষা যে ইন্দো-ইরাণীয় তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এদের জাতিতত্ত্ব এবং বিস্তৃতির বিষয় এই গ্রন্থে বিশেষভাগে আলোচিত হয়েছে। মিটান্নী, কাসসাইট, যবন, ইরাণী, আর্ম্মাণী প্রভৃতি জাতির মূল যে ভারতের উত্তরাঞ্চল, তাহাও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদেরই সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় বৈদিক পুরাতাত্ত্বিক বিবরণের মধ্যে এই জাতিগুলির সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব দ্বারা ইহার অনুমান দৃঢ় হয়েছে। গ্রীক ও আরামাইক ভাষার কাছে যে কেন্তুম শ্রেণীর ভাষাগুলি ঋণী তাহাও এই ইন্দো-ইউরোপীয়বাদীদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষাকে এই জাতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

বৈদিক ভাষা যদি এই জাতিগুলির ভাষা থেকে প্রাচীনতর বলে প্রমাণত হয়, তা হলে এই জাতিগুলির ভাষার উৎপত্তি যে ভারতে— তাতে অন্য কোন বিতর্ক থাকে না।

সিন্ধুসভ্যতার ভাষা সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও একমত হন নাই। সিন্ধুসভ্যতার অবস্থান এবং প্রত্নতত্ত্ব নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করেছে যে সিন্ধুসভ্যতার সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভাষা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না হলেও ইহার লিপি সম্বন্ধে বিচারে স্বীকৃত হয়েছে যে সিন্ধুলিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপিরই জননী—ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই এই বিষয়ের মতামত পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

## সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি

সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম ভাষা। এই ভাষার প্রাচীনতম লিপির নাম ব্রাহ্মী লিপি। সংস্কৃত ভাষা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত; কথ্য ও বৈদিক। কথ্যভাষা বিভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ধ্বনি ও স্বরের পার্থক্যে বিভিন্ন প্রাকৃতে পরিণত হয়েছে এবং উচ্চ চিন্তার জন্য ঐ কথ্য ভাষাই নিয়মবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়েছে। এই ভাষাকে নিয়মবদ্ধ করার চেষ্টার পরিণতিই ব্যাকরণ।

## বৈদিক ভাষা

বৈদিক মন্ত্র সাহিত্যের ব্যাকরণ অতি প্রাচীন এবং উহা ভিন্ন জিনিস। এই ব্যাকরণ যজ্ঞবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বৈদিক ব্যাকরণের

প্রথম প্রবর্তক মহেশ। বৈদিক যজ্ঞসংস্কৃতির প্রবর্ত্তক দেবরাজ ইন্দ্র। ঐন্দ্র ব্যাকরণই তার প্রমাণ। তৈত্তিরিয় ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় ইহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে বরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের Language and scripts of Ancient India গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি, "The Vac was not uttered earlier as desired. She sought the aid of the Devas who desired to model her suitably. He with Vayu's help, gave the desired forms to her aid from that time onwards. Vac in the new shape became compulsory for Jajnas." (Tait S/6/4/7).

The fact is clear; that Indra made the Vedic Vyakarana and in conformation, we read the মহাভাষ্য of Patanjali that there was the শ্রুতি current that Indra learned ব্যাকরণ from বৃহস্পতি for a thousand years. This shows that Indra was a grammarian and বৃহস্পতি as a preceptor of the Devas was naturally the teacher of Indra and in the Bhasa or ব্রহ্মজ্ঞানসুক্ত of বৃহস্পতি, he gives the history of the language.

So, the fact out of all these is that the দেব party wanted to get the better of the Asuras and for that they tried to and did make the যজ্ঞ more efficacious by introducing Rics and Samas in Jajnas and framed a new vocabulary ( নির্ঘণ্টু ) and প্রতিশাখ্য rules to evade immitation."

Jajnas language was meant exclusevely for the Vedas. This was according to "শতপথ ব্রাহ্মণ" The যজ্ঞ is Deva বাক্ and at that time there was another বাক্

which was meant for other than যজ্ঞ words of the priests." ১২১

এইজন্যই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীটিতে বৈদিক-ভাষার নিয়ম সংকলিত করেছেন অষ্টম অধ্যায়ে।

## দেবগাথা—প্রাক্ বৈদিক সংস্কৃতি

ঋক্ মন্ত্র ও গাথাতে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটিই সম্ভবতঃ প্রাক্বৈদিক দেবার্চ্চনার ধারা বহন করে।

"Indra Gatha displays a peculiar type of languages. They are loaded with Nipatas and other Vedic words of pecular meaning. They are not Rigmantras but Gathas. Rics are Srutis, which the Gathas are not, even though they appear in the অথর্ববেদ and the ব্রাহ্মণ. In General, Rics praise Devas and Gathas praise men. The latter form a separate group of matras of Yajnas called the Narasansa Yajnas. These gathas were songs and mantras with which people before the যজ্ঞ cult was introduced, discharged their religious duties to the Devas and where যজ্ঞ came to be introduced they were retained as a part of the Yajna. These gathas appear to form a line between the Vedic and the prevedic age. They clearly have a language between the simple and the Vedic types in words and metres. They contain clearly Pouranic form of prayer, side by side with Yajna. They praise the

১২১ Language & Scripts of Ancient India, p 9, 12.

Devasa Yajna and probably these were gathas praising nonYajna devas also in the same language. They are Pre-Ricvedic in origin. ১২২

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সিন্ধু সংস্কৃতিতে বৈদিক যজ্ঞ ছিল না। সেখানে ছিল গাথা বা অগ্নিতে বলিদানের সঙ্গে স্তোত্র আবৃত্তি। এটির পরিচয় পাওয়া যায় সুমেরীয় এবং গ্রীক সংস্কৃতি থেকে। পারসী ও ইহুদীদের, দেবতার কাছে বলিদানের সময়ও এইরূপ গাথা স্তোত্র উচ্চারণের প্রথা ছিল। এই সূত্রেই অনুমান করা যায় সিন্ধু সংস্কৃতিতেও এই প্রথাই ছিল, কারণ এই সমস্ত সংস্কৃতির মূলেই সিন্ধুসংস্কৃতি। পরবর্ত্তীকালে যজ্ঞ বাহুল্যের লাঘব হওয়ায় পৌরাণিক সংস্কৃতিতে গাথাই প্রবল হয়।

## সংস্কৃত নামের কারণ

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের প্রথম সুক্তে বৃহস্পতির ব্রহ্মজ্ঞান সুক্তে ( যাহা ভাষাসুক্ত )—বৈদিক ভাষার মূল, বিকাশ এবং পরিণতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উহা উদ্ধৃত করে বরেন্দ্রবাবু লিখেছেন, "Thus the earliest form of the language consisted of certain spontaneous words (রূঢ় words), root verbs and interjections and these were used as they are. Bibhaktis and Pratyayas are sanskars, imposed on each word for use in the language and this is why the ancient Indian language is called sanskrita.

১২২ Language & Scripts of Ancient India—p 45

## বৈদিক কালে লিপির অস্তিত্ব ছিল

"According to Rigvedic facts, Yasna existed with some standard mantras and ways of performance and the use of mantras and steps of works were so fixed that the slightest mistakes marred the extensive Yasnas totally. Yajna had so tedious and so very lengthy procedures that there was every probability of the most expert priest to commit mistakes by ommission and commission if working alone. To check this, the Brahma priest with perfect practical knowledge of Yagna had to be employed (Rig Veda 8/72/7) and he dictated the current things to the priest. This sugests existence of the procedure of Yajna in the form of books : for the processes are very intricate and lengthy and things are to be repeated at different stages of the work, sometimes with the same mantras and sometimes with different ones. It appears from all these that there were some books on correct procedure, the পদ্ধতি books of the types of ভবদেব and রামদত্ত Paddhatis.

The root অধি-ই to "meaning to read" has been used in Ric mantras such as Rv. 1-170-1,5-44-13, 9-67-31-32 and elsewhere Showing that reading was known in the Vedic times. The Atharva Veda speaks of the Purana, Itihasa etc. (in অথ ১৫।৬।১১-১২) and has used the word গ্রন্থ (in অথ ২০।১৫-২)।

The root লিখ has been used in the অথর্ববেদ (২০।১৩২-৮,১৪।২।৬৮) and in the তৈত্তিরীয় সংহিতা (১।২।৫।১,২।৫।১।৭)।

স্বাধ্যায় work includes study of all the Vedas or certain mantras of all the Vedas and other things such as the পুরাণ, ইতিহাস etc. and it is to be performed by every Brahmana. This is the prescription of all the Brahmanas. Then at the time of the great Brahmanas, reading of the books was in practice. The গোপথ ব্রাহ্মণ mentions ধাতু, প্রতিপাদিকা, নাম, লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি, প্রত্যয়, স্বর, উপসর্গ, নিপাত, ব্যাকরণ, বর্ণ, মাত্রা, পদ, অক্ষর and these are sufficient indications as to the existence of the বর্ণমালা and books on grammar (1-1-23). Not only that the same authority mentions names of several subjects of study such as কল্প, রহস্য ( আরণ্যক্ ), উপনিষদ, ইতিহাস পুরাণ, নিরুক্ত etc. (1-2-I0). The তৈত্তিরীয় আরণ্যক্ refers to বর্ণ, their স্বর, মাত্রা, বল etc. (1-2). The বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র speaks of ধর্ম্ম Pathaks (1-1-9) and these anticipate books in existence at this time.

যাস্ক speaks of several historians, grammarians and makers of Niruktas. These are suggestive of books in existence at this time. Yaska further refers olearly to the collection of the ঋগ্বেদ by শাকল্য (6।5।29). Some sort of written records, therefore existed before যাস্ক।

Panini has 4 sutras 'অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে' in his অষ্টাধ্যায়ী where he used Grantha to mean books. Words লিপি, লিবি, লিপিকর etc. used in the Paninian Grammar, show

that writing was in vogue at his time. Roots গ্রন্থ পঠ্, পুঠ্ are used to derive synonyms of book.

ঋক্ ৯।৯৭।৭, speaks of Ushana's extempore versification before huge audience, rendering all spell-bound by the composition and presentation. This definitely points to the existence of a voluminous literature in popular poetry, now lost to us.

Verses could be orally made and committed to memory and transmitted through generations but the Brahmanas, with them huge bulk discussing countless topics of irrelevant nature can not be developed in the most perfect forms without the help of writing. However vast be the memory's page, it was impossible to build a huge book like the শতপথ ব্রাহ্মণ। Can a reasonable man believe that such a huge book having no repeatitions of one and the same topic unnecessarily and having no inconsistency what soever from the beginning to the end, without written drafts? This book again has well classified 14 Kaṇḍas, 100 Chapters and 7800 sections of 5 sentences, each on average. It is physically impossible to prepare orally such a bulky book of intricate contexts.

Thus the age of books in India reaches back a time far beyond the 9th Century Bc, when the Phoenician merchants are said to have taught the art of writing to the Indian traders.

The Vedic literature of all types show that the

authors knew the Varnas. The reference to Akshara to denote letters are frequent everywhere. There is a compulsory rule binding on all users of the Vedic Verses in Yajna, in Sandhya, in Swadhaya or স্বস্ত্যয়ন, that the ঋষি, দেবতা and ছন্দ of the verse must be stated before it is used ; and any failure or any wrong naming of these bring serious consequences. In order to avoid all mistakes in these respects, there have been authoritative compi lations of the names of Risis, Devatas and Chhandas of every mantra. Every Veda has therefore Anukramanics detailing these informations very minutely and correctly so that the users of the mantras may not incur any harm on himself or the যজমান by wrong use of these.

The ছন্দ of a mantra is very difficult to ascertain in respect of the verses.***

The aforesaid compulsory provisions are to be had in the Brahmanas, then before the times of the compilers of the Brahmanas, the বর্ণমালা must have existed in order to ascertain the name of the ছন্দ of the poem.

Books on শিক্ষা classify Varnas according to their way of utterance ; the প্রতিশাখ্য rules definitely describe how letters are joined naturally with their neighbours in words and sentences, while verses are sung or recited.

The authors of the Upanishads, the Aranyakas, and

the Brahmanas knew letters and their divisions and applications.

So there remains no doubt as to the existence of the Indian বর্ণমালা from the Vedic times onwards. The Phonecian origin is therefore a myth.

## ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বর্ণমালা

The original letters of the Indian বর্ণমালা were only forty two as found in the four প্রত্যাহার Sutras, quoted in the very outset in the অষ্টাধ্যায়ী of Panini and this বর্ণমালা is called the মাহেশ্বর লিপি, as they are said to have come from মহেশ্বর of the Indian Trinity. According to Vedic leterature, "All sounds are Brahman (শব্দব্রহ্ম) i.e. indestructable. A language is but a collection of words. All words are thus constituted of certain sound units. Then a language means some primary sound units, which by permutation and combination make up all words of the language.

Some people did not go to the finest divisions of all sounds and took up some primary and some composite sounds symbols to make up their language. In the west, such attempts were made and slightly different Varnamula were evolved. There, some did with 20 sound symbols and some needed more to express all ideas in sound. There it is seen that one symbol stands for different sounds.

But in India the learned scholars studied all sounds thoroughly and found that 49 primary sound units are there in all sorts of expressions in talks and in speeches. But they found that 14 more subtle sounds units are necessary for recitation and singing. Thus the Indian বর্ণমালা developted in 3 stages, first they depended on the 42 মহেশ্বর লিপি, which were increased by 7 more to 49. But the subsequent final study brought in another twice 7 new ones to culminate the number to 68.

Siksa rule further studies the internal and external efforts on the part of the will and vocal machines and how the efforts were caused. Siksa sutras detail from what parts, the other letters were pronounced. At last the minutest movements of the tongues and of the প্রাণবায়ু have first been fully and clearly studied and the letters were classified. From the above classification, it is clear that difference in sound of Varnas is due to the sound being emitted from the different centres of sounds, in the mouth. The Varnas are again enough to express in sound, even the sound of different animals. Then we can say with fair precision that the Varnas are hardly variable with place, person and time. They are permanent and common with all. They have got no beginning neither, any end. Men acquire the sounds of Varnas, instinctively. They are automatically known when

the baby learns to talk. In the present topic, বর্ণমালা of India, unlike other countries, they never attempted to evolve any tentative methods, they tried surely to build universal system which is scientific and is natural and universal at the sometime. It is unthinkable that they were borrowed from any body else; rather India has materially studied the system and other countries of the world have in fact built up the science of language in Indian fashion. We get the chronology going backward—Panini—Vrittikaras—Rule makers. So this classification of the বর্ণমালা takes us back to an uncertain antique age. So these শিক্ষা and প্রাতিশাখ্য rules go back to the Vedic times.

Hieroglypt is the figure of an object standing for a word, syllable or sound. So it is picture representation. In Egypt or china, picture of objects or ideas were used to represent the sound. In Egypt or China almost similiar methods were used. The language consists of Short words of composite sounds and for each such word, there is a symbol. So the number of symbols is enormous in that language. They are very difficult to draw and even when drawn give ambiguous readings and meanings. So for ordinary letter writing or other simple purposes, the priests devised easier symbols for quick work. These are Hieratic Scripts.

Asia minor and Mesopotemia developed another

system. They wrote on Clay tables with styles; naturally round marks would not go clear and writing took the shape of wedges. This is known as cuneiform system. For each syllable there was a symbol. Thus there were a number of symbols; for expression of ideas, requisite numbers of symbols were used. Among the syllables, again there were some which stood for letters when the syllable was unilateral.

But a still more novel system was accidentiy developed by the Phonecian traders who carried on commercial entorprises far and wide. They required to keep accounts of their debtors who were many in numbers. They grouped them according to the first letters of their names. They picked up words beginning with A. B. G. L. etc. and having pictures easy to draw. Alfa meant a bull, Beta a house, Gama a camel and so on and they were short words with easy picture: these were therefore selected as symbols in sight and sound of different groups of names of their debtors. This mode of recording on went only with the busy traders. Here the symbols were Alfa, Beta, Gama etc. of the hieroglyphic system, but they acted as letters.

This present arrangements of the Alphabets is one in which they were first used and none thought in later times to regroup them with aim in view, for they were only arbirary symbols taken from the hieratics and Cuneiform ways of writing. It is said

that some 50 languages, of the West adopted the Alpha-Beta system for writing.

## ভারতীয় বর্ণমালা ও এ্যালফাবেটের পার্থক্য

(1) There are in general three systems of writing namely-Hieroglyphic, syllabic and alphabetic, current in this world in ancient times. Some following the 1st, some the second and some the last. India did never take in a wide scale, this Hieroglyphic system of picture-writing, There is no instance of syllable system ever flourshing here. But বর্ণমালা system has been the popular way of everywhere and in every age of India. If India learned the Alphabets from Phonecian, she would have stuck to it like every other countries adopting the language and would not have cared for any other system. She invented her own varnacular and have been following the system steadfastly for over 5 millenia in the least.

(2) . The Indian বর্ণমালা consists of 49 letters of which 16 are vowels, where the Phonecian Alphabets number only 20 with hardly any vowel. The letters in the former system are primary sound units, while those of the latter are names of some objects of the language and naturally are composite sounds. In the Western system, one letter stands for several sounds as 'a' in bad and bade, bath and ball, 'g'in goal

and gaol, while in the Indian system, every letter has a permanent sound and application. The Indian system is to write from left to right, while the Phonecians made all writings from right to left.

So, in soul, body, limbs and functioning, the Phonecian system sustains no comparison,—no simi liarity whatsoever with the Indian বর্ণমালা।

(3) The Asokan বর্ণমালা of the 3rd century B C have no similiarity with their Phonecian brethren. These varnas were there in the times of the Brahmans and the Vedas, the age of which were far beyond the 1st mellemum B C. So the Phonecian origin of Indian বর্ণমালা does not appear feasible under any circumstances worth the name.

(4) We have referred to and quoted a part of the inscription in বাগজোকাই, in the cuneiform system of writing that record the text of the treaty of Hittite and Mittanny kings in the 14 cent B C. In it, the Vedic devas like Indra, Mitra, Varuna, and Nasatya have been invoked. This clearly shows that cultural contact existed between India and Asia minor long before the time of the treaty. Had the Indians no knowledge of writing, they ought to have learned the Cuneiform system from these fellow brethren of the same religious faith. It may be argued that after seperation of the Indian Aryans, the cunieform system has been invented, But when the treaty was drawn,

these people were guided by the same form of religion and by the same set of Devas. Naturally there must have been cultural intercourse during the time of treaty. Again, there are definite indications as to the commercial connections between India and the entire middle East at about the time and earlier. So the Cunieform system was naturally expected into India, if Indians had no other system at that time.

That Indian Varnamala had originated in India is also the decision of great scholars like Cunningham, Princep, Dawson, and Maxmuller and others."

## ব্রাহ্মী লিপির মূল বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি

সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টি থেকেই ধ্বনিতত্ত্ব এবং ব্যাকরণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মী লিপি হচ্ছে বৈদিক ভাষার লিপি—বেদের মন্ত্রই ইহার মূল। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বেদ হচ্ছে—মন্ত্র সংহিতা। মন্ত্র শুধু স্তোত্রের মত সাধারণের দ্বারা আচরণীয় বস্তু নয়। বৈদিক আচার্য্যের ইহা রহস্যাবৃত সম্পদ। গুরু এবং তাঁর মন্ত্র শিক্ষার অধিকারী শিষ্য ব্যতীত এই মন্ত্রবিদ্যা অন্যের শিক্ষনীয় বস্তু নয়। জপ সম্বন্ধে এই বিধান বিশেষ কঠোর, কিন্তু উহা ছাড়াও আবৃত্তি মূলক মন্ত্রের বেলায়ও অনধিকারীকে শিক্ষা দেওয়া অপরাধ। বৈদিক ভাষাও দুর্বোধ্য, রহস্যাবৃত; কারণ মান্ত্রিক শব্দের নিয়মই এই। ইহা সান্ধ্য ভাষা। সাধারণ লোক এই ভাষার সবটুকু বুঝাতে পারে না; ইহা গুরুর নিকট বুঝতে হয়। এই মান্ত্রিক বিশেষত্বের জন্য ঋষি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ

---

১২৩ The Language & Scripts of India; Barendra Kumar Bhattacharya, 72 p 80, 82. 84, 89 & 92.

নিরুক্ত ও মান্ত্রিক ব্যাকরণ বা বৈদিক ব্যাকরণ প্রনয়ণ করেছেন। এই ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের ধাঁরা আছে। বেদ, প্রতিশাখ্য, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদে সর্ব্বত্র এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়।

ইতিপূর্ব্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ধ্বনিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বর্ণমালার সৃষ্টি করেছে। উহা পাশ্চাত্ত্য এ্যালফাবেটের মত খেয়ালী চিত্রবর্ণের মত কাল্পনিক বর্ণমালা নয়। উহা বহুকাল যাবত, ধীর গবেষণা এবং পরীক্ষার ফল। ইহার সৃষ্টির মূলে যজ্ঞ ও মন্ত্র—তার ধ্বনি এবং সুর। অপর পক্ষে ফিনিশিয় আরামাইক, সেবীয় বর্ণমালার প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসাও রাজকার্য্য।

ভারতের সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকার পাণিনির অষ্টব্যায়ীয় উদ্ভব কাল ধরা হয় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক। পাণিনির বহুপূর্ব্বে বহু ব্যাকরণ-কারের নাম পাওয়া যায়। দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাদের শিষ্য পরম্পরার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে আরও প্রতিপন্ন হয়—অপিশালী, কাশ্যপ, গার্গেয়, গালব শক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, শাকল্য, সেনাকা এবং স্ফোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বে ছিলেন।' ১২৪

বৈদিক ব্যাকরণের প্রবর্ত্তক মহেশ্বর বা মহেশ আদিবৈয়াকরণিক। তার পরে ঐন্দ্র ব্যাকরণ এবং অন্যান্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত কার জন্মেছেন। পাণিনিও অষ্টাব্যায়ীর শেষে বৈদিক ব্যাকরণ প্রয়োজন মনে করে উহা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহা পৃথক ব্যাকরণ।

যজ্ঞের প্রয়োজনে যজ্ঞের সভাপতি ব্রহ্মার নিকট এই মান্ত্রিক ভাষা ও তার নিয়মাদি পরিচালনার ভার থাকতো। তিনি যজ্ঞের শব্দ ও বর্ণোচ্চারণ ইত্যাদি সংশোধন করতেন। এইজন্য তাঁর নাম থেকেই এই ভাষার লিপির নাম হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি।

১২৪ ( ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড পৃ ৮০ )

এই ব্রাহ্মী লিপি সাধারণে প্রচার করা নিষেধ ছিল। সাধারণ লোকে এই লিপির খবর বহুদিন পর্য্যন্ত পায় নাই।

## বৈদিক যজ্ঞের উদ্ভবকাল

ব্রাহ্মী লিপি, বৈদিক জটিল যজ্ঞ প্রথার সমসাময়িক। বৈদিক ভাষার উৎপত্তি বৈদিক যজ্ঞ থেকেই—ইহার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বৈদিক ভাষা বা তৎকালীন বৈদিক শব্দযুক্ত সংস্কৃত ভাষার সাক্ষ্য আছে বাগজোকাই লিপিতে ও মোবাইট পাথরে লেখা মিশরের প্রস্তরলিপিতে। ইহার আনুমানিক বয়স খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৪ বা ১৫ শতক। আমাদের স্তর বিভাগে ইহার সময় তৃতীয় স্তরে বা চতুর্থ স্তরের প্রথম ভাগে পড়ে।

সেই সময় সংস্কৃত ভাষা এবং বৈদিক দেবতা ইন্দ্র মিত্র, বরুণ, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া গেয়েছে। সুতরাং এই যুগটি যে বৈদিক যজ্ঞের যুগ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বৈদিক যজ্ঞের অস্তিত্ব পেলেই বৈদিক ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সহজ। সুতরাং হিট্টাইট জাতির উদ্ভব খৃঃ পূঃ ১৭ বা ১৭ শতকের আগে থেকেই ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্ব ধারণা করা যায়।

ভারতীয় সাক্ষ্যে ঐ ব্রাহ্মী লিপির তথা ভারতীয় আর্য্য তথা বৈদিক কালের অস্তিত্ব আরও আগে চলে যায়। বৈদিক দিগ্বিজয়ী রাজাদের বিষয় ঋগ্বেদে অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দিগ্বিজয়ের যুগেই উর ও কিসে অর্থাৎ উরুকসিতিতে বৈদিক উপনিবেশের কথা ঋগ্বেদে আছে—ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। সম্ভবতঃ ইহা হাম্মুরাবীর রাজ্যত্বের কাছাকাছি সময়ে। ইহা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২২ শতক। প্রায় এই সময়ের কাছাকাছি আর্য্য, হিকশোশ প্রভৃতি জাতি সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আবার ইহারাই অল্পকাল পরে খৃঃ পূঃ উনিশ শতকে এসিয়া মাইনরে কাপ্পাডোসিয়ায় হিট্টাইটের আবির্ভাব।

আবার অন্যদিক দিয়ে দেখলে ভারতীয় পৌরাণিক ও বৈদিক রাজাদের রাজবংশ তালিকা ধরে অগ্রসর হলে, বেদব্যাসের আবির্ভাব কাল অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ২০০০ বছরের কাছাকাছি হয়। ইহা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ব্যাসের সময়টিকে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন কাল বলে অনায়াসে ধরা যেতে পারে।

বেদ সংগ্রাহক বেদব্যাসের বহু পূর্ব্ব থেকেই বৈদিক যজ্ঞ-সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের ক্রম চলে এসেছে। বেদব্যাসের পূর্ব্বে আর এক বার বেদ সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্র ঋষিদের বংশগত সাধনার ফল, সুতরাং উহার মধ্যে কতকগুলি যে ঐ সময়ের দু'এক হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং কমপক্ষে ধরলেও বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি আরও ৫০০ বছর আগে ধরা অন্যায় হবে না। বৈদিক যজ্ঞবাদের উদ্ভব খৃঃ পূঃ ২৫০০ শতক থেকে খৃঃ পূঃ ২০০০ শতক বলে ধরে বৈদিক ইতিহাস রচনা করলে অন্ততঃ পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক জাতিগুলির সংস্কৃতি ও সঞ্চরণের হিসাবটাতে কোন ভুল সৃষ্টি হবে না।

## হিটাইট লিপি কেন ব্রাহ্মীতে লেখা হোল না

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যদি বাগজোকাই লিপি বৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় বলে ধরা যায় তবে উহা কেন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হোল না।

মোবাইট পাথরের লিপি ছিল মিশরের সঙ্গে ভাষণলিপি। সুতরাং ইহা তাহাদের সহজবোধ্য প্রচলিত ফিনিসিয় লিপিতেই হয়েছিল। কেননা, মিশরের লোকের কাছে ব্রাহ্মী লিপি অবোধ্য ছিল। বাগজো-কাই লিপিও অপর জাতির সঙ্গে সম্ভাষণের জন্য লেখা; সুতরাং সেখানে স্থানীয় সুবোধ্য লিপিই ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যদি হিট্টাইটদের নিজ জনের নিকট সম্ভাষণ করে ঐ লিপি লিখিত হোত, নিশ্চয়ই তাদের নিজ ভাষার লিপি ব্যবহৃত হোত।

প্রকৃতপক্ষে হিট্টাইট লিপিও ছিল সিন্ধুর ও ফিনিসিয় লিপির চিহ্নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত—একথা ইতিপুর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। ঐ সময় আস্সুরীয় রাজারা ফিনিসিয় লিপি ব্যাবহার করত এবং পশ্চিম এশিয়ার ব্যবসায়ী মহলে ঐ লিপিই প্রচলিত ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় হিট্টাইট শব্দের বিবরণে আছে যে হিট্টাইটদের দেবতা-সংস্কৃতিতে নিজ নিজ ভাষা ও যজ্ঞ বলিদানের নিয়মাদিই ব্যবহৃত হোত।

## ব্রাহ্মীলিপি সর্ব্বশ্রেণার সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল

এত প্রাচীনকালে ব্রাহ্মীলিপির ও ভাষার উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু উহা সাধারণেরও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। ইহা যজ্ঞের সভাপতি ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত। অধিকারী এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর নিকট ইহা বড় একটা পরিচিত হতে পারে নাই। ডাঃ বুলারের গবেষণাই ঠিক। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৮০০ শতক অর্থাৎ ফিনিসিয় এ্যালফাবেট উদ্ভবকালে, ইহা প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়। এই সম-সাময়িক কালে ঔপনিবেশিক ইরাণীয়দের আবির্ভাব হয় পশ্চিম এশিয়ায়। আফদাই ( আফ্রিদি বা বৈদিক অপ্রীতি ), মাদাই (মেদ ), পরশু (পারসিক ) জাতি নব তেজে আবির্ভূত হয় পারস্যের রঙ্গমঞ্চে। এই সময়ে ব্রাহ্মীলিপি—এরা ছাড়া আর কে আনবে এশিয়া-মাইনর ও সিরিয়ায়? আসসুর সম্রাট এদের সর্দ্দারকে ধরে নিয়ে গিয়েছে আসসুরে বা মেসপটেমিয়ায়। এর আগে আরও আর্য্যজাতির উপনিবেশ হয়েছে সিরিয়া, এসিয়ামাইনর, ক্রীট ও ফিনিসিয়ায়। তারা প্রচলিত ফিনিসিয় লিপি ব্যবহার করলেও নিশ্চয়ই স্বজনদের মধ্যে যজ্ঞাদিকার্য্যে ব্রাহ্মীলিপির ব্যবহার করত। এই তিনটি উপজাতি ইতিপূর্ব্বে শক্তিহীন থাকলেও আসসুর আঘাতের ফলে এদের শক্তি জাগ্রত হয়েছিল এবং এরাই শীঘ্র বিরাট পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

ডাঃ বুলার লিখেছেন "খৃঃ পূঃ ৮০০ শতকে ব্রাহ্মীলিপি সিরিয়া থেকে গিয়েছে।" এই সময় পারসিক জাতির ভাষা বাহ্লীক বা পহ্লবী, জেন্দ, পিশাচী প্রভৃতি—এই কয়টি ভাষার লিপি ছিল ব্রাহ্মী। এর অনেক আগে থেকেই পারস্যে মহর্ষি ভৃগুর বিদ্রোহের ফলে ব্রাহ্মীলিপি সর্ব্বশ্রেণীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয়েছিল। অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ত্যাগ করে, ভৃগু নূতন মন্ত্র সৃষ্টি করলেন। দেবাসুর সংগ্রামের কারণই তাহা। পারসিকগণ বৈদিক মন্ত্র ও বেদের মান্ত্রিক ভাষা গ্রহণ করেন নাই। তাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষা ছিল কথ্য বা ব্যবহারিক সংস্কৃত ভাষা বা উত্তর পশ্চিম ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা। সাম্রাজ্য চালনা করতে হলে পশ্চিম এশিয়ার প্রচলিত ভাষা ও লিপি তাদের গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই সময়ই তাঁরা আসমুর সংস্কৃতি গ্রহণ করে, রাজকার্য্যে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ত্যাগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জরাথুষ্ট্রের সংস্কারকে গ্রহণ করলেন।

## পারসিক সাম্রাজ্যেও ব্রাহ্মীলিপিই ছিল

ব্যাবিলনের লিপি ছিল ফিনিসিয় তথা আরামাইক লিপি। ইহাও সিন্ধুলিপির সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধ যুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। পরবর্ত্তী কালে, গান্ধার অঞ্চল দারিয়ুসের অধিকার-ভুক্ত হয়। এইজন্য গান্ধারে আরামাইক লিপি প্রচলিত হয়। মহারাজ অশোক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে এই লিপিতেই এই অঞ্চলের গিরিলিপি খোদিত করেন। লিপি ভিন্ন হলেও ভাষায় বা সংস্কৃতিতে কোন পার্থক্য হয় নাই। কারণ দারিয়ুসের সমসাময়িক কালেই সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মুকুটমণি পাণিনির প্রাদুর্ভাব হয়, এই গান্ধারেই। পরবর্ত্তীকালেও চাণক্যের জন্ম গান্ধারেই হয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাবেব প্রমাণই দুই প্রাতঃ স্মরণীয় বৈদিক আর্য্য। এই সময়ের ঐতিহাসিক প্রমাণেই জানা যায় স্থানীয় জাতীয় ভাষায় বিহিস্থান পর্ব্বতগাত্রে দারিয়ুস

পারসিক তথা ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করেছেন। পারসিক জাতি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক হয়ে পড়লেও বাহ্লুখ, গান্ধার, কম্বোজ, খোটান বা রাজপুর, কুচী, ভরুক, সমরকন্দ অঞ্চল ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করে নাই, মুসলমান আগমণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাহাদের ব্রাহ্মীলিপি ও স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাকে জীবিত করে রেখেছিল—ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া হবে।

খৃষ্টীয় ১ম শতকে বৌদ্ধ শ্রমণেরাও এই সমস্ত দেশে ব্রাহ্মী লিপি ও সংস্কৃত-প্রাকৃতের প্রচলন দেখেছেন।

## বৈদিক যজ্ঞসংস্কৃতিই ভারতের বৈশিষ্ট্যের মূল

যজ্ঞ বলতে সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে খাদ্য উৎসর্গ বুঝায়। প্রথম গ্রাম্যস্তরে মানুষ পশুর মাংস অগ্নিতে উৎসর্গ করে আহার করত। এই নিয়মটা মানবের জীবিকার উপকরণের বিস্তারের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ক্রমশঃ এই অগ্নিতে মাংস-উৎসর্গকে কেন্দ্র করে অনেক সামাজিক নিয়মের বিকাশ হয়েছে। মন্ত্র, বেদী, অগ্নি, দেবমূর্ত্তির প্রতীক, বলির পশু, বলির নিয়ম কানুন, আহারের বিধিনিষেধ, অন্যান্য উপচার প্রভৃতি দরকার হয়েছে। অসংখ্য অনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত, বর্ণ, শব্দ, ছন্দ, সুর, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অধিকার, বিচার প্রভৃতি সভ্যতার অশেষ প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের দরকার হয়েছে। ভারতের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞকে কেন্দ্র করে বিরাট বৈদিক সাহিত্য গড়ে তুলেছেন।

যজ্ঞ সংস্কৃতিটি আদিম সংস্কৃতি। প্রায় সকল মানব জাতির মধ্যেই কোন না কোন রূপে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। সিন্ধুসভ্যতার যজ্ঞসংস্কৃতির প্রমাণ—গ্রাম্যস্তরে বলিদান ও পরবর্তী সংস্কৃতির যজ্ঞসংস্কৃতির প্রকার ভেদের মধ্যে আছে। এই বৈশিষ্ট্যই বিভিন্ন

সভ্যতার পার্থক্যের পরিচয় দেয়। সিন্ধুর যজ্ঞপ্রথার সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞপ্রথার কোনরূপ তুলনা করা যায় না। ইহার মধ্যে সংকল্প, উপচার ও অনুষ্ঠানই এই পার্থক্যের কারণ।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অগ্নিপূজা ও বলিদান ছিল। এই অগ্নিপূজা ও বলিদানের নামই যজ্ঞ। এই প্রকার যজ্ঞ সিন্ধুসভ্যতায় প্রচলিত ছিল। সিন্ধুসভ্যতা থেকেই এই যজ্ঞ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া তথা ভারতের ভিতরে বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের সভ্যতার ৪র্থ স্তরে এই যজ্ঞ প্রথা অন্য ধারা গ্রহণ করিল। মন্ত্রবাদের উৎপত্তি, প্রথম স্তরে গ্রাম্য সমাজে। এই মন্ত্রবাদকে তথা যজ্ঞবাদকে সাধারণ স্তব ও প্রার্থনার রূপ দিয়ে সাধারণ লাভ লোকসানের হিসাবের বস্তুর মধ্যে পরিণত করেছে ভারতের বাইরে। আর ভারতীয় ঋষিগণ এই মন্ত্রবাদকে ভিত্তি, করে অধ্যাত্মতত্ত্বের চরম সত্যলাভ করেছেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধিলাভের মূলে শব্দবিজ্ঞান। এই শব্দবিজ্ঞানের ভিত্তি মন্ত্রবাদ কিন্তু অন্যান্য দেশে শব্দবিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই। এই শব্দবিজ্ঞানের রূপ বৈদিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণ, শব্দ, সুর, ছন্দ,—এক কথায় বৈদিক ভাষা। বৈদিক ভাষার আবিষ্কার—ব্রহ্মবাদ ও প্রণবতত্ত্ব।

এই বৈদিক ভাষা ছিল মান্ত্রিক ভাষা। ইহা যাজ্ঞিক ব্রহ্মা ঋষির রহস্যগুপ্তধন। ইহা অত্যন্ত আপনজন এবং অধিকারী ব্যতীত কাহাকেও দেওয়া গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হত। সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব ২ হাজার বছর আগে বেদব্যাস এই গুপ্ত মন্ত্রগুলি অতিকষ্টে উদ্ধার করেছিলেন। তখনও ইহা সাধারণের গোচর হয় নাই। এই গোপনীয়তার জন্য বৈদিক সাহিত্যের বহু সম্পদ এখন লুপ্ত। শুধু সেইগুলিই পাওয়া যায়, যেগুলিকে অন্য নিষ্ঠাবান কোন ব্রাহ্মণবংশ সংসারের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে রক্ষা করার জন্য অবলুপ্ত জীবন যাপন করেছেন। ইহা হয়েছিল বৈদিক রাজাদের ভ্রাতৃব্য যুদ্ধে শক্তিহীন হয়ে যাওয়ার ফলে এবং তারপরে যজ্ঞবিরোধী দর্শন ও উপনিষদের

নিবৃত্তিমার্গী মায়াতত্ত্ব প্রচারের ফলে। ব্রজেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতিতে ধ্যানতত্ত্ব এবং বৈদিক শব্দতত্ত্বের মূল বিষয়গুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, উহাতে এই বিষয় কতকটা বোঝা যাবে, বাকীটুকু পাঠক তাঁর গ্রন্থ থেকে পড়ে নিতে পারবেন। আমি এখন সিন্ধু সভ্যতার যজ্ঞ সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। সিন্ধুসংস্কৃতির অন্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যজ্ঞসংস্কৃতির পার্থক্যটুকু বিশ্লেষণ না করে দিলে, উপর উপর দেখলে সব যজ্ঞগুলিই একরকম মনে হবে।

## ইহুদী যজ্ঞ সংস্কৃতি

(১) প্রথমে ইহুদীদের যজ্ঞ সংস্কৃতিই ধরা যাক্। এদের যজ্ঞ সংস্কৃতি এদের নিজস্ব নয়। এটি এদের ব্যাবিলনের কাছ থেকে নেওয়া, কারণ এরা ছিল যাযাবর। ব্যাবিলন নিয়েছে সুমেরের কাছ থেকে। ইহুদীদের বলিদানের কথা ওট্লির গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি।

In the earliest times the "sacred stone or cairn was anointed with liquild offerings; oil, water, or the fat of a victim, this being the simplest mode in which the gift of the worshipper could be conveyed to the deity. A more highly developed form of sacrifice, consisted in the presentations of food or of vegetable first fruits. Animal secrifices offered by fire, mark a more advanced stage in religion, when, for the rude stone or cairn originally employed an altar of earth or of unhewn stone was substituted, serving as a table on which a meal might be spread before the deity. The original altar among the semites was simply a great stone or cairn at which victims

were slain and over or against which was poured out sacrificial blood, as the apropriate share of the deity. The real import of a bloody sacrifice was that it symbolised and was supposed to effcet the closer saeramental union between the dety and the worshippers. The same significance belong to the occasional application of life blood to the worshipper as well as to the sacred stone or altar, by this means or by the partition of the victim between the offerer and the deity or again be the passing of both partis between the divided portions of the flesh, a covenant bond was cemented or if broken, restored. The sacrifice was in fact the necssary preliminary to a meal which was itself a token of fellowship—a social act in which the deity and his triblesman or the individual worshipper sealed their felowship and symbolically expressed community of interests." ১২৫

## সুমের ব্যাবিলনের যজ্ঞ ও বলিদান

(২) যজ্ঞ বলিদান প্রথা সুমেরর মন্দিরে ছিল, ব্যাবিলনেও ছিল। ডোনাল্ড লিখেছেন, জল ও আকাশের দেবতা ছাড়া ব্যাবিলনে অগ্নি-দেবতা ছিল—গিরু, গিস, বার, াগবিল এবং নুসকু। অগ্নি ব্যবহার হোত মন্ত্রশক্তির প্রয়োগে। ইহা দানা দৈত্যকে দূর করত—ব্যাধির শক্তিকে তাড়িয়ে দিত। সম্ভবতঃ ইহাদের অগ্নিসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকর্ম্ম যেমন ক্যানানের লোকেরা ( ইহুদী ) করত সেই রকম ছিল। ইহা সম্ভবতঃ

১২৪ Rligaon of Israil, R. L. Ottly, Page—16.

ব্যাবিলোনীয় অগ্নি বা ধর্ম্মাচরণ ক্রিয়া যেমন বেলটেনে মে'ডেতে করা হ'ত, স্কটল্যাণ্ড, জার্ম্মানী এবং অন্যান্য দেশে করা হোত—সেইরকম ছিল। মানুষের বলিদানও অগ্নিতে আহুতিরূপে সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। নুস্কু ভারতীয় অগ্নির মতই দেবতাদের দূত—সংবাদ-বাহক ছিলেন।

যাষ্ট্রো বলেন, "ব্যাবিলনের মন্ত্র সংস্কৃতি অনেক দেবতাকে আহ্বান করতো, কিন্তু ইহার সবচেয়ে দরকারী অংশই অগ্নি এবং জলের দেবতা গ্রহণ করতেন। বিশেষতঃ "ই" ইহা গ্রহণ করতেন—যিনি অগ্নির দেবতা। এরাই হলেন প্রধান দেবতা—যার উপর বলিদানের ক্রিয়া নির্ভর করত। ১২৬

ব্যাবিলনের বলিদান সম্বন্ধে বাইবেলে উল্লেখ আছে। "মেকেঞ্জি লিখেছেন—

"The great burning and the human sacrifices in Babylonia referred to in the Bible were no doubt connected with the agricultural religions of the private order as was also the ceremony of baking and offering cakes to the Queen of Heaven, condemned by Jeremiah which obtained in the streets of Jerusalem and other cities". ১২৭

## গ্রীসের যজ্ঞ ও বলিদান প্রথা ঃ

(৩) গ্রীসেও যজ্ঞ ও বলিদান প্রথা ছিল। রজনীকান্ত গুহ লিখেছেন, "গ্রীসে প্রত্যেক গৃহে দেবার্চ্চনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড থাকিত ও আঙ্গিনায় জিউসের বেদী স্থাপিত হইত, তা ছাড়া রাষ্ট্রের

১২৬ মিশস অব ব্যাবিলনিয়া এণ্ড এসিরিয়া, মেকেঞ্জি, পৃঃ ৫০, ৫১

১২৭ M. O. B. I, A, by, D. A. Makenzie. Page—XXXV.

একটি সাধারণ অগ্নিকুণ্ড না থাকিলেই চলিত না। দেবায়তনের এই কয়টি অঙ্গ (১) নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করার বেদী (২) আঙ্গিনা এবং (৩) মন্দির। সচরাচর মন্দিরের সম্মুখে যে বেদী রচিত হইত, তাহাতেই পূজক নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করিত। প্রতিমার সম্মুখে যে বেদী থাকিত, তাহাতে প্রতিদিন ফুল, ফল প্রভৃতি শোণিত-সংশ্রবশূন্য নৈবেদ্য স্থাপিত হইত। বলিপূজার প্রধান অঙ্গ, প্রার্থনা স্তব, অভিশাপ সংকল্প ও শোধন—বলি ভিন্ন এগুলির কোনটি হইতে পারে না। বলি চারি প্রকার, ইষ্টদেবতার তৃপ্তিসাধন দ্বারা কাম্য বস্তুলাভ, কাম্যবস্তু প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ, ক্রুদ্ধ দেবতার প্রসন্নতা সম্পাদন এবং প্রায়শ্চিত্ত। বলির মূলে এই চারিটি অভিপ্রায় দেখা যায়। বলির সহিত যে প্রার্থনা উচ্চারিত হইত, তাহা মন্ত্রের আকারে গ্রথিত থাকিত, পুরোহিত তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। উপাসক দণ্ডায়মান হইয়া হাত দুখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ও উন্মুক্ত করপুটে, স্বর্গের অভিমুখে রাখিয়া প্রার্থনা করিত। সচরাচর প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইত। সমুচিত কারণ থাকিলে উহা গোপন থাকিত। বলির সঙ্গে শপথ গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। সংকল্পকারী বলি, বেদী বা প্রতিমা স্পর্শ করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিত। গৃহে দিবানিশি যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত, তাহাতে অগ্রে আহুতি না দিয়া গৃহস্থ এক গ্রাস অন্নগ্রহণ করিত না; তাহার সমীপে প্রার্থনা না করিয়া এক পা ঘরের বাহিরে যাইত না, কিম্বা গৃহে প্রত্যাগমনান্তর স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হইত না। আথেন্সে কেহ রাজপুরুষের পদে নিযুক্ত হইলে, মন্ত্রণাসভা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন যে তিনি অঙ্গহীন কিনা, তাঁহার গৃহে পারিবারিক বিগ্রহ আছে কিনা; তাঁহার পিতৃকুল চিরকাল নিষ্ঠাপূর্ব্বক ঐ বিগ্রহের পূজা করিয়াছেন কিনা। তিনি স্বয়ং যথারীতি পিতৃতর্পণ করিয়া আসিতেছেন কিনা?[১২৮]

১২৮ সঃ ক্রৌস, রজনীকান্ত গুহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬, ৭৭, ১৮১, ১৮৬, ১৯৬

## ভার্গব উপস্থায় পৃথক যজ্ঞমন্ত্র প্রচলন

মতিলাল দাশ লিখেছেন, "আবস্তা ভার্গব উপস্থা। পৌরাণিক গল্প হইতে আমরা জানি কাব্য উশনস, শুক্র বা ভৃগু দৈত্যগুরু এবং বৃহস্পতি দেবগুরু। বৃহস্পতি আঙ্গিরসবংশীয়। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ( ৭৬-৫-৬ ) দেবাসুর সংঘর্ষের কথা পাই। এই বিবাদ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই নানাদিকে বিভিন্নতা সৃষ্টি হইল। এমন কি পৃথকবিধ মন্ত্রে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল।

"ভৃগুভিঃ চাঙ্গিরাভিশ্চ হুতং মন্ত্রে পৃথগ্বিধম্ (বনপর্ব্ব ২২৩)।" ১২৮

অর্থব বেদের মধ্যেই ছিল সাধারণ লোকের মন্ত্র ও ধর্ম্মাচরণের ইতিহাস। ঋগ্বেদ প্রধানতঃ অভিজাত্যমূলীয় যাগযজ্ঞের মন্ত্রসংহিতা। পারসিকগণ অর্থর্ববেদের সংস্কৃতিই গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য পারসিক শাস্ত্রের নাম আথর্বন শাস্ত্র। অথর্ব ও অঙ্গিরস দুইজনই বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদে আছে যে অথর্ব ঋষি প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন। অথর্ব বেদের ছিল ২টি ভাগ। একটি ভার্গব ভাগ অন্যটি আঙ্গিরস ভাগ। ভারতে অথর্ববেদের আঙ্গিরসভাগই প্রচলিত। ভার্গব ভাগটির খোঁজ পাওয়া যায় না। এই ভার্গব ভাগই, যাহা পাওয়া যায় না—তাহাই পারসিকদের আবস্তা।

## জরাথুস্ট্রের বৈদিক মার্গ ত্যাগ

এই তো পারকিদের বৈদিক কালের ইতিহাস। পরবর্ত্তী কালে জরাথুষ্ট্র এই পথ ত্যাগ করে ব্যাবিলোনীয় ধারার ভিত্তিতে নব পারসিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈদিক ভাষা যাহা যজ্ঞের মন্ত্রের ভাষা ছিল এবং ঐ মন্ত্র ও যজ্ঞ যাহা পূর্ব্বে একই ভাষায় অনুষ্ঠিত হোত তাহা ব্যবহারিক জেন্দ বা পৈশাচী ভাষায় প্রচলিত করেন এবং

১২৮ ভারত সংস্কৃতি—মতিলাল দাশ পৃঃ ৫১।

তাহার আনুষ্ঠানিক অনেক নিয়মকানুনও পরিবর্ত্তিত করেন। তখন তার নিয়ম কানুনের নাম হল জরাথুষ্ট্র মানথ্র। আমরা জানি ব্যাবিলোনীয় ধারায় যজ্ঞ কি ভাবে অনুষ্ঠিত হোত। ব্যাবিলনের ধারাটি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতকে হিরোডোটাস ইহার বর্ণনা দিয়েছেন—তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। জরাথুষ্ট্রের সংস্কার সত্ত্বেও প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম, যাহা বৈদিক, তাহা প্রাচীন মতের লোকে সহজে ত্যাগ করে নাই। জরাথুষ্ট্র ব্যাবিলনের আচরিত যজ্ঞধারা গ্রহণ করেছিলেন—হিরোডোটাস ইহার সাক্ষ্য দিয়েছেন। উহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় শতকে টেরিবিন্থ ও মানি পুনরায় রহস্যবাদী প্রাচীন প্রথা প্রচলন করেন।

## অক্ষু উপত্যকায় প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি ও প্রাকৃত

অক্ষুনদীর উপত্যকায়, বাহ্লীক সমরখন্দ, অগ্নি, শুগ্ধ, কুচী ভরুক প্রভৃতি দেশের ভারতীয় সংস্কৃতির জাতিগুলি বৈদিক সংস্কৃতি ত্যাগ করে নাই। তাহারা নব্যপারসিক ধর্ম্মগ্রহণ করুক না করুক ভাষা ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে নাই। ভাষা ও লিপি এমন জিনিষ যে মানুষ, জীবনান্তেও উহা ত্যাগ করতে চায় না। ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে এই নিয়মটি বেশী প্রবল। এইজন্যই অক্ষু উপত্যকার ভারতীয় উপনিবেশগুলি ব্রাহ্মী লিপি এবং কথ্য সংস্কৃতভাষা ত্যাগ করে নাই। যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ খৃষ্টীয় শতকে এ অঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচারে গিয়েছিলেন, তখন উহার পরিচয় পেয়েছিলেন। এই বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত অঞ্চলে সংস্কৃতের প্রাকৃতরূপ এবং ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী লিপি-পারসিকগণ সরকারী কার্যে, সম্রাট দারাউসের সময় ত্যাগ করেন। ঐ সময় ভারতের অন্তর্গত গান্ধার পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। সেইজন্যই দেখা যায় গান্ধারের লিপি ব্রাহ্মী নয়—উহা খরোষ্ঠি।

সম্রাট অশোক গান্ধারে তার গিরিলিপি খরোষ্ঠি ভাষায় উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন। জরাথুষ্ট্র যজ্ঞবাদ ত্যাগ করেন নাই, কারণ ব্যাবিলনে যজ্ঞবাদ ছিল সুতরাং তাঁর পক্ষে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞবাদের ভাষা সংস্কার ছাড়া অন্য অনুষ্ঠান ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। জরাথুষ্ট্র ধর্ম্মের পতন কালে সম্ভবতঃ প্রাচীন মতের লোক বৈদিক রীতিনীতি পুনরায় প্রচলন করেছিলেন, যাহা ভারতীয় পারশীদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

## পারসিক যজ্ঞ ও বলিদান

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "ভারতীয় আর্য্যদের বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় পারসিকদেরও যজ্ঞপ্রথা ছিল। যজ্ঞের সামগ্রীর মধ্যে প্রধান অগ্নি। যজ্ঞ শব্দটি জেন্দ ভাষায় যশ্নরূপ নিয়েছে এবং পুরোহিত হয়েছে পরধাত। সংস্কৃত পুরোহিত ও জেন্দ পরধাত সমার্থক।

বৈদিক যাগের ৪টি প্রধান বিভাগ হ'ল—হোম, ইষ্টি, সোম, পশুযাগ। তার মধ্যে সোমযাগের সঙ্গে জরাথুষ্ট্র ধর্ম্মের হওমযাগের অদ্ভুত সাদৃশ্য। বৈদিক যুগে আহুতি "পুরোডাশের, অনুরূপ পার্শিদের দারুণ নামে পবিত্ররুটি ও পশুমাংশ অর্পণ। এই দুই ধর্ম্মের যজ্ঞে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে বৈদিক যজ্ঞে সমস্ত আহুতি আগুনে কিন্তু পার্শী ধর্ম্মে কোন কিছু আগুনে দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ আগুন চিরশুদ্ধ।

সোমযাগে তিনটি সবন হয়—প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। সবনের অর্থ সোমরস ছেঁচে বার করা। পার্শীদের সবন দিনে মাত্র দুবার হয়—প্রাতে ও মধ্যাহ্নে।

"যজ্ঞ আরম্ভ করার আগে ঋত্বিকেরা এবং যজমানেরা বলেন—"যে

যজামহে”—আমরা যজ্ঞ করছি। পার্শীদের প্রার্থনার মধ্যে “বার বার ঐ একই অর্থে, ‘যজামাইদা’ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।” ১২৯

মতিলাল দাশ লিখেছেন,

“The Arians and the Irainians were both followers of sacrifices. Martin Haug says,” The Izeshne ceremony as performed by the Parsis now a days contain all the elements of which the different parts of the Jyotistoma cycle of sacrifices, the proto-type of all the soma sacrifices is composed. The Agnistoma is the praise of Agni, the fire god, which is the opening sacrifices of this cycle and indispenseble for every Agnihotra to gain the object wished for, viz heaven, bears particularly a resembleance of Izishne”.

উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা গেল যে ইহাদের সোমযাগের বিধিগুলি বৈদিক সোমযাগের মতই ছিল। তবে অন্যান্য যজ্ঞগুলি যাহা অন্যান্য বেদে বিহিত আছে, তাহার প্রচলনের কোন প্রমাণ নাই। মোটের উপর পারসিকগণ অথর্ববেদের যজ্ঞপ্রথা গ্রহণ করেছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়,কিন্তু ঐ যজ্ঞতে বৈদিক যজ্ঞের মত খুঁটিনাটি নিয়মের কঠোরতা এবং মান্ত্রিক ভাষাশুদ্ধতা ছিল না। ভারতীয় পারসিকগণের ইতিহাস—আরসাসিদবংশের সংস্কৃতি—প্রভাবান্বিত। ঐ সময় জরাথুষ্ট্রধর্ম্মের সংস্কারগুলিকে পরিবর্তন করা হয়েছিল—মিত্রধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব, টেরিবিস্থের ধর্ম্মমত এবং মাণির ধর্ম্ম প্রচারের ফলে।

১২৯ অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য পৃঃ ১৯৫-৯৬।

## ব্রাহ্মণ্য ও পারসিক যজ্ঞ সংস্কৃতির প্রভেদ

'নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখেছেন', বোটের মতে বেদ ও অবস্তার উদ্ভব একই উৎস থেকে। দুটি নদীর মূল এক, আর তা হচ্ছে ইন্দোইরাণীয় ধর্ম্ম ও সাহিত্য। এককালে আর্য্যগণ এক ও অবিছিন্ন শাখা ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মীয় গোলযোগের ফলে ভারতীয় আর্য্যও ইরাণীয় আর্য্যদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল।" ১৩০

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এবং পূর্ব্বের অধ্যায়ে ভারতীয় ও পারসিকদের মধ্যে মূলগত মিলের কথা অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই মিল থেকে অমিল কেন হল—তার সন্তোষজনক উত্তর কেহ দিতে পারেন নাই। আমি ইহার উত্তর পূর্ব্বঅধ্যায়ে দিয়েছি। এই অমিলের কারণ আরও আছে। সেটা শুধু ধর্ম্ম নয়, সেটা ভাষাও বটে। নারায়ণ বাবু লিখেছেন, "বৈদিক সাহিত্যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়েই সমগ্র সাহিত্য গড়ে উঠেছে, অবস্তাতে এদের অনুরূপ শব্দ ও গ্রন্থ আছে—জরাথুষ্ট্র মান্থ্র এবং মানথ্র স্পেনটা।" উক্ত উদ্ধৃতিতে এই সাহায্য দ্বারা এদের মিল হয়েছে বলা হয়েছে, কিন্তু এটাই অমিল। জরাথুষ্ট প্রাচীন তান্ত্রিক ধর্ম্মটির পরিবর্ত্তন করেছিলেন। এ কথা ভাল করেই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। জরাথুষ্ট্রের মানথ্র কি বৈদিক মন্ত্র হতে পারে? মন্ত্র, শব্দ, ছন্দ ও সুরে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয়—এইজন্যই যত বেদাঙ্গ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক নিয়ে বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সুতরাং মূলতঃ এক অর্থবাচক হলেও জরাথুষ্ট্রমানথ্র আধুনিক ব্রাহ্মদের মত বৈদিকমন্ত্রের অনুবাদ করে তার সাধনা করার মত। এইজন্যই দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু ভার্গবের মধ্যে বিরোধ হয়। মন্ত্রসাহিত্যকে বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রাণের মতই অক্ষত রাখবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেন। জরাথুষ্ট্রমানথ্র রচিত

১৩০ অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৮৮)

হয়েছে; এটা নকল করা সহজ কিন্তু এখানে বৈদিক ব্যাকরণের মত ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও তাঁর জন্য বেদাঙ্গ কোথায়, কোথায়ই বা তার ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের বিশাল সাহিত্য? বৈদিক সভ্যতার জুড়ি তখনকার দিনে হয় নাই। সে সময় কেন, এখনও তার জুড়ি হয়েছে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যগণ তো বৈদিক সাহিত্যর গভীর জলে এখনও সাঁতার কাটছেন আর বলছেন, 'কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম।" পারসিকগণ বৈদিকমন্ত্রের শব্দের অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার করেন নাই। তাঁরা ব্রাহ্মীলিপি ত্যাগ করেছেন, বর্ণাশ্রম সন্ন্যাস ও কর্ম্মবাদ, ব্রহ্মবাদ, প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৈদিক যজ্ঞবাদের মর্ম্মই তো এই সমস্ত।

## মহান্ অসুর ও অহুর মজদা

"৪১টি জাতির সকলেই ইন্দ্রকে পূজা করতো না; উহা ঋগ্বেদের মন্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে। যখন জাতিগুলি মিলিত হয়েছে এবং একটি জাতি প্রভাবশালী হয়েছে, ইহার দেবতা অন্য দেবতার চেয়ে বড় হয়ে পড়েছে।" (এজ অব মন্ত্রজ, আয়েঙ্গার পৃঃ ১২৬) "ইন্দ্র সংস্কৃতির প্রবর্ত্তকগণ মূলতঃ উত্তর পশ্চিম ভারতীয় এবং এখান থেকে বাহ্লীক, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল।" ১৩১

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি যে প্রাচীন পারসিকদের এবং বৈদিকদের দেবতা এক। তারা মান্ত্রিক উচ্চারণের পার্থক্যের জন্য বৈদিক শাস্ত্র থেকে পৃথক ধারা—ভার্গব উপস্থা অর্থাৎ অথর্ববেদের ভার্গব শাখা গ্রহণ করল। দেবতা থাকল, যজ্ঞ থাকল, কেবল মন্ত্র পৃথক হল। এখন ইহাতে প্রশ্ন উঠে—মান্ত্রিক পার্থক্য হল, তার দেবতার পার্থক্য কি হল না?

পারসিকগণের "অইরিয়ান বয়েজো" চিত্রল উপত্যকার সংযোগ-স্থলে, কাশ্মীরে অবস্থিত ছিল, বলে মনে হয়। ইহাই

১৩১ ভাণ্ডারকার ভলিউম পার্ট ২ পৃঃ ১০৫।

পারসিকদের আদি নিবাস। ইহার উত্তরে পামীর উপত্যকার সর্বোচ্চ মালভূমি হিন্দু কুশের দক্ষিণ অঞ্চলই, সম্ভবতঃ ইন্দ্রের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে ইন্দ্রের সঙ্গে পারসিক জাতির অর্থাৎ অসুর জাতির, সদ্ভাব ছিল না। অসুর, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জাতিও এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল। রাক্ষস, নাগ পিশাচ ও গন্ধর্ব্ব, গান্ধার ও কাবুল রাজ্যেরই অধিবাসী ছিল। ইহারা সম্ভবতঃ কাশ্মীরের উত্তর মানস-সরোবরের নিকট বাস করত। এখানে রাক্ষসতাল, নৈনীতাল, ভীমতাল প্রভৃতি অনেক তাল বা সরোবর আছে। কাশ্মীরের ডাল হ্রদটি একটি তাল অর্থাৎ হ্রদ। প্রাকৃত-পাতাল, রসাতল এবং তালশব্দ বৃহৎ হ্রদ বা তালাও অর্থেই ব্যবহৃত। ইহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। এই শব্দটি সিন্ধু সংস্কৃতির নিদর্শন। ইহা নাগ বা রাক্ষসীভাষার অবশেষ হওয়া অসম্ভব নয়। এদের জাতিগত সত্তা আর্যদের সঙ্গে এক, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে শুধু রক্তগত সম্বন্ধ নয়, ভাষা ও আচারগত সম্বন্ধ ও ছিল। ইহাদের রক্তগত সম্বন্ধের ইতিহাস সিন্ধুযুগ থেকে, কারণ ইহারা হরপ্পার অঞ্চলেরই আদি অধিবাসী। ইহারা বাহিরের থেকে উপনিবিষ্ট নয়। সিন্ধুযুগে এই দেশই এদের দেশ ছিল। আদিমাতা আদিপিতা পূজা, বৃক্ষ, সর্প, পশু প্রভৃতি টোটেমের প্রতি শ্রদ্ধাই ছিল এদের সংস্কৃতি। এরা যে বলিদান ও যজ্ঞ করত—তাহা ছিল গ্রামসংস্কৃতির উত্তরাধিকার। গ্রামসংস্কৃতির স্তরের বৈশিষ্ট্য থেকে সিন্ধু সংস্কৃতির যজ্ঞ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। পরবর্ত্তী সুমের সংস্কৃতির যজ্ঞ পদ্ধতি থেকেও উহার ধারণা কষ্ট কল্পনা নয়। বৈদিক আর্য্যরাও এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। তারাও পর্ব্বতপ্রধান গান্ধার, আফগানিস্থান, চিত্রল ও উত্তর ব্রহ্মর্ষিদেশে বাস করত, এখান থেকে এরা পশ্চিম এশিয়া এবং ভারতের সমতলে উপনিবিষ্ট হন। কালক্রমে সমতল ক্ষেত্রে ব্রহ্মর্ষিদেশের লোকেরা ইন্দ্রকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। এই বংশগত বীর বা পূর্ব্বপুরুষ পূজা সিন্ধুসংস্কৃতিরই পরিচয়।

সুমেরে প্রায় প্রতিটি রাজবংশে অনুরূপ প্রথাই প্রবর্ত্তিত হয়।

সমতলে কৃষিপ্রধান অঞ্চলের প্রয়োজনই ছিল। মেঘ ও বৃষ্টি—কৃষি-প্রধান গ্রাম্য-সংস্কৃতির মূলই ইহা। ইন্দ্র ছিলেন সুরদের রাজা—মেঘ ও বৃষ্টির দেবতা। বৈদিক আর্য্য ও পারসী আর্য্য—উভয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল; উভয়েই ইন্দ্রকে শ্রদ্ধা এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কালক্রমে বৈদিক আর্য্যরা ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাকে দেবতার পর্য্যায়ে নিয়ে গেল। পারসী আর্য্যরা তা করে নাই। তারা ইন্দ্র পূজা করে নাই। তারা জলবায়ুর বিপর্যয়ে এবং পার্বত্য শুষ্ক দেশের অবস্থার জন্য উর্ব্বরতা ও বৃষ্টির দেবতার প্রতি অনুরক্ত হয় নাই। তাদের জীবনযাত্রা হয়েছিল যাযাবরের মত। পারসীদের ইন্দ্র-সংস্কৃতি ছিল না। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন;

"Memories of an ancestral connection with these territories had not faded even in the epic period. But Persia, Bactria, Uttarkuru have not yielded the earliest historical traces of Indra worshipping Aryans." ১৩২

এই ব্যাপার নিয়ে দুই দলে বিরোধ হল। পার্শী সংস্কৃতিও অনিন্দ্র সংস্কৃতি। বিরোধের সময় দুই দলে যে দেবতা সাধারণতঃ অর্থাৎ এক ছিল তা ঠিকই থাকল। অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয় ইত্যাদি। যারা সুরের ভক্ত তারা বৈদিক আর্য্য হলেন আর যারা প্রাচীন মতে থাকলেন তারা হলেন অহুর ভক্ত। ইহা ছাড়া পারসীদের একটি নূতন দেবতা এলেন—নাম অহুর মজদা। ইনি কে? অহুর মজদা নামটি নূতন বটে—কিন্তু ইনি নূতম দেবতা নন—ইনি মহৎ অহুর বা মহান অসুর। মজদা অর্থাৎ মস্‌ত। "মস্ত" অর্থে মাগধী প্রকৃত "বড়"। যখন মূলতঃ পারসী ও বৈদিক আর্য্য এক ছিল, তখন এই মিলিত জাতটির সংস্কৃতির নাম ছিল অসুর। ইহাদের ছিল সিন্ধু—

১৩২ **Studies in Indian antiquities p. 15**

সংস্কৃতি। সিন্ধু সংস্কৃতিতে আদি পিতা রুদ্র পশুপতিরূপে পূজিত হতেন। তাঁর নাম ছিল মহান অসুর। পার্সীদের অহুর মজদা হলেন ঋগ্বেদের রুদ্র। এই শিব বর্ত্তমানের শিব নয়। ইনি অগ্নিরই রূপান্তর। ("ঋ ২।৭।১) রুদ্রই অগ্নি, তাহার উপাসকগণ ঋগ্বেদে ( ঋ ৩।৫৩।১২ ) ভারত বলিয়া উক্ত। "বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।" ভারতগণের আবাস এই ভারতবর্ষ। তাঁরা রুদ্রের প্রভাবান্বিত, তাঁহার দ্বারা ভৃত। এই জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময়, জীবজগতের ভরণ-পোষণ-কারী রুদ্র (ঋ ১।২৭।১০ ) মন্ত্রে স্তুত। (ঋ ২।২।৭) ভরত নামা অগ্নিই রুদ্র পাই।"

"ভার্গব গৃৎসমদ্দৃষ্ট দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সুক্তে অগ্নিকে বলা হইয়াছে হে অগ্নি তুমিই হোতা, পোতা, ঋত্বিক, নেষ্টৃ, প্রশাস্তা, ব্রহ্মা, গৃহপতি। অগ্নিই ইন্দ্র, বৃষভ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ব্রহ্মণপতি। রাজা বরুণ ধৃতব্রতমিত্র, অর্য্যমা, তুমিই অংশত্বষ্টা নরা, তুমি রুদ্র মহান অসুর, মরুৎ, পুষা, দ্রবিনোদা, সবিতা, ভগ, বিশপতি, তুমি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, তুমিই ঋতুরাজ, তুমি অদিতি, ইলা, ভারতী, স্বরস্বতী ইত্যাদি।"

## মহাদেবের নাম মহান অসুর

ঋক ২।১।৬ মন্ত্রে আছে—"রুদ্রো অসুরো মহো"। রুদ্র মহান অসুর। ঋক ৩।৫৫।১ মন্ত্রে রুদ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মহদ্দেবানাং অসুরত্বমেকম্।"

## ঋগ্বেদে রুদ্র

"রুদ্র অদ্বিতীয় শিবতত্ত্বকে বলে। সর্ব্বদেবগণ স্তুত। ( ঋ ১।৭২।৪, ৪।৩।১, ১।৪৩।৫, রুদ্র বিশ্বরূপ, ২।৩।৩৯, ৩।৫৪।১ রুদ্র সর্ব্বদেবগণের প্রাণ বা অন )।"

রুদ্রগণ ৩।৮।৮, ১৩।২০।৫, ৩।৩২।২, মন্ত্রে উল্লিখিত। ; রুদ্রগণের মধ্যে ঋ ১৮৬।৫, ২।৩১।৬, মন্ত্রে অহির্বুধ্ন নাম আছে। ঋ ২।৩৩।৬, ১০।৬৫।১০ মন্ত্রে অজেকপাদ উল্লেখিত। ১৩৩

রুদ্র ছিলেন মহা অসুর ( ৫, ৪২, ১১ )। অসুররা তার ভক্ত ছিলেন।" ১৩৪

"রুদ্র ও অগ্নি যে এক তাহা বেদসংহিতায় বলা হয়েছে। ( ঋ ৩।৪১ ), ঋ ৩।৭৪ ) ভাঃ শঃ ১ম ভাগ, উপেন্দ্রনাথ দাস পৃ ৯২ ) উক্ত উদ্ধৃতিতে পাওয়া গেল যে অগ্নিই রুদ্র এবং রুদ্রই মহান অসুর। রুদ্রই শিব বা মহাদেব। বৈদিক আর্য্যদের রুদ্র বা শিব হচ্ছেন মহান অসুর। শিব বা মহাদেব গ্রাম্য সংস্কৃতির আদিপিতা এবং সিন্ধুসভ্যতায় যোগাসনস্থ পশুপতি। এই শিব বা মহান অসুর ছিলেন পার্শীদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা। বৈদিকদের প্রধান অসুর—ইনি পরবর্ত্তীকালে শিবের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছেন। আদিকালের অগ্নি অর্চ্চনা এই ভাবে রুদ্রযাগে পরিণত হয়েছিল।

পার্শীরা পৃথক হওয়ার পর এই মহান অসুর বা অহুর মজদাকে কেন্দ্র করে জরাথুষ্ট্রধর্ম্ম মহান অসুরকেই অবলম্বন করলেন। তাহারা পৃথক হওয়ার আগে যখন বৈদিক আর্য্য ও পারসীআর্য্য বরুণ দেবতাকে অন্যতম দেবতারূপে অর্চনা করতঃ তখন বরুণ ছিলেন অসুর দেবতা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন বরুণই অহুর মজদা। যেখানে মহান অসুররূপে রুদ্র বা শিবকে স্পষ্টতঃ পাওয়া যাচ্ছে তখন বরুণকে এই ভাবে ধারণা করায় লাভ নাই।

## কাপ্পাডোশিয়ায় বৈদিক শিব

হিট্টাইট দেবতার মূর্ত্তির হাতে ত্রিশূল এবং বজ্র এবং তিনি বৃষারূঢ়, তাঁর পাশে সিংহের উপর দণ্ডায়মান মাতৃমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। ইহা

১৩৩ প্রবন্ধাবলী মহাদেবানন্দ গিরি পৃঃ ১৭১, ১৫১, ২৭৫ ;

১৩৪ প্রাঃ ভাঃ সঃ ও সাঃ ; অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পৃঃ ১৫।

স্পষ্টতঃ শিবমূর্ত্তি, কিন্তু এই শিব বজ্রধারী। এই শিব পরবর্ত্তী কালের শিব নহেন। ইনি আদি শিব-ইনিই সিন্ধু সভ্যতার শিব মহান অসুর। বেদে এই শিবের পরিচয় পাওয়া যায়।

Rai Chaudhuy লিখেছেন: There can be no doubt that the diety on the "Mahenjodaro Seal has important points of resemblance with Siva as detected in Chap. 284 of Santi Parba and Chapter 14 and 17 of Anushashan Parba of the মহাভারত। The epic describes the God as ত্রিশীর্ষ or ত্রিবক্ত্র and as চতুর্মুখ. He is digvasa and Urdhalinga and যোগাধ্যক্ষ; above all he is পশুপতি। Among animals, brought into special relation with, are the tiger, the elephant, the deer ( He is clad in tiger's skin and has elephant's skin in upper garment. He is not only elephant killer, but also a buffalo destroyer. Among his epithets is গণ্ডালন। গণ্ডিনি is an appellation of his Consort Durga. Striking are the points of likeness between Siva and মহেঞ্জোদাড়ো diety viz বৃষভবাহন। In this and some other important aspects, the epic Siva finds a closer parallel in a God worshipped by the Hittites in Western Asia in 2nd Millenium B. C. He stands on a bull and has 3 pronged thunderbolt as his destructive weapon. He is also represented as bearing a bowl, the trident

১৩৫ ভাঃ শঃ ১ম ভাগ, উপেন্দ্রনাথ দাস পৃঃ ৯২।

১৩৬ (Studies in Ind Antiquities, p. 200, 201, 203)

and mace, battle axe and dagger. His spouse is the great mothergoddess, venerated as মা in Cappadocia.

The resemblance between তেষব ( হিট্টাহিট দেবতা ) as described in Vedic epic and Pouranic texts is too striking to be ignored. Like তেষব, রুদ্র শিব wields the thunderbolt (Rig. 2,33,8 ; মহাভারত ১৩,১৪,২৮,৩৪৭ ইত্যাদি) and is armed with a bow ( ধন্বী, পিনাকী ), the trident and mace ( danda ), battle axe ( পার্শ্ববিধ ) and পট্টিশ ( as a kind of খড়গ )। Like তেষব, Shiva is অম্বিকা-ভর্ত্তা, Spouse of mothergoddess who is referred to as পার্ব্বতী and উমা, the counterpart of Cappadocian মা। The censort of তেষব stands on a lioness or panther. Certain forms of mothergoddess of the ancient peoples of Western Asia such as Nanaea and Artemis had the bee for their symbol. Representations of these deities with the bee will be found in Ephesus and Susha. Curiously the Indian mother goddess in মার্কণ্ডেয় পুরাণ and দেবী ভাগবত receives the epithet ভ্রামরী।

উক্ত উদ্ধৃতিতে বুঝা গেল যে পশ্চিম এশিয়ায় শিব প্রাচীন বৈদিক রুদ্রের মত বজ্রধারী। সুতরাং প্রাচীন রুদ্র শিব যিনি মহেঞ্জোদাড়োরই দেবতা, এবং যিনি ঋগ্বেদের রুদ্র শিব, তিনিই হিট্টাইটদের দেবতা। এই শিব, যিনি পশ্চিম এশিয়ার তেষব তিনি বরুণ বা ইন্দ্র নহেন। প্রাচীন শিব এই মূর্ত্তিতেই বৈদিক যুগে পূজিত হতেন। পারসিক-গণের মহানঅসুর এই শিবই ছিলেন—এই শিবই মহান অসুর। বরুণের পরিচয়ের সঙ্গে এই প্রাচীন মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এই দেবতা সিন্ধুসংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। ইনি যে ভারতীয় প্রাচীন শিব তার

ইহা পরিচয়। এই শিবের যজ্ঞে অর্থাৎ রুদ্রযাগে বলিদান, সোমপান তো ছিলই, তাছাড়া "অতি রাত্র" যজ্ঞের মত সারারাত্রি হল্লা চলত। গ্রীসে ও এশিয়া মাইনরে এই শিবপূজায় বলিদান, মদ্যপান, শিঙ্গা বাদ্য ও সারারাত্রি হল্লা চলত। ইহাই অরফিউস উৎসবে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বাংলা দেশে চৈত্র পূজা এবং কালবৈশাখী পূজায় মাদকদ্রব্য সেবন, নৃত্যগীত, হৈ হল্লা, রাত্রি জাগরণ, বলিদান ইত্যাদি বিরাট উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এখনও অনেক যায়গায়, হাজরা গাছের তলায় এই সময় বহু বলিদান হয়ে থাকে। ইহাই প্রাচীন সিন্ধু সংস্কৃতির একটা বড় নিদর্শন। ইহার সঙ্গে ঔপনিষদিক ও পৌরাণিক শিবপূজার সাদৃশ্য নাই। এই শিবপূজায় নৃত্যগীত, বাদ্য, বলিদান এবং হৈ হল্লা নাই, ইহা পরবর্ত্তী কালের।

পারসিকগণের সিন্ধু সংস্কৃতির আর একটি প্রমাণ আছে। অগ্নির রূপায়ণ—অহুর-মজদা হওয়াতে পার্শীদের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার ধারাবাহিক সম্বন্ধই প্রমাণিত হয়। পার্শীরা অগ্নিসংস্কৃতি-প্রধান ছিল। অগ্নিকে তারা অতি পবিত্র মনে করত। সেইজন্য অগ্নিতে কোন জিনিষ আহুতি দিত না। তাদের কাছে অহুরমজদা অগ্নিরই রূপায়ণ হবে, তাহাই যুক্তি সঙ্গত।

## সমতল ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং শিবপার্ব্বতী

আর্য্যনিবাস সম্বন্ধে পারসিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে উহা "অইরিয়ান বয়েজো"—গান্ধার চিত্রল অঞ্চল। এখান থেকেই সিন্ধু-সভ্যতার সুসভ্য জাতি জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য সমতল অঞ্চলে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে—উর্ব্বর জমির দেশে। উহা উত্তরে লেক-ভ্যানের তীরবর্ত্তী অঞ্চল এবং এসিয়া মাইনর থেকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টিত ইউফ্রেটীস তীরবর্ত্তী উর্ব্বর অঞ্চলে, আর ভারতের গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী তীরেও। সিন্ধুসভ্যতার সঞ্চরণশীল পার্বত্য সংস্কৃতি সমতলের উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রের স্থায়ী সভ্যতায় পরিণত হল।

সিন্ধু অঞ্চলের লোক এখনও বারমাস স্বগৃহে বসবাস করতে পারে না। অধিকাংশ লোকই যাযাবর। যারা সমতলে উপনিবিষ্ট হল, তারা মাটীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেল। তারাই হ'ল উচ্চ সভ্যতার অধিকারী। সিন্ধু অঞ্চল থেকে এল এক দিকে ভারতীয় আর্য্য আর অন্যদিকে মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার আর্য্যজাতি। মধ্য এসিয়ায় মেদ, শক, বাহ্লিক, সুগ্ধ, বামিয়ান প্রভৃতি সিন্ধুর জাতি দ্বিতীয় বার বিস্তার লাভ করল। এই দ্বিতীয় বারের সিন্ধু সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখার ভাষা প্রাচীন আর্য্যভাষার ব্যবহৃত অপভ্রংশ।

যাঁরা পশ্চিম এশিয়ায় উপনিবিষ্ট হলেন, তাঁরা হলেন হুর ( অর্থাৎ সুর—এদের বিষয় যথাস্থানে পাওয়া যাবে ), মিটান্নী, হিকশোস, হিট্টাইট পারসিক ও গ্রীক ইত্যাদি। এদের সংস্কৃতিও আর্য্য সংস্কৃতি। এদের নিয়ে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ টানাটানি করেছেন এবং নর্ডিকতত্ত্ব কল্পনা করেছেন। এই গ্রন্থের যথাস্থানে জাতিতত্ত্ব আলোচনার সময় আর একবার এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ব্যর্থ চেষ্টার যুক্তিগুলি বিচার করে দেখা হবে।

সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে মাটীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তাদের সংস্কৃতিও হয় উর্ব্বতার ও সৌভাগ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। আর্য্যগণ পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলে আসলেও, তাদের দেবতা শিব এবং উমা নিয়েই এলেন। যদিও সৌভাগ্য ও উর্ব্বরা শক্তির দেবতাই সমতলের প্রধান সংস্কৃতি; তাহলেও তারা যে পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকেই এসেছেন তার প্রমাণই রুদ্র মহাদেব শিব এবং পার্ব্বতী উমা। সমতলের সুমের অঞ্চলে, এবং ভারতের নদীতীরবর্তী অঞ্চলে এই অস্ত্রধারী দেবতার প্রভাব সিন্ধু উপনিবেশেরই পরিচয়। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকগণ সমতলের দেবতা শিব ও উমাকে অষ্ট্রিক সংস্কৃতি প্রভৃতি—প্রাচীনতর সংস্কৃতির নিদর্শন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—উহা ভ্রমাত্মক, কারণ উর্ব্বর সমতলের দেবতা হলেন সৌভাগ্য ও প্রাচুর্য্যের দেবতা। এই দেবতার প্রকৃত মূল

সিন্ধু সভ্যতায় এবং ইহার ক্রমবিকাশ আর্য্য রুদ্রদেবতা ও অগ্নি দেবতা অহুর মজদায়।

## সিন্ধুর যজ্ঞ সংস্কৃতি

বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিই সর্ব্বপ্রথম আহবনীয় দেবতা। অগ্নিই দেব—পুরোহিত, তিনিই হোতা, নামক ঋত্বিক, তিনিই দেবগণের মুখ, বৈদিক যজ্ঞের ব্যাপারটি সমস্তই অগ্নিকে ঘিরে। এই জন্যই বৈদিক সংস্কৃতিকে অগ্নিসংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের আদিমসংস্কৃতিটিই অগ্নিকে শ্রদ্ধা করার ধারণা থেকে আরম্ভ। আদিম মানুষের উৎসব এই আগুনকে ঘিরে বাদ্যগীত সহ পশুর মাংস উৎসর্গ করে আহার। সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে কুঞ্জ গোবিন্দ বাবু বলেছেন যে উহার অগ্ন্যাধান নাই। সভ্যতার স্তর বিভাগেও প্রথমস্তরে দেবতার কাছে বলিদান ও অগ্নিতে আহুতি দেখা যায়। এই সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে উহার পরবর্ত্তী স্তর। এই স্তরে উহা বন্ধ হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় নাই। সিন্ধুর সীলমোহরে বলিদানের চিত্র দেখা যায়। তার পরবর্ত্তী তৃতীয় স্তরে যজ্ঞ সংস্কৃতি বিরাটভাবে প্রচলিত। সুতরাং সিন্ধুস্তরে যজ্ঞের অস্তিত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা দেখেছি যে সুমেরে যজ্ঞ সংস্কৃতি ছিল, ইহুদীদেরও ছিল, গ্রীকদের ছিল, পারসীদেরও ছিল। সিন্ধুর হরপ্পাতেও বলিদানের উদ্যোগের চিত্র দেখা যায়। বলিদান থাকলেই উহার সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক এবং নিশ্চয়ই ছিল বলে ধরা যায়। স্বামী শংকরানন্দ দেখিয়েছেন মহেঞ্জোদাড়োর অট্টালিকার মধ্যে সারি সারি ঘর এবং তার সংলগ্ন বারান্দার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানেই সিন্ধুর যজ্ঞশালা। ঐ রকম পরিকল্পনায় যজ্ঞশালার ব্যবস্থা ছিল গ্রীকদের। পারসীকদের অগ্নিমন্দিরে ব্যবস্থা খুব সম্ভবত গ্রীকদের মতই ছিল। পারসীকদের গৃহপতি অগ্নি নিয়তই প্রজ্জ্বালিত রাখা হোত। সুতরাং পারসীক

ও গ্রীক অগ্নিসংস্কৃতির মূল যে সিন্ধু সংস্কৃতি এবং সেখানেও যে ঐ সিন্ধুর ব্যবস্থাই ছিল ইহা অনুমান করা যেতে পারে।

## বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, "বৈদিক অগ্নি তিন প্রকার। গার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নিই শ্রৌতাগ্নি, "বাড়ীর মধ্যে কোনস্থানে অগ্নিশালা স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগার মধ্যে যথাবিধি শ্রৌতাগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্মের নাম অগ্ন্যাধান। "অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার তিনদিকে তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান, বেদীর পূর্ব্বদিকে আহবনীয়ের স্থান এবং দক্ষিণদিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান। মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নির্ম্মিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজ, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার; দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার; তিনেরই ক্ষেত্রফল সমান। গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ; আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি; ইহার স্থান পূর্ব্বদিকে; দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের।"

"প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে অগ্নিশালা থাকিত। সেখানে অগ্নি-রক্ষিত হইতেন ও পূজা পাইতেন। গ্রীকরা যখন দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপনে যাইতেন, তখন আপন গৃহস্থিত অগ্নিও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই রূপে উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির সম্বন্ধ পাকা হইত।"

"অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। অগ্নিহোত্র যাগ নিত্য কর্ম্ম। আহবনীয় অগ্নিতে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত।" ১৩৭

১৩৭ যজ্ঞকথা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, পৃ ২২,২৬,২৮

শ্রদ্ধেয় মতিলাল দাশ লিখেছেন,

"অগ্নিও ইন্দ্র বেদের দুই মুখ্য দেবতা। অত্যুক্তি না করিয়া বলিতে পারি, আর্য্যদের জীবন যজ্ঞময় ছিল। এই যজ্ঞের প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি। অগ্নি দেবতাদের মুখ, অগ্নিমুখেই দেবতারা যজ্ঞ গ্রহণ করেন। অগ্নির মাহাত্ম্য ও প্রভাব বুঝিবার পক্ষে একটি উপায় ঋগ্বেদে অগ্নি স্তবের সংখ্যা। ঋগ্বেদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ সুক্তে অগ্নি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র এক চতুর্থাংশে উদ্‌গীত হইয়াছেন।"

"ভারতীয় ঋষিরা অরণি সংঘর্ষে অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই প্রথা প্রাচীন হিন্দু, ব্যাবিলোনীয় ও জরথুষ্ট্রীরগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই অগ্নি রক্ষার জন্যই অগ্নিহোত্র। মিশরীয়দের প্রত্যেক মন্দিরে অগ্নিরক্ষা করা হইত। পারসিক, গ্রীক ও লাটিন জাতির মধ্যেও অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রোমের ভেষ্টার মন্দিরেও অগ্নিকে চির-অনির্ব্বাণ রাখার ব্যবস্থা ছিল।"

অগ্নি প্রথমে মানুষ ছিলেন। পরে দেবতা হইয়াছেন। ঋগ্বেদে ৩।৫।১০ সুক্তে পাই, "মাতরিশ্বা আকাশ হইতে অগ্নি চয়ণ করিয়া ভৃগু বংশকে দেন।"

"অগ্নিপূজাই আর্য্যজাতির আর্য্যত্বের কারণ। আর্য্যজাতির সমস্ত শাখায় অগ্নিসদৃশ নাম আছে। লাটিনদিগের Ignis, শ্লাভদিগের অগ্নি একই। জেন্দভাষায় অগ্নি বিশপতি, বৈদিক শ্লোকে অগ্নির বিশপতি বিশেষণ খুবই পরিচিত। লিথুনীয় ভাষায় বিশপতিন্ এবং মোলভাবিয়া এবং ভালচিয়ং ভাষায় Hœpodar শব্দে ইহার উল্লেখ আছে। পারসিক জেন্দবেস্তায় অগ্নি শউর্ব্ব নামে অভিহিত। বেদের প্রথমে সর্ব্ব অগ্নিদেবের সংজ্ঞা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (৬, ১, ৩, ১০-১১) অগ্নিকে সর্ব্ব নামে অভিহিত করা হয়েছে।"

"আর এক শ্রেণীর শ্রৌতযজ্ঞের নাম ইষ্টিযাগ। প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ইষ্টিযাগ করিতে হয়। ইষ্টিযাগে ৪ জন ঋত্বিক দরকার,

পশুযাগে আরও দুজন দরকার হয়। পশুযাগে পশুকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়। পশুর পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। এই যাগের দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি। পশুর সকল অঙ্গ মেধ্য নহে। হৃদয়, জিহ্বা প্রভৃতি ১১টি অঙ্গ প্রধানতঃ দেবতার আহুতিযোগ্য। পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য—উহা আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়।"

"সোম যাগে অগ্নিপূজা বৃহৎ ব্যাপার। অনেক সরঞ্জাম দরকার, বহু ঋত্বিক আবশ্যক। সকলের পক্ষে ইহা সাধ্য ছিল না। প্রাচীন ইরাণীদের মধ্যে সোম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। কোন যজ্ঞ একদিন, কোন যজ্ঞ একাধিক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হত। কোন কোন যজ্ঞ সংবৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হত। ইষ্টিযাগে ৪ জন, পশুযাগে ৬ জন, কিন্তু সোমযাগে ১৬ জন ঋত্বিক লাগে। ইহাদের মধ্যে অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অগ্নীৎ থাকবেই।"

"আবেস্তা শাস্ত্রেও সোমের এই সব মাহাত্ম্য, এই সমুদয় অ্যাখ্যায়িকা, কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়। গ্রীকদের মধ্যে ও উপাখ্যান আছে, দেবরাজ জিউসের জন্য ঈগলপক্ষী মধু আনিয়াছিল। জার্ম্মানদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল দেবরাজ odhin ঈগলরূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই মধুই সোম। এই সোম কেবল বেদ পন্থীর প্রধান দেবতা নহেন; সমস্ত আর্য্যজাতিরই অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা। সোম যজ্ঞ আর্য্যজাতিরই প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান।" ১৩৮

শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীর যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যে যজ্ঞ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং পুরোডাশ, পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম হবির্যজ্ঞ, আর যে যজ্ঞ সোমরস আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম সোমযজ্ঞ বা সোমযাগ। সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষ

১৩৮ ভারতবাণী, মতিলাল দাশ, পৃ ৩৫,৩৬,৩৭, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭৪ ও ৯৬

লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতে হয় নাই। এই যাগটি ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটি বিশিষ্ট প্রমাণ যে সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের দুরবর্তী পর্ব্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পুর্ব্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস সহকারে এ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্যগণ সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, শেষে এমন কি সোমলতার পরিবর্ত্তে অন্য এক প্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পর্বতীয় স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদ মন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান—প্রাচীন কালে পারস্য দেশে সোমযাগের প্রাতুর্ভাব হয়। সে যাহা হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় নয়। অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ (পূ ১, ২৮, উ ৩, ২, ইঃ) হইতে জানিতে পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে সোমযাগ প্রচলন করেন। সোমযজ্ঞ প্রধানতঃ সাত প্রকার। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকৃথ, ষোড়শী, বাজপেয় অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম। এগুলি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ভিন্ন রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞও সোমযাগের মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু এই দুইটি ব্রাহ্মণেরা করিতেন না।

আপস্তম্ব বলেন, "সোমযাগে ২৭ জন ঋত্বিকের আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে চারিজন প্রধানঋত্বিক, যথা হোতা, উদগাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। কর্ম্মবিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের কার্য পর্য্যবেক্ষণ করা ও জপ করা ব্রহ্মার কার্য্য।"

## বলিদান

বলিদান যজ্ঞকার্য্যের জন্য জাতদন্ত, অবিকৃতাঙ্গ, নীরোগ ও পুষ্ট একটি মাত্র ছাগই গ্রহণ করা বিধেয়। এই প্রকারের পশু যজ্ঞস্থলে নীত হইলে ঋত্বিকেরা উচ্চৈস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। তৎপরে তাহারা আধুনিক বলিদান প্রথায় ছাগকে হনন না করিয়া সংগঠন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন—অর্থাৎ মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে ছাগকে বধ করিতেন। ঐ কার্য্য যে কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর উহার হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, সম্মুখের বামপদ, পার্শ্বদ্বয়, দক্ষিণ শ্রোণী, পায়ু নাল, পা, বসা প্রভৃতি কয়েকটি অঙ্গ কাটিয়াও শামিত্র নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক করিয়া মন্ত্র গান করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই হোমের কার্য্যের নাম 'অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগক্রমে দ্বাদশ শত গাভী, অভাবে শত গাভী এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেষ. ছাগ, অন্ন, যব ও মাসকলাই।

অতিরাত্র অতি প্রাচীন যাগ। ঋগ্বেদে ( ৭, ১০৩, ৭ ) এই যাগ অতিরাত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এটি যে একটি সারারাত্র ব্যাপী মহাকোলাহল পূর্ণ সোমপান মহোৎসব, তাহা এমন কি পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্য হইতেও বেশ বোঝা যায়। ১৩৯

এই উদ্ধৃতিগুলিতে বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির পরিচয় কিছু সংক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া গেল। ইহা দ্বারা পূর্ব্বে যে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের তুলনা করা সহজ হবে।

১৩৯ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য পৃঃ ২১, ২২, ২৭, ৩৪, ২৬ ৩৬, ৩৯, ৪৯ .)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমলতার উৎপত্তি স্থান গান্ধার ও আফগানিস্তান বলে উল্লেখ করেও বলেছেন যে সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। এই মতটি যুক্তিপূর্ণ নয়। গান্ধার, আফগানিস্তান, চিত্রল, হিন্দুকুশ, পামীর প্রভৃতি স্থান আর্য্যসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদেশিকগণ এগুলিকে ভারতীয়দের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। ইহা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। এখানকার ভাষাও বৈদিক ভাষা। বৈদিক প্রমাণ ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ারসন সিদ্ধান্ত করেছেন যে এখানে বেদ রচিত হয়েছিল। সুতরাং সোমযাগ সম্পূর্ণই ভারতীয় সংস্কৃতি। পারসিকগণ পৃথক হওয়ার আগে এখানে বাস করত। এইজন্য পারসিক ও বৈদিক সংস্কৃতি পরস্পর ভ্রাতৃব্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি সিন্ধু সভ্যতায় পরিপুষ্ট হলেও বৈদিক আর্য্যদের মত ভারতের বাহিরের আর্য্য পারসিকগণ মান্ত্রিক উচ্চারণের শুদ্ধতা এবং আনুসঙ্গিক অসংখ্য বিধি ব্যবস্থা স্বীকার করেন নাই। তাঁরা সরল সিন্ধু সভ্যতার যজ্ঞ পথ স্বীকার করেছিলেন। এই পথটিই বৈদিক যাজ্ঞিক জাতি ছাড়া আর সকলের গৃহীত পথ হয়েছিল। সিন্ধু সংস্কৃতি থাকার দরুণ ব্যবহৃত ভাষার শাব্দিক একত্ব সব জাতিগুলির মধ্যে কম বেশী পাওয়া যাবে। শুধু পাওয়া যাবে না যা, তা হচ্ছে মান্ত্রিক ব্যাকরণ ও বর্ণের শুদ্ধতা। এই পার্থক্যের জন্য ব্রাহ্মীলিপি এবং ব্যাকরণের পার্থক্য হয়েছে। ভারত ও বর্হিভারত অবশ্য এই সঙ্গে সভ্যতা এবং অধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্রেও বিরাট পার্থক্য এনেছে। ব্রাহ্মী-লিপিও ব্যাকরণের চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ষড়-বেদাঙ্গ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, দর্শন ও পুরাণ প্রভৃতির বিকাশ হয়েছে ভারতে। আর ভাষার শুদ্ধতা যেখানে লক্ষ্যবস্তু নয়, সেখানে ভাষার উন্নতি তথা আধ্যাত্মিক সাহিত্যের উন্নতি বর্হির্ভারতে যা হয়েছে, তাহা নেহাৎ ব্যবসায় ও রাজকার্য্যের প্রয়োজনের তাগিদে। পরবর্ত্তী কালে ভারতের বাহিরে যতটুকু আধ্যাত্মিকতার আলোকবর্ত্তিকা ভারত থেকে

বের হয়েছে, সেই আলোকের অনুসরণ করেছে তারা। যজ্ঞ সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার সাধারণ সম্পত্তি কিন্তু তার বিবর্তন হয়েছে, ভাবতে, আর বহির্ভারতে যাজ্ঞিক ভাষা অর্থাৎ মন্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। ঐ যজ্ঞবাদ এবং মন্ত্রবাদ ত্যাগ করে তার একাধিপত্যবাদ অংশ কিরূপে গৃহীত হয়েছিল—এই বিষয় পারসিকদের আলোচনায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি।

## বেদ মন্ত্রের ভাষা বিশুদ্ধি

বৈদিক মন্ত্রের মূল খোঁজ করতে গেলে সভ্যতার মূল খোঁজ করতে হবে। পূর্ব্বে যে স্তর বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথম স্তরেই সভ্যতা আরম্ভ—উহা গ্রাম্যস্তর।

মন্ত্র কালক্রমে প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ সিন্ধুস্তরে পড়ল। সিন্ধুস্তরের মন্ত্রের উপর ভাষার কোন বিধি নিষেধ বা নিয়ম সৃষ্ট হয় নাই। সেখানে ভাষা শুধু ভাব ও লিপি হচ্ছে চিত্র প্রধান। ভাবের রাজ্যে ভাষার বাঁধন থাকে না। 'তার পরে এল তৃতীয় স্তরে যজ্ঞকর্ম্ম। এই স্তরে বিশিষ্ট ভাষায় আবদ্ধ হ'ল মন্ত্র। মন্ত্রের অনুষ্ঠানে অনেক রীতিনীতির সৃষ্টি হল। এই স্তরের প্রথম ভাগে সুমেরীয়, হিট্টাইট, ফিনিসিয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে অগ্নিতে উপচার উৎসর্গ ও বলিদান আছে—তবে উহা প্রধান নয়। সেখানে বলিদান এবং মানস পূজায় ভাবই প্রধান। এই স্তরের দ্বিতীয় ভাগে পারসিক, বাহ্লিক ও গ্রীক প্রভৃতি জাতির মন্ত্রসংস্কৃতি ও যজ্ঞ। এই জাতিগুলির যজ্ঞের সংস্কৃতির উৎস বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি কিন্তু তাদের মন্ত্র ভাবের আকর্ষণ ত্যাগ করে নাই; ভাষার নিয়মের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না বলেই এদের যজ্ঞসংস্কৃতি বৈদিক যজ্ঞের মত উন্নত হতে পারে নাই। এই জন্য বৈদিক মন্ত্র ও ভাষার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। বৈদিক ভাষা মান্ত্রিক ভাষায় পরিণত হল, অন্যভাষাগুলি সাধারণ 'কাজ কর্ম্মের মধ্যে' বিবর্ত্তনের উৎস সন্ধান করল। এই মন্ত্রের বিশুদ্ধির

জন্য বৈদিক ভাষায় বেদের বিরাট ধর্মসাহিত্যের, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হল। অন্যান্য সংস্কৃতিতে ভাষা রাজকার্য্য এবং বাণিজ্যকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকল।

## যাজ্ঞিক ধর্মের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে পরিণতি

বৈদিক যজ্ঞ প্রথমে সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মধ্যে নীচ জাতির লোক এবং স্ত্রীলোক ছিল।

ভারতে তৃতীয় স্তরের শেষদিকে যজ্ঞকর্ম খুব জটিল হয়ে পড়ল। যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যজ্ঞাধিকারী বলে স্বীকৃত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অব্রাহ্মণদের যজ্ঞ ধর্ম্মে অনধিকার সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ তিন বর্ণ কেন, ব্রাহ্মণের পুত্রেরও যজ্ঞাধিকার অস্বীকৃত হল। তার পর, এই তৃতীয় স্তরের শেষের দিকে শুধু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই যজ্ঞকর্মে অধিকারী হল। বহু বৎসর কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা গুরুগৃহে বাস করে অধ্যায়নান্তে অধিকারীশিষ্য যজ্ঞকর্মে অধিকারী হন। সুতরাং যজ্ঞকার্য্য যখন উচ্চক্রমে আরোহণ করল তখন উহার অধিকারী সমাজ, হয়ে পড়ল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মন্ত্রপাঠের অধিকার সীমাবদ্ধ হওয়ায় মান্ত্রিক ভাষা হয়ে পড়ল দুর্বোধ্য। ইহার ভাষা ও লিপি দুচারজন ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হল। এই সময়ই সুরাসুর বিভেদ হল। ভৃগু পৃথক মন্ত্রশাস্ত্র করে অসুর পক্ষ গ্রহণ করলেন।

## শব্দব্রহ্ম, ব্রাহ্মীভাষা ও লিপি

ফিনিসিয় বা পাশ্চাত্ত্য এ্যালফ্যাবেটের মত ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা খেয়ালী লিপি নয়। ইহার মূলে মন্ত্র ও শব্দ। মন্ত্র এবং শব্দ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফল বর্ণ। এই বিষয়ে বরেন্দ্রবাবুর গবেষণা থেকে তুলে দিচ্ছি।

"If that were the case, their fellow brethren in the West would have selected pictures of known objects as their symbols, but instead, the pictures of the letters are so unlike any object in nature and so complex in their make as one sees in অ, ব, হ etc. that one can not make where the peculiar form came from.

Communication of ideas may be made by drawing a picture of the object or the idea or by drawing mutually agreed symbols for a whole sentence or for each of the component words, syllables or letters: and in one or other of these forms, ideas have been expressed is writing elsewhere. But the Indian system is not the symbolsing of the sound but is the depicting of them.

How can a sound of অ or ল be pictured? Sound is energy and so it can not be seen or shown. But the sound can however be pictured by an indirect way by drawing the visible part of words, associated with the utterance. In uttering a Varna, these are movements of the tongue and lips, imposing changes in facial muscles. The utterance of a বর্ণ needs some action. Here the movements of the tongue and of lips and the result of action, brings some changes in the face. The utterance, action and result are organic parts of one and the same operation here and all have causal relations with one another.

Here the result of the operation is the Varna uttered. The utterance again is the outcome of the shape of the mouth, which is caused by the movement of the tongue and facial muscles. What is the motive power that actuates the facial muscles to move in such and such a way? According to the Indian Rishis, it is Will that sounds প্রাণবায়ু from the naval centre upward with the requisite massages.

Thus the origin of Varna lies on the Will Force first and it is then transformed into some motor action, which is then materialised into some tangible shape, the mouth assumes and finally it is transformed into sound energy. As soon as it passes out of the mouth cavity of these, the shape of the face and sound are two tangible forms which may stand for the বর্ণ, one for the eye another for the ear. The shape of the Varna is its script and all the different shapes that the mouth assumes in uttering different Varnas are their scripts." ১৪০

উক্ত উদ্ধৃতিতে প্রমাণ হল যে ভারতীয় বর্ণের মূলে ইচ্ছা বা বোধ শক্তি। ঐ বোধ শক্তি মনের খেয়াল সম্ভূত নয়। উহা সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুর মাধ্যমে প্রকাশিত। সুক্ষ্ম প্রাণবায়ুর মূলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপিণী বোধ শক্তি (অর্থাৎ ভাগবতী শক্তি)। ইনি মন বুদ্ধি অহঙ্কারের অতীত জীবের অন্তরে অনুস্যুত হয়ে আছেন। জীবাত্মা বা জীবশক্তি যখন মন বুদ্ধি অহঙ্কারের অতীত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে

১৪০ Ancient Language & Scripts of India
Harendra Kumar Bhattacharjee p. 98 & 99

মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভূত হন। ইহাই শব্দ ব্রহ্মতত্ত্ব। ভারতীয় বৈদিক ভাষা এই শব্দব্রহ্মলাভের মাধ্যম রূপেই পরিকল্পিত। পাশ্চাত্য এলফাবেটের ভাষা ও সংস্কৃতি ইহার সন্ধান কি করে পাবে? শব্দকে রূপদান করেছেন মহেশ। তিনি দেবাদিদেবরূপে পূজ্য। মূল মন্ত্র রূপায়িত হয়েছে বর্ণে, ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে। এই রূপায়ণের যে আন্তরচিত্র বাহিরে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সিন্ধুঅক্ষর বা ফিনিসিয় অক্ষরের দু দশটি চিত্র লিপির মূল থাকা খুবই সম্ভব। ইহাকে ঋণ বলা সঙ্গত নয়। তবে ক্রমবিকাশের ধারায় সিন্ধুকে অগ্রজ বললে অন্যায় হবে না।

## মন্ত্র

মন্ত্রশক্তিই শব্দশক্তি। বৈদিক সংস্কৃতি মন্ত্রসংস্কৃতির অন্য নাম। অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মত বেদের মন্ত্র বা ঋক্‌ধ্বনিকে প্রার্থনা বা স্তোত্র বলা চলে না। ব্রহ্মকে ঋক্ বা শব্দশক্তি বা দেবতাশক্তি বলা হয়।

অনির্বাণ বলেছেন, "প্রাচীন সংজ্ঞা যাই হোক, যে বাক, বা শব্দ-রাশি বেদ বা জ্ঞানের বাহন, আমরা তাকেই এখন বেদ বলে জানি। এই প্রাচীনতম অংশগুলি মন্ত্রময়। মন্ত্রগুলি ছন্দে গাঁথা। অধিকাংশই পদ্যছন্দ; কিন্তু এছাড়াও গদ্যছন্দঃ আছে। মন্ত্রই বেদের মূল কাঠামো। সংহিতা হিসাবে বেদের মন্ত্রগুলি চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাই আমরা বলি চতুর্বেদ। ১৪১

"বেদের আদিমন্ত্রই ওঁকার। মন্ত্রের শব্দ সাধারণ শব্দ নয়। মন্ত্রই দেবতা। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন "তস্মাত্বা এতস্মাদাত্মনে আকাশ সম্ভূতঃ (তৈত্তি, ২।১) সেই সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপং ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। শব্দ আকাশের গুণ—সুতরাং শব্দ তত্ত্ব

১৪১ বেদ মীমাংসা, প্রথমভাগ, অনির্বাণ পৃঃ ৪০, ৪১ ও ৪৩।

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মের শব্দস্তরের অভিব্যক্তি ওঁম্। ব্রহ্ম নিজ চির পূর্ণস্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই শব্দস্তরে ওঁঙ্কার রূপে অভিব্যক্ত হন। ইহা বিশ্বসঙ্গীত। এই সঙ্গীতের তালে তালে সৃষ্টিস্থিতিলয় সাধিত হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু, অপ— সমুদয়—এই সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। এই সঙ্গীতেরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা অশনি নির্ঘোষে, ঝটিকার স্বনস্বনে, সমুদ্র কল্লোলে, পবনের উচ্ছ্বাসে, জীব হৃদয়ের স্পন্দনে শুনিতে পাই। যোগিগণ সমাধিতে, ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে এই প্রণবধ্বনি বা অনাহত ধ্বনি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ইহাই ভয়েস অব সাইলেন্স। নিঃশব্দের শব্দ। দেহের মধ্যে এই ধ্বনির গুঞ্জন চলিতেছে। এই ধ্বনির গুঞ্জন বা স্পন্দনই প্রাণতত্ত্ব।" ১৪১

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈদিক মন্ত্র সিন্ধু সংস্কৃতির অন্যান্য জাতি থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক এবং উহা শব্দ ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মন্ত্র তিন রকম। (১) আবৃত্তিমূলক (২) গানমূলক, (৩) জপ মূলক। বেদে এই তিন রকম মন্ত্রই আছে। আবৃত্তি ও গান অপরে শুনলে ক্ষতি নাই বটে কিন্তু ইহার শিক্ষার অধিকারী-বিচার আছে। এই শিক্ষার্থী নির্বাচন করা বিশেষ বিবেচনামূলক। বৈদিক শিক্ষা সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। জপের মন্ত্র শুধু সাধারণের পক্ষে শিক্ষা নিষিদ্ধই ছিল না; ইহা উচ্চৈশ্বরে আবৃত্তিও নিষিদ্ধ। যজ্ঞে জপের কাজটির ভার ব্রহ্মার উপর ন্যস্ত ছিল।

## বৈদিক মন্ত্রবাদ

বৈদিক মন্ত্রবাদ ও সিন্ধুর মন্ত্রবাদ যাহা, সিন্ধুর অন্যান্য সন্ততিস্থানীয় সংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক তফাৎ। বৈদিক মন্ত্র— তত্ত্ব, ধ্বনি ও সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য সিন্ধুসংস্কৃতির মন্ত্রতত্ত্ব,

১৪১ গায়ত্রীরহস্য, বামদেব চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫।

স্তব ও প্রার্থনার পর্য্যায়ে অবস্থিত; ইহাদের ভাষা, ধ্বনি, ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণ, স্বর বিজ্ঞান এই ব্যাকরণের অভাবে শুধু ভাব এবং সুরের উপরই নির্ভর করেছে। বৈদিক মন্ত্র, বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং শাব্দিক বিন্যাস অতিক্রম করলেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিফল হ'ত—এমন কি যজমানের সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। এই বিষয়ে বৈদিক সাহিত্যে উপাখ্যান আছে।

## বাকবিশুদ্ধির উপর জোর

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "বৈদিক যুগের ধর্ম্ম লইয়াই প্রাচীনতম সাহিত্য। বৈদিক যুগের ধর্ম্ম বলিলে যজ্ঞমূলক ধর্ম্মই বুঝাইত। বৈদিক যুগের যজ্ঞ তিনটি জিনিষ না করিলে চলিত না। প্রথম আবৃত্তি, তারপর গান, অতঃপর যজ্ঞানুষ্ঠান। কি ভাবে হইবে তাহার পদ্ধতির এই তিনটি বিষয়েই চরম উৎকর্ষ, এই সময় হইয়াছিল। আর্য্যরা স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী ও যথাযথ উচ্চারণের জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। দস্যুদের বাকযন্ত্রের দোষ ছিল বলিয়া আর্য্যরা তাদের অনার্য আর মৃধ্রবাক বলিত। আর্যদের উচ্চারণের সাত রকম রূপ ছিল। একটা গোটা সূত্রেই তৈরী হইয়াছিল বিশ্বামিত্রের আবৃত্তি নৈপুণ্যের বর্ণনা করিবার জন্য। যজ্ঞে উচ্চারণ কাটাছাঁটা পদ্ধতির সুন্দর আভাস আছে। তিন রকম উপায়ে উচ্চারণ করা হইত। ঋক্, সাম ও যজুঃ, বৈদিক গোড়ার পাঠে এই তিন রীতির উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণ যুগে বাকবিশুদ্ধি,—সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। বাহিরের লোকদের ভাষা আর্যরা ব্যবহার করিত না—তাহাদের ভাষা বলা নিষিদ্ধই ছিল। অপূত, অপবিত্র ভাষা বলার জন্য একটি আর্য্যপরিবারকে পৌরহিত্য হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। খুব সংস্কৃত জানেন, এমন লোকের পক্ষেও আর্যজুষ্ট উচ্চারণ করা কঠিন হইত। তাহারাও সহজে ধরিতে পারিতেন না।

## স্বরতত্ত্বের ক্রমবিবর্ত্তন

বেদ সংহিতার মধ্যে স্বরতত্ত্বের ক্রমবিবর্ত্তনের একটা ইতিহাস বেশ ধরা যায়। ঐতরেয় ও শতপথ আরণ্যকে স্বরকে, উষ্ণ ও ব্যঞ্জনে বিভক্ত করিয়াছে—দন্ত্য ন ও মূর্ধণ্য ণ ভেদ করিয়াছে, শ, ষ, স, র এর পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছে। সন্ধির নিয়মাবলীর বিচার করিয়াছে। উপনিষদে মাত্রা ( quantity ), বল ( accent ) শাম ( euphony ) ও সন্তানের ( relation of words ) প্রয়োগ নির্ধারণ করিয়াছে। বৈদিক যুগে আবৃত্তির ধারা অনেক রকম ছিল। ঐতরেয় আরণ্যক আবৃত্তির মাণ্ডুক্যধারার ( ভেকানুকারী ধারার ) কথা বলিয়াছিল। আরণ্যকে ঋগ্বেদ্ আবৃত্তি করার তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে যে তিনটির নাম প্রতৃন্ন, নির্ভুজ, উভয়মন্তরেণ। আর্যদের প্রাচীনতম কালের প্রায় সমুদয় গ্রন্থই ছন্দোগ্রথিত। এদিকে বৈদিক সূত্রসমুহ এতই জটিল ও সূক্ষ্মাকারবিশিষ্ট যে পরিভাষা নামক পৃথক সূত্র ব্যতীত কেহই ইহার সম্যক অর্থগ্রহণে সমর্থ হন না। বিশেষত ইহাদের ব্যাখ্যায় আবৃত্তি ও সূত্রেরও সাহায্য যথেষ্ট আবশ্যক। বেদশাস্ত্রকারদের মধ্যে যে কয়জন স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাদেরকে শব্দশাস্ত্রের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। বোধহয় এইরূপে শিক্ষা ও প্রতিশাখ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা হইতে নিরুক্তের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপে ঋষিরা যখন দেখিলেন বৈদিক গ্রন্থসমূহ ক্রমেই পরিবর্ত্তিত, কোথাও বা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল তখন তাহারা সূত্রফলের রক্ষার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। বৈদিকসূত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের জন্য তাহারা শব্দ বিশ্লেষণ ব্যাপারে নিরত হইলেন। তজ্জন্য তারা কণ্ঠ তালু প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানের উপর যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাহাদের এই সমস্ত চেষ্টায় ফলে বোধহয় বেদাঙ্গ নামক ব্যাকরণের

উৎপত্তি ইহাছিল। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যর ৪র্থ অধ্যায়টি পাঠ করিলে চেষ্টাটি পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শব্দতত্ত্ববিৎ হর্ণেল এই মতের পক্ষপাতী। বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়ের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক ও তদ্ভাষ্যেই পাওয়া যায়। এই বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই বুঝাইত। ঋক, যজুঃ ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যে ভাবে গ্রথিত, তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ ব্যাকরণ বলা যুক্তিহীন নহে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটি পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শস্বর ও উষ্ণবর্ণের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্যাকরণে একবচন ও বহুবচনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন অধ্যাপক বেবের শতপথ ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টীকায় প্রমাণ করিয়াছেন যে যেসময় এই ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছিল সেই সময় ব্যাকরণ এতদুর উন্নত হইয়াছিল যে ভূ, অন প্রভৃতি ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে হয়েছিল। আলোচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অক্ষরপংক্তি চতুরক্ষর, বর্ণকায়, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। গোপথ ব্রাহ্মণে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে। তাণ্ড্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈয়াকরণিক অর্থদ্যোতক বহু পরিভাষার নাম পাওয়া যায়। শিক্ষা,—বৈদিক সূত্রের প্রকৃতি, উচ্চারণ ও যথামথ আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষাদেয়। প্রতিশাখ্যে ব্যাকরণের অনেক বিষয় আলোচনা দেখা যায়। শব্দ সকলের উচ্চারণ উপকরণাদি লঘু গুরুভেদ, অক্ষর ও শব্দের উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, কার্য্যকারিতা, দুই বা ততোধিক শব্দের সন্ধি বিধি, কারক, তদ্ধিত সমাস প্রভৃতি এই শাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। কথিত ভাষা ও সঙ্গীতে কিরূপ উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তাহা দেখার জন্য শব্দের উচ্চারণটির বিধিব্যবস্থা দিবার জন্য প্রতিশাখ্যগুলি রচিত হইয়াছিল। কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য অতি প্রাচীন কালের রচনা। ইহাতে সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দউচ্চারণের নিয়ম, স্বর, ব্যাকরণের

তালিকা, গ্রন্থপাঠের নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।" ১৪৩

উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে বৈদিক ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনার উল্লেখ আছে। সভ্যতা আরম্ভ হওয়ার পর যখন মন্ত্র উচ্চারণে অনেক ভুল, অশুদ্ধির উৎপত্তি হতে লাগল, তখন ধ্বনিতত্ত্বের উপর ঋষিদের লক্ষ্য আসা আরম্ভ হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধারাবাহিক ইতিহাসই বৈদিক ভাষার ইতিহাস। ইহার আরম্ভ যজ্ঞের প্রথম অবস্থা থেকে অর্থাৎ অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতক থেকে। এই সময় ব্রাহ্মীলিপি সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। বৈদিক ভাষা-বিজ্ঞান—বেদ, প্রাতিশাখ্য, ব্রাহ্মণ, সূত্র এবং উপনিষদে ছড়ান রয়েছে। এইভাবে বিকশিত হতে বৈদিক ভাষার অন্ততঃ দশশতক পর্য্যন্ত কাল গত হয়েছে। পূর্ণ ভাবে বিকশিত হওয়ার পর সাধারণ ব্যবহারিক ভাষায় এই বিজ্ঞান, ব্যাকরণরূপে গ্রথিত হয়েছে। এতে অনুমান করা যায় খৃঃ পূঃ নয় দশ শতক থেকে—বৈদিক এবং ভাষার ব্যাকরণ প্রচলিত হয়েছে। ব্রাহ্মীলিপির প্রকাশের কাল নির্ণয়, যাহা ডাঃ বুলার সাহেব অনুমান করেছেন তাহা এই সময়েরই কাছাকাছি।

## উচ্চস্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বিকাশ

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "শত শত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে—ঋগ্বেদের প্রথম স্তোত্র এবং উহার সমাপ্তির সময়ের মধ্যে; আর যখন আমরা ইহা ঋগ্বেদাকারে দেখি, তখন উহা খুব উচ্চস্তরের ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ক্রমবিকাশে উন্নীত হয়েছে। ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষা একটি উচ্চ বিকাশের বিকাশমুখী ভাষা নয়,—ইহার সমগ্র

১৪৩ ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৫১, ৬১।

ব্যাকরণ পদ্ধতি, সুসংস্কৃত প্রত্যয়, কাল, ধাতুরূপ, বাচ্য, বচন একেবারে নিয়মবদ্ধ, এবং কারকের বিভক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে প্রমাণ হয় যে উহা ভাষাতত্ত্বের জীবনেতিহাসের পরিণত এবং অধিকতর অগ্রসর প্রত্যয়ের উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বুনসেন মত প্রকাশ করেছেন যে বৈদিককালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবিতা মানবজাতির বর্ত্তমানকালের বলে পরিচিত করা যায়।" ১৪৪

## যজ্ঞই সকল উচ্চ শিক্ষার উৎস ছিল

সন্তোষকুমার দাস লিখেছেন, "যজ্ঞের বিস্তারিত পদ্ধতি থেকে কতকগুলি বিজ্ঞানের শাখা আবিষ্কৃত হয়েছে। বেদী তৈরী করার বিস্তারিত নিয়মকানুন থেকে জ্যামিতি ও বীজগণিত বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে। যজ্ঞের ও অন্যান্য দ্রব্যের শুভক্ষণ জানিবার ইচ্ছা থেকে জ্যোতিষের জন্ম হয়েছে। যজ্ঞের পশুর দেহাংশ আহুতি দেওয়ার জন্য দেহব্যবচ্ছেদ করার দরকার থেকে দেহতত্ত্বের জন্ম হয়েছে; পবিত্র বৈদিক শাস্ত্র উচ্চারণের বিকৃতি থেকে রক্ষা করার দরকারে ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয়েছে, আর বিশ্বের গভীর প্রশ্নসমূহ এবং তাহার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি—এই রহস্যের মীমাংসার জন্য বৈদিক সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদের বিস্তারিত দার্শনিক মত সমূহ ও ন্যায়শাস্ত্র জন্মগ্রহণ করেছে।" ১৪৫

## মন্ত্র ও ভাষার ব্যাকরণের সৃষ্টিকাল

স্তর বিভাগের প্রথম স্তরে দেবতার অর্চ্চনা, বলিদান আছে বটে কিন্তু মন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। এই অর্চ্চনা সামাজিক উৎসবের সামিল। গৃহে পিতামাতার স্মৃতি পূজাও মান্ত্রিক ছিল না। বিপদ আপদের প্রতিকারের প্রার্থনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় স্তরে মন্ত্র

১৪৪ Hindu Civilisation, Radha Kuniud Mukhsjee p, 84,85.

১৪৫ The Educational system of the Hindus, Santosh Kumar Das, page 12, 16, 17, 24, 26, 33.

স্তব ও প্রার্থনার আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে পরিচালিত হতে লাগল পুরোহিতের বা দলপতির পরিচালনায়। এখনও মন্ত্রের নিষিদ্ধতা বা গোপনীয়তার সৃষ্টি হয় নাই। তৃতীয় স্তরেই প্রকৃত পক্ষে, মন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। তৃতীয় স্তরই বৈদিক স্তর। মন্ত্রের বলেই দেবতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যে শব্দগুলি ব্যবহার এবং যে বিধিবদ্ধ নিয়মে উহা উচ্চারণের দ্বারা ফল পাওয়া যাচ্ছে, তার উপর লোকের শ্রদ্ধা এসেছে। শব্দের উপর শ্রদ্ধা হওয়ার ফলেই শব্দবিজ্ঞানের সৃষ্টি। তৃতীয় স্তরের যজ্ঞে শব্দের শুদ্ধতার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন ভারতীয় যাজ্ঞিক-ঋষিরা। সিন্ধু সভ্যতার অনুবর্ত্তী অন্যান্য যাজ্ঞিকরা এ বিষয়ে শুদ্ধতার প্রয়োজনবোধ করে নাই। জরাথুস্ত্র ভার্গব-উপস্থার মতান্তর এবং বিরোধের উপর ভিত্তি করে নূতন সমাজ গঠন করলেন। তিনি শব্দতত্ত্ব বিজ্ঞানের এবং শব্দ বিশুদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই। সুতরাং মন্ত্রবিশুদ্ধির সৃষ্টিকাল নির্ণয় করতে পারলে বৈদিক বর্ণ তথা ব্যাকরণের উদ্ভবের কাল নির্ণয় করা যেতে পারে।

বৈদিক ভাষা বিকাশের আরম্ভের ঐতিহাসিক মানদণ্ড হচ্ছে হিট্টাইট লিপি। ইহার আবির্ভাব কাল খৃঃ পূর্ব্ব দুই হাজার বছর। সুতরাং খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরের কিছু আগে থেকেই ব্যাকরণের মূল-তত্ত্বের সৃষ্টি ব'লে ধরা যেতে পারে। আর উহার পরিণতি ইন্দ্রব্যাকরণ, অর্থাৎ পাণিনির পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যাপকভাবে-প্রচারিত ব্যাকরণ।

এই ব্যাকরণ, পানিণির ব্যাকরণের উৎপত্তি অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের আগে থেকে অন্ততঃ তিন-চার শত বৎসর আগের রচনা বলে ধরলে খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম-দশম শতক বলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং খৃষ্ট পূর্ব্ব বিংশ শতক থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতকে বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ—এই উভয় ব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। ডাঃ বুলারের সিদ্ধান্ত যে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে ব্রাহ্মীলিপির আবির্ভাব—এই হিসাবে তাঁহার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

আর একটি উপায়ে কাল নির্ণয় করা যায়। স্তর বিভাগের ৪র্থ বিভাগে ভারতে ব্রহ্মবাদের উদ্ভব হয়েছে। ইহা ঔপনিষদিক যুগ। এটা খৃষ্ট পূর্ব্ব সহস্র শতকের পূর্ব্ব নেওয়া যায় না। জরাথুষ্ট্রের উদ্ভব কাল খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্রকের পূর্ব্বে নয়। জরাথুষ্ট্রের সময় ভারতে ব্রহ্মবাদের সর্ব্বানুস্যুত ঈশ্বরতত্ত্বের উন্মেষ হয়েছে, কর্ম্মবাদ, নিবৃত্তি ও কর্ম্মফলবাদে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। সুতরাং দার্শনিক বিচার যে ঐ সময় আরম্ভ হয়েছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। সুতরাং জরাথুষ্টের উদ্ভব কালে অর্থাৎ খৃঃ পূর্ব্ব সহস্র শতকে ব্রহ্মবাদের উৎপত্তির কাল বলে ধরা যায়। প্রণবতত্ত্ব ব্রহ্মবাদের ভিত্তি। সুতরাং এই সময় প্রণবতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে বলা যুক্তিসঙ্গত। প্রণবতত্ত্বই ৪র্থ স্তরের আচরণীয় ধর্ম্ম। এই স্তরের ভাষাতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং সাহিত্য, শাস্ত্রচর্চ্চা বহুমুখে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সময় বৈদিক ভাষাকে ব্যাকরণের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে সংস্কৃত করা হল। এই সময়টি যজ্ঞবাদের শেষ পরিণতির অবস্থা। ইহাই সংস্কৃতব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশের যুগ। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকের পর খৃষ্ট পূর্ব্ব দশম শতক পর্য্যন্ত এই যুগের স্থিতিকাল।

## সঙ্গীত ও প্রাচীন ভারত

### গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সর, কম্বোজ জাতিগুলিই সঙ্গীতের মূল

"সাধারণতঃ গন্ধর্ব ও অপ্সর, শব্দ দুটীর উল্লেখ থেকে আমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ধারণা পাই, কারণ বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগ এবং ক্লাসিকাল ও পৌরাণিক যুগে তো বটেই—গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণের সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থের বিষয়বস্তুতেও আমরা গন্ধর্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এক গন্ধর্বেরা যে ভারতের উত্তর পশ্চিমা-

ঞ্চলের কোন একটি স্থানের অধিবাসী ছিল একথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। শোনা যায় কোনো একটি স্থানের অধিবাসীদের এখনও গন্ধর্ব নামে অভহিত করা হয় ও সেই গন্ধর্ব জাতির স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু কন্যারা সকলেই গন্ধর্ব ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদশী। গন্ধর্ব ও অপ্সরা শব্দটির মতন পঞ্চজন, পাঞ্চজন্য, পঞ্চকৃষ্টি বা দেব, মানুষ, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণের এবং বিশেষ করে অসুর শব্দটি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবাদের প্রচলন আছে। অসুর শব্দ দেবগণের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। যজুর্বেদেও গন্ধর্ব অর্থে দেবতাদের লক্ষ্য করা হয়েছে। তবে ১।১০০।১২ ঋকে "শবসা পাঞ্চজন্য" শব্দগুলির ব্যাখা প্রসঙ্গে আচার্য্য সায়ন বলেছেন, "গন্ধর্ব অপ্সরয়ো দেব অসুরা, রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ।" ১।৮৯।১০ ঋকের "অদিতি পঞ্চজনা" শব্দগুলির ভাষ্যে সায়ন পুনরায় উল্লেখ করেছেন, "পঞ্চজনা নিষাদ পঞ্চমশ্চত্বারো বর্ণা যথা গন্ধর্বা পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি"। নিরুক্তকার যাস্ক এই পঞ্চজনা সম্বন্ধে লিখেছেন, "গান্ধর্বা পিতরো দেব অসুরা রক্ষাংখীত্যেতে চত্বারো বর্ণা নিষাদ পঞ্চম ইত্যৌপমণ্যব ( ৩।৭ )"। শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে পঞ্চজনা অর্থে পাঞ্জাব প্রদেশ ও পঞ্চনদকুলবাসী সমস্ত আর্য্যজাতি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কিন্নর, অপ্সর, গন্ধর্ব প্রভৃতি শব্দগুলি ঋগ্বেদিক যুগে দেবতা ভিন্ন বা দেবতাবিরোধী সঙ্গীত-প্রিয় জাতি হিসাবে কোন একটি শ্রেণীকে না বুঝাইলেও পরবর্ত্তী কালে ঐ শব্দ দ্বারা গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সর প্রভৃতি সঙ্গীতকলা নিপুণ জাতিদের বুঝাত তা বেশ মনে হয়। তবে এ কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগেও সমাজে দেব, মনুষ্য, রাক্ষস বা পিতৃ প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ ছিল এবং সেই সকল শ্রেণী অনুসারে সঙ্গীতের স্বরগুলিও বিভক্ত ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও একথা স্বীকার করেছেন।

মোট কথা ঋক মন্ত্রের উপর স্বর সন্নিবেশ করে গান করায় নাম সাম অর্থাৎ গীতি বা গানই সাম।

কাত্যায়ন—পৌর্ণমাস, দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ

সোম, দ্বাদশাহ, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পিতৃমেধ একাহ, অহীন, সত্র প্রভৃতি যাগে সামগান বা গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের উল্লেখ করেছেন।" ১৪৬

উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে দেখা যায় যে—গন্ধর্ব অসুর, কিন্নর, অপ্সর প্রভৃতি জাতি ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল। এদের ছিল নৃত্য, গীত, বাদ্যের সংস্কৃতি—যা থেকেই পরবর্ত্তী কালের ভারত—তার সঙ্গীতের সমস্ত সুর, তাল এবং রাগ রাগিণী উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ছন্দোবদ্ধ স্বর থেকেই ভাষা এবং সঙ্গীতের বিকাশ। ছান্দিক সুরই উক্ত জাতিগুলির সংস্কৃতি। গন্ধর্ব, সুর, অসুর, প্রভৃতি জাতির উত্তরাধিকারেই বৈদিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা বৈদিক আর্য্যদের পিতৃস্থানীয় ছিল। সঙ্গীতের বেলায় ঐ সিদ্ধান্তটির সাক্ষ্য প্রমাণ দৃঢ়তর হল। সুর, অসুর, গন্ধর্ব কিন্নরাদি অজ্ঞাত অতীতের ভারতবাসী ছিলেন। আর্য না যলে তারা কে? তাহারা অষ্ট্রিক বা নিগ্রয়েড হতে পারে না কারণ উহাদের বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গে সগোত্র বলে কোথায় ও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের আর্যতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির ফলে সরল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবই যত গণ্ডগোলের কারণ। সিন্ধু সভ্যতার স্থানটিই ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক সেই স্থানেই এই জাতিগুলির উদ্ভবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে সিন্ধু সংস্কৃতির সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে অনেক উল্লেখ করেছি এবং বর্ত্তমানেও দেখা যাবে যে বৈদিক সঙ্গীতের বেলায়ও এরাই। এই সমস্ত অঞ্চলে এখনও এদের বংশধরেরা বর্তমান আছে। তারা এখন মুসলমান, তবু তাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যায় নাই। ১৪৭। সুতরাং এদেরকে সিন্ধু সংস্কৃতির জাতি বলে স্বীকারে

১৪৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ৩১, ৩২, ৩৬

১৪৭ Sarwan Gazetteer p. 68 & মরুতীর্থে হিংলাজ, অবধূত and Lasbela Gazetteer

বাধা কি? বাধা—বৈদিক আর্য্য দ্বারা ভারত আক্রমণতত্ত্ব। এই আক্রমণ তত্ত্ব যে ভুল তাহা ইতিপূর্ব্বে সন্দেহের অতীতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।

"মহেঞ্জোদাড়ো খননে পাওয়া গিয়েছে সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, একটি নৃত্য শীলা নারীর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি এবং নৃত্যপর নর্ত্তকের ভগ্ন মূর্ত্তি। বাঁশীর সাতটি ছিদ্র, বীণার গড়ন, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্য এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য ভঙ্গী দেখলে অনুমান করা কঠিন হবে না যে তথাকাথিত প্রাগৈতিকহাসিক সিন্ধুসভ্যতার চরম বিকাশ যে তাদের হয়েছিল, আরও কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছর লেগেছিল সে অবস্থায় উপনীত হতে। ক্রমবিকাশের ধারার সন্ধান আমরা একেবারে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে পাই, তার নিদর্শন স্বরূপ আছে, আচিক, গাথিক, সামিক থেকে সম্পূর্ণ শ্রেণীর গান। গান অর্থে এখানে বৈদিক সামগানকে বুঝতে হবে। বৈদিক সামগানে সাতস্বরের প্রচলন ছিল।"

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উক্ত গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি সিন্ধু সভ্যতা ভারতেরই প্রাচীন সভ্যতা বলে প্রমাণ করে একটি অতিরিক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন যে সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পরবর্ত্তী। আমরা ইতিপূর্ব্বে নানা প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা দেখিয়েছি যে বৈদিক আর্য্য সভ্যতার বয়স ২৫০০ বছরের বেশী হয় না।

স্বামীজি মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গীটি একটু অন্য রকমের। তিনি বলেছেন, "ক্রমবিকাশের স্তর যারা মানেন, তাদের কাছে পরিণতির দৃশ্য সুপরিচিত। সুতরাং অনুন্নত ও উন্নত, অপরিপুষ্ট ও পুষ্ট এই ক্রমধারা অনুযায়ী ঐতিহাসিক বৈদিক যুগের চেয়ে উন্নত রূপেরই পরিচয় পাই, আমরা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পা প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্য বৈদিক নগর গুলিতে।"

## সঙ্গীত আগে তার পরে ভাষা

স্বামীজি বৈদিক ক্রমধারা থেকে সিন্ধু সভ্যতার ধারাকে অধিকতর উন্নত বলেছেন, (অর্থাৎ পরবর্ত্তী) কিন্তু উহার উন্নতির ধারাটি কি—তাহা বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি বৈদিক যুগে সপ্ত স্বর, নৃত্যভঙ্গী ও বাঁশী ও বীণার বিষয় বিস্তারিতভাবে তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন; উহাতে বৈদিক সভ্যতাকে তুলনামূলক ভাবে সিন্ধু সভ্যতার চেয়ে কিছু নিকৃষ্টতার নির্দ্দেশ দেন নাই, সুতরাং বলা যায় যে ঐ বিষয়ে তার অনুমান ছাড়া আর কিছু নাই। স্বামী শংকরানন্দেরও গবেষণায় এই বিষয় আনুমানিক যুক্তি ছাড়া আর কিছু সার পাওয়া যায় না। আমরা ভাষার আলোচনায় দেখেছি যে সিন্ধুর ভাষারই ক্রমবিকাশ—বৈদিক ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপি। ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণেও দেখা গিয়েছে যে সিন্ধুসভ্যতায় তাদের ধর্ম্ম ছিল আদিমাতা ও আদিপিতা স্তরের এবং তখন যাজ্ঞিক সংস্কৃতিটি ছিল অপরিণত। আমাদের স্তরবিভাগে, সিন্ধুসভ্যতা দ্বিতীয় এবং বৈদিক সভ্যতা তৃতীয় স্তরের। তারপর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পর্য্যায়ের আলোচনায়ও দেখা গেল যে বৈদিক আর্য্যেরা সিন্ধুসভ্যতারই বিকাশপ্রাপ্ত প্রধান শাখা।

সিন্ধুসভ্যতাই যে বৈদিক সভ্যতার জননী—ইহা বিশেষভাবে একটি পৃথক শিরোনামা সূত্রে আলোচনা করেছি—সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীজি সঙ্গীতের উচ্চবিকাশের বিষয় বলেছেন বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে উহা সিন্ধু-সভ্যতার চেয়ে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন।

ছন্দ এবং সুর জীবের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। স্বামীজি নিজেই লিখেছেন, "ভারতীয় সভ্যতার আদিমযুগে সঙ্গীত ছিল মানুষের মনের অন্তরতম দেশে লুকানো। প্রকৃতির প্রজা পশুপক্ষীদের কলকণ্ঠে ছিল গানের রূপ অভিব্যক্ত। স্বর থাকতো সেই কথায়, বিচিত্র স্বরের

সমাবেশ না থাকলেও সাধারণ একটি মাত্র স্বরে ও সরল ছন্দে গানের নৈবেদ্য সাজাতো সঙ্গীতের সুপ্রাচীনকালের লোকেরা।" ১৪৮

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভাষার জন্মেরও আগে হয়েছে ছন্দ ও সুরের সৃষ্টি। বৈদিক ভাষার নামও ছান্দস। ছন্দ থেকেই বেদের জন্ম। জেন্দাবেস্তার ও ( ছান্দ-উপস্থা ) জন্ম ছন্দ থেকে। ছন্দোবদ্ধতা হবার আগেই হয়েছে স্বরের সৃষ্টি। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাগুলির রূপ কবিতার ছন্দে গাথা। উহার নামও গাথা। গদ্য পরের সৃষ্টি। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি, বৈদিক গাথা, বৈদিক মন্ত্রের চেয়ে আরও প্রাচীন। গাথাগুলি প্রাগ্বৈদিক এবং সিন্ধু-যুগের। এই হিসাবে বৈদিক সভ্যতার পত্তন হবার আগে মানবজাতির হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছে। ঘরবাড়ী করে মাটীতে বাসা বাড়ী করার সময়েই মানুষ সভ্যতার মুখ দেখেছে। তার আগে ছিল মানুষের যাযাবর জীবন। যাযাবর জীবনেও মানুষ ছন্দ ও গানের স্তরে ও নৃত্যে ও তালে আনন্দের উচ্ছ্বাস জানাত। আদিম অসভ্য জীবনেও সুর ও ছন্দ ছিল।

ভারতীয় জাতির সভ্যতার প্রথম যুগে, অগ্নির মাধ্যমে দেবতার প্রতি বলিদান এবং নৃত্যগীত ছিল। ইহা এখনও আদিম জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমান। এই বলিদান থেকেই গ্রাম্য সভ্যতায় পাথরে নৈবেদ্য উৎসর্গ এবং স্তবস্তোত্র প্রচলিত হয়। উহাই গ্রাম্য সভ্যতার ধর্ম্মচর্চ্চা। এই স্তর হ'ল—প্রস্তর যুগের এবং তাম্র যুগের প্রথম দিকের। এই স্তরে, ভারতীয়দের তথা মানবজাতির পক্ষে হাজার হাজার বছর কেটেছে। এই সময়ে বাঁশী নৃত্য এবং বীণা, ঢাক ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এই গুলির ব্যবহার ভারতীয় আদিম সমাজে এখনও আছে। তারপরে দ্বিতীয় স্তরে নাগরিক সভ্যতার সময়ে যে ঐ সঙ্গীত বিশেষভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ১২, ১৬ ও ১৯

বীণা সুমেরে পাওয়া গেয়েছে ইহা স্বামীজির উদ্ধৃতিতেই আছে। এই যুগে যখন মেয়েদের মুখে মাখার জন্য রংএর প্রচলন হয়েছে, নানারকম অলংকারের প্রচলন হয়েছে তখন তাদের নৃত্যের ভঙ্গীটি দেখে আশ্চর্য্য হওয়ার কারণ দেখিনা। সিন্ধুতীর থেকেই সুমেরের বেহরীন দ্বীপে রংএর রপ্তানি হয়েছিল— ইহা ডাঃ মোড়ে দেখিয়েছেন।

এই যুগেরই লোক—গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সর, রাক্ষস প্রভৃতি জাতি। এদের নৃত্যগীতে পারদর্শিতা জম্মানর বহু পরে বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন হয়েছে। যখন যজ্ঞ সংস্কৃতির প্রচলন হয়েছে তখন এই সমস্ত জাতি বৃহত্তর জাতির অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। তখন সুর ও অসুর গন্ধর্ব, কিন্নর একজাতিভুক্ত হয়ে যজ্ঞীয় সভ্যতা ও ভাষা গড়ে তুলেছে। ক্রমশঃ এই প্রাচীন জাতিগুলির পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দেবতার স্থান অধিকার করে, অতিমানবতার স্তরে পূজিত হতে আরম্ভ করেছেন। ভারতীয় চিন্তাধারার ইহাই গতানুগতিক প্রথা। সুর, অসুর, রাক্ষস যক্ষ, নাগ প্রভৃতি জাতি এই ভাবেই দেবতার স্থান অধিকার করেছেন। এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

## স্বামীজির "বৈদিক কালের" মত

বৈদিক যুগ সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়েছে উহাও ঠিক নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে বৈদিক মন্ত্রগুলি হচ্ছে সঙ্কলন। উহার রচনাকাল বহুপূর্ব্বের এবং ঐ রচনাকালের মধ্যে সকলগুলি মন্ত্রই এক কালের নয়। বিভিন্ন যুগে উহার রচনা হয়েছে। উহার মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই গ্রাম্যসভ্যতার স্তরে রচিত হয়েছে, কারণ ঐ সময় মন্ত্রের আরম্ভ হয়েছে। ঐই স্তর বৈদিক প্রথম স্তর থেকে দু'চার হাজার বছর আগে হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং বেদের দুচারটি মন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করে বেদের বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব কাজ। এই হিসাবে সঙ্গীতের বিকশিত অবস্থাকে বেদের পরে বলা চলে,

কিন্তু শুধু একটি বিষয় নিয়ে এই গবেষণা করলে বেদের অন্যান্য সংস্কৃতি এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্বকে মিল করা যাবে না। সেখানে গোঁজামিল দিয়ে চালালে যা অবস্থা হয়—এখন তাই অবস্থা হয়েছে।

স্বামীজি ডাঃ উইনটারনিজের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনিও এই কথাই বলেছেন।

"ডাঃ উইনটারনিজ অধ্যাপক ব্লুমফিল্ডের মত উদ্ধৃত করে আবার বলেছেন, শ্রদ্ধেয় ব্লুমফিল্ড প্রমাণ করেছেন যে ঋগ্বেদের ৪০০০০ পদের মধ্যে ৫০০০ পদের পুনরুক্তি দেখা যায়, সুতরাং সংকলনের আগেও ঋগ্বেদের মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল-এ কথা ধরে নেওয়া যায় এবং সেদিক থেকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির বয়স আরও প্রাচীন ( A history of Indian Literature Vol. I p31. Vide also অধ্যাপক অবিনাশ-চন্দ্র দাস, Rigvedic India (p. 92,) chap. V & XXVI)" ১৪৯

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বামীজির মত অনুসারেই বলা যায় বেদের কতকগুলি মন্ত্রের পরে সিন্ধুসভ্যতার নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তবে মোটামুটি ভাবে সিন্ধু সভ্যতাই বৈদিক সভ্যতার জন্মদাতা।

## প্রাচীনতম ভারতীয় সভ্যতার সঞ্চরণ

### সঙ্গীত সংস্কৃতি

"প্রবোধচন্দ্র বাগচি লিখেছেন, "সমুদ্র পথে ভারতীয় সভ্যতার ধারা ইন্দোচীন, কম্বুজ, চম্পা, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। স্থলপথেও ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ থেকে সুরু করে মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন জাতির ভেতর ভারতীয় সংস্কৃতির বীজ রোপিত হয়েছিল।" জিনগুপ্ত ৫২২ খৃঃ গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর ( পেশোয়ার ) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা বজ্রসার ছিলেন

১৪৯ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ৭৬।

গান্ধারের প্রধান মন্ত্রী। কপিশা ছিল এসময় গান্ধার অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী, তার কারণ ভারত থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা হয়ে বাহ্লিক ও অন্যান্য দেশে পৌছায়।" কপিশার অপর নাম কাফির-স্থান।"

"সেকালে ভারত থেকে মধ্য এসিয়া যাবার সব চাইতে প্রশস্ত পথ ছিল, ভারতেব উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পুরুষপুর থেকে কুভা নদীর ( বর্তমান কাবুল ) তীর বেয়ে। এ পথ পড়ত আফগানিস্থানে এবং তখন এদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। গান্ধার, নগরহার, লনপাক, উড্ডিয়ান প্রভৃতি রাজ্যগুলির মধ্যে কপিশা ছিল শীর্ষস্থানীয়। কপিশা ছিল তখন ভারতের গণ্ডীর ভেতর। সে সব দেশের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাও ছিল ভারতীয়, তার প্রমাণ সে দেশের মাটি খুঁড়েই পাওয়া গিয়েছে। কপিশা থেকে তিনটী গিরিপথের যে কোনটী দিয়ে বাহ্লীকে যাওয়া যেত। কাবুল হতে ঘোরবান্ধ নদীর ধার বেয়ে বামিয়েন পৌছান যায়। কপিশার মত বামিয়েন ছিল নানাদেশীয় বণিকদের কেন্দ্রস্থান, কারণ হিন্দুকুশের উত্তরে যে সব রাজ্য ছিল, বিশেষতঃ সুগ্ধ, পারশ্য, সমরখন্দ, বাহ্লীক—সে সব দেশের বণিকেরা ভারতের পথে হয় বামিয়েন না হয় কপিশাতে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বাস করত।"

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে আরব সৈন্য নব-সংঘারাম আক্রমণ করে। সেই বিহারের প্রধান পুরোহিতেরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাদের প্রভাবে কালিফ ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ও দর্শনশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন। লোক প্রেরণ করে সিন্ধুদেশ হতে ঐ সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ করান। এই সব গ্রন্থ শীঘ্রই আরব ভাষায় অনূদিত হয় এবং সে দেশের পণ্ডিতদিগের নূতন আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। খোটানে যে সব জাতি বাস করত, তারা ছিল একটি মিশ্র জাতি। তাদের মধ্যে প্রাচ্য ইরাণীয়, শক, শূলিক, ( সুগ্ধীয় ), চীনা, ভারতীয়, সকল জাতির স্থান ছিল।

সেখানে যে ভারতীয়দের খুব প্রাচীন উপনিবেশ ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় বাগছি আরও উল্লেখ করেছেন, "প্রাচীন কুচির জাতি ভারত থেকে যে শুধু ধর্ম্ম, লিপি, ভাষা ও সাহিত্য নিয়েছিল তা নয়। মধ্য এসিয়ার নানা জাতির মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাদের মধ্যে নানা প্রকারের যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের প্রচলন ছিল।"

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু যুগে ভারতের সঙ্গে সুমেরের বাণিজ্য সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্বামীজি, উহা এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে দেখা যাবে যে এই সময় সিন্ধুসভ্যতাও কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

"খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩৮ শতকে সম্রাট হানউটি হুনদের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য রাজদূত চানকিয়েনকে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে পাঠান। চানকিয়েন আফগানিস্থানের পার্ব্বত্যপথে একদল বণিককে ব্যবসায়ের জন্য চীনে আসতে দেখেন এবং জানতে পারেন তারা সেনটু অর্থাৎ সিন্ধুদেশ থেকে আসছেন। পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, গান্ধার, সিন্ধু উপত্যকা, বোলানপাশ, তিব্বত, খোটান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। ডাঃ বুকে বলেছেন: "** but only trading intercourse either by caravan routes (which are of great antiquity or by a seabourne trafic from a post calied Eridu at the head of Persian Gulf which was a centre of commerce some 4 or 5 thousands years ago (Comparative Religion (1945 p. 135)."

তাছাড়া তিনি একটি সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন ও যেটি চীন, ইরাণ, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতির মধ্যেও অখণ্ডভাবে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই সভ্যতার বয়স হবে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছর। তিনি আরও লিখেছেন, "A consi-

siderable neolithic culture datable about 2000 or 1500 B. C. has been found in the N. E. and N. W ; and in the N. W, has been found pottery resembling early specimens unearthed in Babylonia and dating from 3500 B. C. This culture is regarded as the Eastern expansion of a great Pre-historic cultureprovince extending from Central Asia to Eran, Syria and Egypt, long before 4000 B. C." ( সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৬২ ) ১৫০

## সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক আর্য্যদের সঙ্গীতচর্চা

ভাষা যেমন ধ্বনি বা নাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি ভাবে সুর এবং সঙ্গীতেরও মূল—ধ্বনি বা নাদ। ধ্বনি বা নাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। ভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম নাদ বা কারণ শক্তি থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ বা ধ্বনি ছন্দোবদ্ধ হয়েই সৃষ্টির উদ্বোধন হয়। ঐ ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি কণ্ঠে স্বররূপে বিকশিত হয়। স্বরই ক্রমবিকাশে বর্ণরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে মানবের লিপিবদ্ধ ভাষারূপে প্রকাশিত হয় এবং সুরবদ্ধ হয়ে সঙ্গীতরূপে বিকশিত হয়। দুয়েরই মূলই সূক্ষ্ম নাদ বা উদ্গীথ বা প্রণব।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, "ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে ওঁঙ্কারকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ওম্ এই পবিত্র অক্ষরটি প্রথমে উচ্চারণ করে উদ্গান করা। সেইজন্য ইহা উদ্গীথ। তৃতীয় মন্ত্রে উদ্গীথকে, সাম বেদে রস বা সারাংশ বলা হইয়াছে।

গান ও সঙ্গীতিক স্বর সম্বন্ধে বেশীর ভাগ উপনিষদের সিদ্ধান্ত যে বাক ও প্রাণের সংমিশ্রণেই স্বরের সৃষ্টি ; স্বর সামগান ও পরবর্তী

১৫০ Comparative Religion p. 135-136.

সকল গানেরই আশ্রয়। স্বর সাধনার উদ্দেশ্য শক্তিকে জাগ্রত করা ও আধ্যাত্মিকতার চরমবিকাশকে লাভ করে জন্ম মৃত্যুরূপ প্রহেলিকার পারে যাওয়া।" ১৫১

"সাম শব্দে সর্ব্বদাই গান বুঝায়। ঋকমন্ত্রে প্রথমাদি সাতটি স্বর সংযুক্ত করে সামগান করা হোত।

ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে যাগ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে মানুষ তখন বিব্রত, অথচ ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা, ভগবান, স্রষ্টা, সৃষ্টি, ভালমন্দ, ইহলোক, পরলোক, কার্য্য কারণ প্রভৃতি ধারণা মানুষের মধ্যে জাগ্রত ছিল। যাগযজ্ঞরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের পিছনে ছিল স্বর্গ লাভের কামনা—পার্থিব সুখের আকাঙ্ক্ষা। তখন সঙ্গীত, গাথা স্তোত্র, স্তোভ, স্তোম প্রভৃতির আকারে বিকাশ লাভ করেছে অথচ স্তোত্র, বেদপাঠে, গানে প্রথমাদি সাত স্বরের মিতালী ছিল। অভিজাত গানের প্রসারতা গোড়াকার দিকে ছিল—কেবল হোতা, অর্ব্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণের ভেতর। নচেৎ লোকসঙ্গীত বা দেশী গানের প্রচলন তো সর্ব্ব সাধারণের ভিতর ছিলই।"

"মতঙ্গ ( নবম শতকের কিছুপরে ) তাঁর বৃহদ্দেশীতে লিখেছেন, শবর 'পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে চার স্বর যুক্ত গানের—তথা দেশী গানের ছিল প্রচলন। মতঙ্গ দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা যায়, মতঙ্গ একদিকে যেমন শবর কাম্বোজাদি জাতির গানকে কৌলিন্য দিতে অস্বীকার করেছেন, অপর দিকে তেমনি মার্গ শ্রেণীর মধ্যে আভীরি, চ্ছেবাটি, গুর্জরী, কাম্বোজী পুলিন্দিকা, শবরী দ্রাবিড়ী, সৈন্ধবী, পৈরালী, বাঙ্গালী, ঠক্ক, কৌশিকী প্রভৃতি রাগকে অভিজাত বলে গণ্য করেছেন। "আমাদের মনে হয় মতঙ্গের সিদ্ধান্ত আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হলেও, অনুসন্ধানী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, তারা কৌলিন্য পাবার পথে উপেক্ষণীয় হয়তো

১৫১ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পৃঃ ৬২, ১০৪, ১১২।

নাও হতে পারে, কেননা ঐ সব দেশ ও জাতিও সংস্কৃতির আলোক দিয়ে, ওদের সঙ্গীতকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ১৫২

স্বামীজির এই স্বীকৃতি দ্বারা প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে স্বামীজির মনে সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতার পরবর্ত্তী এই চিন্তাধারা থাকায়, তিনি খোলাখুলিভাবে এই ভারতীয় সংস্কৃতির জাতিগুলিকে পৃথকভাবে চিন্তা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা সিন্ধু সভ্যতার মূল জাতি এবং সেই জন্যই সঙ্গীতের মূল ধারাকে ইহারা ধারণ করে রেখেছেন। ইহারাই ইহার উদ্ভাবক।

## সঙ্গীতের মূলতত্ত্ব যোগীশিব

"সূক্ষ্মনাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তরে উহার অনুভব করিতে হয়। সূক্ষ্ম আন্তরনাদ হইতে সূক্ষ্মবর্ণ সকলের উৎপত্তি। উহারা আন্তরমাতৃকা। ষট্‌চক্রভেদী সাধক ক্রমশঃ উহাদের লয় করিয়া উহাদিগকে আন্তরবিন্দু পরাবাকে লইয়া আসেন। পরে বিন্দুভেদ করিয়া পরমগুরু পরমশিবের সহিত মিলিত হন। যাহারা এই আন্তর নাদবিন্দুর তত্ত্ব এবং আন্তরনাদের আদর করেন, তাহারাই প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ। সেইজন্য সঙ্গীতের আদিগুরু সর্ব্বত্যাগী মহাদেব নাদকে ললাটে ধারণ করিয়া আছেন। মহাদেব সঙ্গীতের বা সম্যকগীতির তত্ত্বজ্ঞ। যেমন গায়কগণ রাজার গুণগান করেন, সেইরূপ নামরূপাত্মক এই জগৎ রাজ-রাজেশ্বর স্বপ্রকাশ চৈতন্যের গুণগান করিতেছে। মহাদেব ইহা সম্যক অবগত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রে শিষ্যগণকে সেই গীতিই শিক্ষা দিয়াছেন। অপৌরুষেয় বেদও সেই শিক্ষা দিতেছেন।" (অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী ; অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০০, ১০২, ১০৩)

উক্ত উদ্ধৃতি নাদতত্ত্বের ব্যাখ্যা।

তত্ত্বের দিক থেকে এই ব্যাখ্যা, পরবর্ত্তীকালের, কিন্তু শিবের যোগ-বিদ্যা এবং তন্ময়ত্ব প্রাচীন সংস্কৃতি। ইহাই সিন্ধুসভ্যতার যোগীশিবের

১৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৩, ৮৬, ৮৭, ২০, ২১, ৩২।

আত্মপ্রত্যয় বা জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য। ইহা প্রমাণ হয় যে মতঙ্গের সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্বামীজি একমত হতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই তথাকথিত অনার্য্যরাগগুলি বৈদিক ইন্দ্রসংস্কৃতির আর্য্যকর্তৃক প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় ব্রহ্মণ্যসমর্থক মতঙ্গ ইহাদিগকে অনার্য্য বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা সিন্ধুসংস্কৃতির জাতির নিদর্শন। শব্দতত্ত্বজ্ঞান শিবের নিজস্ব। সঙ্গীতের স্রষ্টাই হলেন শব্দতত্ত্বজ্ঞ শিব। আর এই শিবই সিন্ধুসভ্যতার আদিদেবতা—যিনি গন্ধর্ব, অপ্সর, রাক্ষস, সুর এবং অসুর, যক্ষ, কিন্নর—সকলের উপাস্য আদিদেবতা—মহাদেব, মহান্‌অসুর বা অহুরমজদা।

।সন্ধুসভ্যতায় নটরাজ নৃত্যপর মানবের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্বামীজি লিখেছেন, "ডাঃ নরেন্দ্র নাথ্ লাহা উল্লেখ করেছেন The figare was three-headed or three—faced and in that Case it reprsented the youthful Siva Nataraja. ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, "the figure of a male dancer standing on his right leg with the left leg raised high, is the ancestor of Siva Nataraja."
এই মূর্ত্তিটি নটরাজ শিব হোন বা না হোন, ইহা যে পরবর্ত্তীযুগের বিখ্যাত নটরাজ নৃত্যের নিদর্শন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

"শিব নৃত্যগীতবাদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।—তিনি বর্ণস্রষ্টা। নন্দিকেশ্বরের ধ্যাননেত্রে শিব নটরাজের মূর্ত্তি পরিস্ফুট ছিল। সেজন্য তিনি নটরাজের ডমরুধ্বনি বর্ণসৃষ্টির মূলে প্রধান্য দিয়েছেন। অ, ই, উ, ন বর্ণগুলিকে ১৪টি পর্য্যায়ে ভাগ করে তিনি তাদের নাম দিয়েছেন শিবসূত্র বা মহেশ্বর সূত্র। ১৪টি পর্য্যায়ের মধ্যে অ, ই, উন থেকে হল পর্য্যন্ত সমস্ত স্বর ও স্পর্শবর্ণগুলি নিহিত। ডাঃ ভাণ্ডারকার ও পণ্ডিত ভাগবত বলেছেন, সকলের চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত অক্ষর ২০টি; ৫ অর্থ—স্বরবর্ণ, +৫, নাসিকাবর্ণ+৫, গুরুবর্ণ+হয় বরট লন, ঞ ম উননম্‌, ঝ, ভ, ঞ, ঘ ঢ় ধ ন্‌। শ ষ স য়, হল বর্ণগুলি পরে যুক্ত হয়।"

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বৈদিক ব্যাকরণ সৃষ্টি হওয়ার আগে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ই এই সঙ্গীতের স্বর, মাত্রা সৃষ্টির উদ্যোগ। ইহা বর্ণের আদিপরিকল্পনা।

## বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা পৃথক

ডাঃ এম কৃষ্ণমাচারিয়ার তার History of classical Sanskrit literature পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কতকগুলি গাথার উল্লেখ আছে, সেগুলির রূপ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। তাই ভাষার ক্রমবিবর্ত্তনের যুগকে সাধারণতঃ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। (১) ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ—ও অথর্ব বেদের আদিভাগগুলি নিয়ে বৈদিক যুগ, (২) ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলির যুগ (৩) নিরুক্তকার যাস্ক ও পানিনির যুগ। তারপর কাত্যায়ণ ও পতঞ্জলি প্রভৃতির যুগ। তারপর সাংস্কৃতিক বা classical যুগ।" ১৫৩

ইতিপূর্ব্বে আমরা এবিষয়ে উল্লেখ করেছি। সংস্কৃতভাষাকে বৈদিক ভাষার সঙ্গে একক্ষেত্রে নামিয়ে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বৈদিক ভাষা—মান্ত্রিক ভাষা এবং সংস্কৃত—ভাষা সাহিত্যিক ভাষা। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি হলেও, উভয়ের ব্যাকরণ পৃথক। পাণিনিও এই পার্থক্য স্বীকার করে বৈদিক ভাষার জন্য পৃথক অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। বৈদিক ব্যাকরণ অতি প্রাচীন। মাহেশ ব্যাকরণই সর্ব্বাপেক্ষী প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণ! এবিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং মহেশ যে ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা নন্দিকেশ্বরের ধ্যাননেত্রের চিন্তা নয়, ইহা ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ।

## টক্ক রাগ

তারপর "ভৈরবী রাগ বা ভৈরব রাগও শিবের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়—ইহাও উপেক্ষণীয় নয়। একটি রাগের নাম টক্ক—রাগ। গন্ধর্ব্ব দেশের অর্থাৎ গান্ধারের সঙ্গে তক্ষজাতির সম্বন্ধ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে

১৫৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, পৃ ১৮২, ১৮৩, ১৮৪

উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য মনে হয়, টক্ক রাগও গান্ধারের আদিবাসীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। এতে মনে হয় এই রাগটিও সিন্ধুসভ্যতা-সমুদ্ভূত।

## ভৈরব রাগ

স্বামীজি লিখেছেন," সত্যই বৈরো" যদি ভৈরো বা ভৈরব রাগের নামান্তর হয়, তবে খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতকে এর সন্ধান পাওয়া যায় জাপানে। অথচ বৃহদ্দশী বা সঙ্গীতমকরন্দের আগেকার কোন বইয়ে ভৈরব রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সঙ্গীতমকরন্দে ভৈরবরাগ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, ভূপালো ভৈরবশ্চৈব শ্রীরাগ ইত্যাদি।" ভৈরব—শিবের রুদ্রমূর্ত্তি; সুতরাং মনে হয় নটরাজ শিব, যিনি প্রলয়ের নৃত্যশীল, তাঁরই নামে ভৈরবরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। অবশ্য এবিষয় বিশেষজ্ঞদের আলোচ্য। আমাদের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হবে, মন্তব্য চলবে না। তবে স্বামীজি যখন ইহা উল্লেখ করেছেন, তখন আমরা ইহার প্রতি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্বামীজি লিখেছেন, "শ্রদ্ধেয় হাভেল উল্লেখ করেছেন, নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে প্রকৃতির সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রহস্যই প্রকাশিত।" "বেদের রুদ্রই পরে শিবমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের শিল্পে তাই ভৈরবের আবির্ভাব—বা শিবের প্রলয়ঙ্কর রূপ"। বাংলার নটরাজের মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তি থেকে ভিন্ন। রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ উল্লেখ করেছেন, "নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কমণীয় দেহখানি ধীর গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্ত্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। থিচিংএর মূর্ত্তিতে গতির ও স্থিতির—জ্ঞানের ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।" ( মূর্ত্তি ও মন্দির, রমাপ্রসাদ চন্দ পৃ ১০, ১১)

## গান্ধারের সংস্কৃতি

পাঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমে উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ এবং আফগানিস্থানের দক্ষিণাংশ নিয়ে ছিল—গান্ধার বা কম্বোজ রাজ্য।

গান্ধার কম্বোজের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। এই দুইটি রাজ্যের মধ্যেই গান্ধারের সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া যায়। সিন্ধু-ভারতের হরাপ্পা অঞ্চল, এইখানেই পাওয়া গিয়েছে। বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির লীলাভূমিই গান্ধার। বৈদিক ঋষিদের মধ্যেই অনেকেই এই অঞ্চলের অধিবাসী। এখানকার ভাষাই বৈদিক ভাষা। পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে বৈদিকভাষার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—উহা এই অঞ্চলেরই ভাষা। মহেশ ব্যাকরণ এবং ইন্দ্র ব্যাকরণ সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেই রচিত। পাণিনির নিবাস এখানে। স্বতরাং এই অঞ্চল বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষায় মূল উৎস।

সিন্ধুর জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে যখন এই অঞ্চলের লোক যাযাবর হয়ে গেল, তখন এদের ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তরে পশ্চিমে, পূর্ব্বে দক্ষিণে—সর্ব্বত্র বিস্তৃত হল। এদের মূল বংশধরগণ যারা এই অঞ্চলেই পড়ে থাকল, তারা এখনও দারিদ্র্য ও শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে অর্দ্ধযাযাবর অবস্থায় বাস করছে। তারা যদিও এখন মুসলমান, তবুও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, এখনও তাদের মধ্যে জীবিত রয়েছে। গান্ধারের প্রাচীন অধিবাসীরা অর্থাৎ গন্ধর্বেরা এখন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। মেদ, লাসী, লোরা, গেদর, লাইঘা ইত্যাদি। এরা প্রাচীন কিম্বদন্তীর গন্ধর্ব জাতি; গন্ধর্বদের সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা সংস্কৃতসাহিত্যে সুবিদিত। এখন মুসলমান হয়েও এরা সেই বিশেষত্ব হারায় নাই। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে গীতবাদ্য কাফেরের কাজ, কিন্তু এরা ঐ বৃত্তিটিকে প্রাণের মতই ভালবাসে। এই ব্যাপারে তারা মুসলমানী সংস্কৃতি গ্রহণ করে নাই। "মরুতীর্থে হিংলাজ" গ্রন্থে অবধূত, তীর্থ যাত্রার কথায়, লাসবেলার পথে যখন জলাভাবে প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হয়েছে, তখন এই অঞ্চলের এক প্রাচীন অধিবাসী, সম্ভবত: লাসী সর্দ্দার, তাদের আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি তাদের সৎকার করার পর, রাত্রিতে তাদের নৃত্য ও গীতে আপ্যায়নের নিমন্ত্রণ করেন। ঐ আসরে এই মুসলমান

সর্দ্দারের দুই কন্যা এবং তিনি নিজে গীত ও কন্যাদের নৃত্য দ্বারা অতিথিদের আপ্যায়িত করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করায়, সর্দ্দারের জবাব যে এই কাজ তার কুলধর্ম্ম।

সারওয়ান গেজেটিয়ারের ২৬৮ পৃষ্ঠায় আছে, "Most popular amusement of the Lasis and Meds is dancing. At night Lasi amuses himself with music. Man assemble at the shrine of Saint. A musician of the Laigha or Gadar or Lora class plays on his harp and sings. The spectators generally sit till midnight."

এই গেদার জাতি যে প্রাচীন গান্ধারবাসী, তাহা সম্রাট ডেরিয়াসের বিবরণে উল্লেখ আছে।

'The epigraphic of Darius I, mentions the names of the following tribes : the Hiddus—the in-habitants of the Sindhu Valley, the Harkhanis or the Archosians and the Gadara—the people must be the Gandharians mentioned by Herodotus" (Book VII, p. 85). Also Dialectics of Hindu Ritualism, B. N.Dutta, p. 20.

এই গন্ধর্ব জাতি যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে বেলুচিস্তান থেকে আরম্ভ করে, অক্ষুর উপত্যকা এবং কাশ্যপ সাগরের দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত বিচরণ করত। মেদ প্রভৃতির কাহিনী পারসী জাতির সাম্রাজ্য গৌরবের সঙ্গে জড়িত। H. H. Wilson এর বিখ্যাত পুস্তকে এদের এই বিস্তৃতির বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। ইহা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

## খাম্বাজ ও গান্ধার রাগ অনার্য্য নয়

"কম্বোজের নাম বিভিন্ন সাহিত্য ও শিলালিপিতে গান্ধারের সঙ্গে উল্লেখ দেখা যায়। সঙ্গীতে কম্বোজী, খাম্বাজ বা খামাটী রাগ

নাকি কম্বোজ দেশ থেকে আমদানী করা—অথচ এই রাগে ৪টির বেশী স্বরের প্রয়োগ আছে—অন্ততঃ বর্ত্তমানে। কিন্তু বৃহদ্দশীকার কম্বোজকে অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত করেছেন, অথচ কম্বোজকে ঠিক অনার্য্যদের দেশ বলা যায় না। গান্ধারের মত কম্বোজ উত্তরাপথে তথা ভারতের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদের বসবাস ছিল। জর্জ ইলিয়ট তার Hinduism and Buddhism, বি আর চট্টোপাধ্যায় তাঁর Ind. Cult. Influence in Cambodia, শ্রদ্ধেয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর Champaতে, কম্বোজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ডাঃ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, "Kamboja may have been a home of Brahminic learning in the later Vedic period. The presence of Aryas in Kamboja is recognised, in মঝ্‌ঝিমনিকায় (11, 149)" (Political history of Ancient India p. 126). হুয়েংসাং বর্ণিত রাজপুর ও কম্বোজ একার্থক। শ্রদ্ধেয় জিমারের মতে কম্বোজী ও মদ্ররা নিকটগোত্রীয় ছিল ও তারা ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। অধ্যাপক গ্রীয়ার্স‍ন কম্বোজীদিগের ভেতর ইরাণীদের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আচার্য যাস্ক বলেছেন যে কম্বোজ ও প্রাচ্যবাসীরা প্রাথমিক সংস্কৃত ও আর্য্য এবং উত্তরাঞ্চলবাসীরা প্রাদেশিক প্রাকৃত ব্যবহার করত।[১৫১]

প্রসঙ্গত বলা যায় যে যাস্কের এই আর্য্য, প্রাকৃতভাষী হয়েও আর্য্য এবং প্রাথমিক সংস্কৃতভাষীও হয়েও কম্বোজ অনার্য্য। এ কথার তাৎপর্য্য বৈদিক আর্য্য, যারা ভারতীয় যজ্ঞবাদী ছিলেন তাদের নামই করেছেন আচার্য্য যাস্ক. "আর্য্য" বলে। যারা অসুর তথা মদ্র বা পারসিক প্রভৃতি—তারা বৈদিক সংস্কৃতভাষী হয়েও যাস্কের

১৫১ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃ ২৩, ২৪

কাছে অনার্য্য। এই পৃথক দৃষ্টিটার কারণ সুরাসুর বিরোধ—যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে ইহারা সকলেই মূলতঃ একগোত্রীয় ছিল—ঐ গোত্র সিন্ধুগোত্র। ইহারা সিন্ধুগোত্রীয় হলে আর গান্ধার, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগকে প্রাচীন এবং মৌলিক বলে গণ্য করতে বাধা থাকে না।

## প্রকৃত অনার্য্যরাগ

স্বামীজি লিখেছেন, "আদিঅধিবাসী তথাকথিত আদিম অনার্যদের সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে স্বরসংখ্যার প্রয়োগ অত্যন্ত কম এবং তাদের দেশী বা দেশীয় মার্গ—ভিন্ন সঙ্গীত বলা হোত।"

## পূর্ব্বে পাশ্চাত্যে ভাষাতত্ত্ব ছিল না।

পাশ্চাত্যদেশে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশী দিনের কথা নয়। আধুনিক যুগে ইংরাজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। ইহার বিস্তৃতি দিগ্বিদিকে এবং ইহার মাধ্যমে সাহিত্যও বিজ্ঞানের জয়জয়কার। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এইভাষার ঋণ, ভারতীয় ভাষার কাছে। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যে শাস্ত্রের আলোচনা করা হয়, তাহাই ব্যাকরণশাস্ত্র। ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদন এবং উন্নতির পরিচয়ই ব্যাকরণশাস্ত্র।

ব্যাকরণের ইতিহাস বৈদিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অনুমান, খৃষ্ট পূর্ব্ব বাইশ শতকের আগে থেকে বৈদিক ভাষার বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয় যথাস্থানে বলা হয়েছে। ব্যাকরণ একমাত্র বৈদিক ভাষায়ই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই সম্বন্ধে Encyclopedia Americana থেকে উদ্ধৃতি দিছি, "Linguistics is unusul.

among intellectual pursuits of the Western world; in that it does not have important beginnings in the work of ancient Greek and Romans. Between the time of Panini and the 18th century, when the work began to be knowu in Europe, there was little scientific advance in linguistics by methods largely inadequate, of new data from languages hitherto unknown. On perhaps unexpected result of Robert Clive's subjunga-tion of Bengal for the East India Company in the 18nth Century, was the introduction and utilisation in Europe of the linguistic contribution of ancient India, as examplified by the work of Panini. Within a short time, within the matrix of history, languistics assumed the rapid tempo of scientific discovery which it has maintained to this present day." 154

## ভাষার উদ্দেশ্য

পাশ্চাত্যের ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক আদ্যন প্রদান, রাজকার্য্য পরিচালনা এবং ব্যবসাবাণিজ্য, আর ভারতীয় ভাষার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চারণবিশুদ্ধি—মন্ত্রউচ্চারণের বিশুদ্ধতা। এই জন্যই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধারার মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা-বিশুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও বিভিন্নতা এসেছে।

ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যে প্রয়োজন হয় নাই কারণ শব্দের ব্যবহারযোগ্য সামাজিক যোগ্যতাই ছিল পাশ্চাত্যের ভাষার লক্ষ্য। শব্দের বিশুদ্ধতা সেখানে গৌণ।

১৫৪ Encyclo Americana, p. 718.

যতটুকু শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান দরকার ছিল—অভিধান এবং কোষ ছাড়া আর কিছুর যে প্রয়োজন আছে, তাহা তাদের চিন্তায় আসে নাই।

## ভাষার সংজ্ঞা

এখনও যে ভাষা শব্দের অর্থে ঐ উদ্দেশ্যকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, তাহা Encyclopedia Brittanica থেকে যে ভাষার সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করছি, তাতেই বুঝা যাবে।

"Language is a system of conventional spoken or written symbols by means whieh of human beings, as participants of culture, Communicate.

এখানে দেখা যায় যে, ভাষার সীমানা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ঃ (১) ভাষা হবে মানুষের ভাষা। (২) সামাজিক সমষ্টির মানুষ হওয়া চাই। (৩) লৌকিক আচরণই (Conventional) ভাষার মূল বলে ধরা হয়েছে। (৪) উচ্চারিত বা লিখিত চিহ্ন হওয়া চাই। (৫) উহা দ্বারা সংস্কৃতির চিহ্নগুলির সঞ্চারণ বা আদান প্রদান করা হয়। সুতরাং এই সংজ্ঞা দ্বারা শব্দের মূল তত্ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা বুঝায় না। ভাষাটি যেন একটি স্রোতধারা, তার মূল দেখার দরকার নাই। গা ভাসিয়ে পার হতে পারাই যেন উহার উদ্দেশ্য। ভারতীয় ভাষার উদ্দেশ্য ভাষার উৎস সন্ধান। যে শব্দটি মুখগহ্বর থেকে নির্গত হল, উহা কি, কেমন করে নির্গত হল এবং উহার পরিণতিই বা কি—ইহার অনুসন্ধান করেছে বৈদিক ভাষা। এই অনুসন্ধানের ফলে ভাষার বিশুদ্ধি করেছেন আর্য্য ঋষিরা। বৈদিক ব্যাকরণের—ক্রমবিকাশ, ইহার শব্দতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, সুর, বল, ছন্দ প্রভৃতি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, এই বৈদিক মন্ত্র বিশুদ্ধিকে লক্ষ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, মূল উৎস আবিষ্কার

করার ফলে শুধু মানুষের ভাষাই নয়—জীবমাত্রেরই শব্দ এই ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনা গণ্ডীর মধ্যে আনার কোন অসুবিধা নাই। এই ভাষা শব্দতাত্ত্বিক, ধ্বনিতাত্ত্বিক, সার্ব্বজনীন, সর্ব্বাত্মক ও আধ্যাত্মিক।

মুখ নিসৃত শব্দকে বৈখরী শব্দ বলে। ইহার আন্তর প্রকাশে যে পশ্যন্তী, মধ্যমা ও পরাশব্দের পরিচয় আছে—উহাই অধ্যাত্মিক শব্দ বা অনাহত শব্দ। ঐ অনাহত শব্দের আরোহ-ক্রমিক-ধারা—উহাই আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রম।

বৈখরী শব্দ নিয়েই শব্দশাস্ত্র। ভারতে এই শব্দশাস্ত্র সবচেয়ে উচ্চস্থান লাভ করেছে। "দ্বাদশভির্বর্ষৈ র্ব্যাকরণমধীতে।" বার বছর ধরে শুধু ব্যাকরণই পড়তে হয়। ব্যাকরণের নাম শব্দশাস্ত্র। শব্দ থেকে কি ভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণ উৎপন্ন হল—এ বিষয় হরেনবাবু আলোচনা করেছেন—উহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিয়েছি, বিশেষভাবে জানতে হলে তাহা এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া অসম্ভব। তবে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বৈদিক ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের গবেষণা থেকেও উহা যথাস্থানে উদ্ধৃত করেছি।

## ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে তাঁদের ভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক তাঁদের বর্ণলিপিও ধ্বনিতাত্ত্বিক। এটি যে ভাবে তাঁরা নর্ডিকতত্ত্ব সৃষ্টি করে আর্য্যত্বের গৌরবে ভাগ বসাতে চান, ঠিক সেইভাবেই তাঁদের alphabetকে phonetic বলে পরিচিত করে থাকেন।

## পাশ্চাত্য ভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক নয়

ধ্বনিবিদ্যাকে phonetics বলা হয়। Encyclopedia Brittanica তে ইহার সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়েছে; "Phonetics is

the study of speech sounds, their physiological production and acoustic qualities. It deals, configuration of vocal tracts used to produce speech sounds, so as to make syllables, words and sentences." (En, Brit, Phonetics, p, 89)

"The principal requirement of a phonetic is that, there shall be but one symbol for each sound.** Roman alphabets contain 26 letters for spelling of English. To provide symbols for additional sound, I. P. A. :alters several letters in various ways and adds other letters from other alphabets." (En. Americana, Phonetics, p. 792) "Linguistics is concerned with language and without language, human society would not exist. Phonetics is of primary importance for any true understanding of the nature of language because sound is the sole tangible aspect of unwritten language-speech in sound." (En. Am, p. 792)

পাশ্চাত্য ভাষার মূলে ফিনিসিয়, গ্রীক ও রোমান ভাষা এবং অক্ষর। পূর্ব্বেই বলেছি—যে এই ভাষায় অক্ষরের মূলে চিত্রাক্ষর এবং ঐ চিত্রাক্ষরের সংখ্যাধিক্যের লাঘবের জন্য সংক্ষিপ্ত অক্ষরের সৃষ্টি। এই অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহার একটি অক্ষরের নানারকম ধ্বনি। একধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষর এই ভাষায় অল্প। সুতরাং মূল ধ্বনি হিসাবে পাশ্চাত্য ভাষার অক্ষরের, বৈদিক বা সংস্কৃতমূলীয় প্রাচ্যভাষার সঙ্গে কোন ক্রমে তুলনা চলেনা।

ইতিপূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতীয় ভাষার নিকট ঋণ স্বীকারের কথা উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত পণ্ডিত ভারততত্ত্বজ্ঞ এবং খ্যাতিমান। ইহাদের মত গ্রহণ করেন নাই আর একদল পণ্ডিত

আছেন তারা নিয়েছেন নর্ডিকতত্ত্ব। নর্ডিক তত্ত্ববাদীদের আত্ম-শ্লাঘার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে এই দ্বিতীয় দল, ছলের সহায় নিয়ে অযথা বাক বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হয়েছেন! ইহাদের প্রচারশক্তি ও সংখ্যা-বাহুল্যের বলে, ইহারা সত্যকে বিকৃত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং অনুগ্রহপ্রত্যাশী অনুগামী পণ্ডিতের দল ইহাদের অপচেষ্টার সহায় হয়েছেন।

## ডাঃ ডেভিড ডিরিঞ্জারের বিতণ্ডা

পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে ধুরন্ধর একজন পণ্ডিত—ইহার নাম ডেভিড্ ডিরিঞ্জার। তিনি "এ্যালফ্যাবেট" নামে এক গ্রন্থ লিখে, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

ইনি ব্রাহ্মীলিপিকে Semi Alphabet বলেছেন, এবং ফিনিসিয় প্রবর্ত্তিত এলফ্যাবেটই ধ্বনিতত্ত্বসম্মত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সিন্ধুলিপির সঙ্গে হিট্টাইট, ফিনিসিয় এবং এলামীয় ও পারসিক লিপির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করেছেন, তাকে তিনি ভুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। প্রাচীন পারসিক, লিপি যে ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তাহা তিনি যেন আলোচনার যোগ্যই মনে করেন নাই এবং ভারতীয় ভাষাগুলির ইতিহাস আলোচনাকে অনেক বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ বলে তিনি উহাতে কিছু নিশ্চেষ্ট হয়েছেন। তারপর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে ফিনিসিয় এ্যালফ্যাবেটের তাত্ত্বিক ইতিহাস আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন, "A few peoples ( ancient Cyprites, Japanese and others) developed a syllabery. But only the syrio-Palestinian Semites have produced a genius, who created the Alphabetic writing from which have descended all past and present Alphabets." (Alphabet, p, 217)

ডাঃ ডিরিঞ্জারের বক্তব্য এই :

(১) ফিনিসিয়ানগণ সিরিও—প্যালেষ্টাইনবাসী সেমেটিক জাতি। (২) তাদের প্রতিভাই এ্যালফ্যাবেট সৃষ্টি করেছে। (৩) তারা সিলেবলস্বের সৃষ্টিকর্তা। (৪) তাদের এ্যালফ্যাবেট থেকেই যত সব প্রাচীন ও নবীন এ্যালফ্যাবেটের সৃষ্টি হয়েছে।

ডাঃ ডিরিঞ্জার এ্যালফাবেট অর্থে বর্ণমালা বুঝেছেন। এই অর্থে সংস্কৃত বর্ণমালাও ইহার অন্তর্গত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "In a true alphabet each sign generally denotes one sound only" (Alphabet, p. 55) তিনি ফিনিসিয় বর্ণমালাকে মিশ্রভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক মনে করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনায় জেনেছি যে ফিনিসিয় Alphabet ধ্বনিতত্ত্বসঙ্গত নয়। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য মূলতঃ সঙ্গতিশূন্য। তারপর আলফাবেটের সঙ্গে ভারতীয় বর্ণমালা এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে না—কারণ ইহা ধ্বনিতাত্ত্বিক।

## Syllable এবং বর্ণ একার্থক নয়

তারপর syllable শব্দ দ্বারা ডাঃ ডিরিঞ্জার ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্য বর্ণমালাকে গোঁজামিল দিতে চেষ্টা করেছেন। Syllable শব্দটির অর্থ "বর্ণ" শব্দের সঙ্গে একার্থবাচক নয়। প্রায়ই syllable দুই বা ততোধিক বর্ণের যোগে উৎপন্ন। শব্দের ভাবার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য শব্দের বর্ণের উপর যে বল বা জোর দেওয়া হয় তাহাই syllable, যদিও ইহা কখনও কখন এক বর্ণদ্বারাও গঠিত হতে পারে। সুতরাং syllable-কে ধ্বনিতত্ত্বের মৌলিক স্থানে বসান যায় না। সংস্কৃত বর্ণমালার মূলে syllable-এর প্রতিষ্ঠা নাই, এবং অন্য বর্ণমালা syllable মূলীয় হ'লে ইহা ধ্বনিতাত্ত্বিক নয়।

তারপর ফিনিসিয়গণকে তিনি সিলেবলস্বের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন।

ইহাও ঠিক নয়। ডাঃ ডিবিঞ্জার নিজেই সিন্ধুলিপিকে probably syllabic বলেছেন, "The script is partly ideographic and partly phonetic) (probably syllabic) and it also contains some determinative signs" (Alphabet, p. 85)

ইলামাইট ভাষার আলোচনার সময়ে তিনি লিখেছেন, "At a later period, the Elamites abandoned their indigenous script and adopted Babylonian cuneiform writing introducing many changes. There are only a few signs and determinatives, the greater part of the signs being syllabic, number of all characters 113, while the number of syllable signs is over 80."

Letters in the script dropped out at the beginning of the 5th Cent. B. C. as the spoken Babylonian language fell into disuse. The reason for this apparently curious sequence in dropping the various cuneiform scripts is that the early Persian writing was in Pustu, an alphabet of 40 characters and the new Elamic system was a quasisyllabic script, the Babylonian was a transitional system with over 640 signs and the summerian script presented an additional difficulty—that its language was quite unknown." (The Alphabet page 55)

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে নূতন ইলামী লিপির কথা যাকে বলা হয়েছে, উহার ৪০টি বর্ণ, যাহা (পুস্তু ভাষার বর্ণ), তাহাকে কোন

N.B. ইন্দো-ইউরোপীয়ান শব্দটিকে এখানে ইন্দো-ইরাণীয় অর্থে ধরতে হবে; কারণ এদের ভাষাতত্ত্বে—ইন্দো-ইরাণীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

ক্রমে ফিনিসিয় বলা যায় না এবং উহাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ( অর্থাৎ ইন্দো-ইরাণীয় ) বলা হয়েছে, তাহা ব্রাহ্মীলিপিরই অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ডাঃ ডিরিঞ্জার ফিনিসিয় বর্ণমালার brief ধরেছেন, তিনি এই সমস্ত সত্য যথাসাধ্য এড়াতে চেষ্টা করছেন।

তারপর তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "The Assyrian syllaberies or so called syllaberies, or dictionaries are larger and more complete than the Babylonians," (Alphabet, p. 53)

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি ডাঃ ডিরিঞ্জারের নিজের পুস্তক থেকেই। সুতরাং তিনি যে ফিনিসিয়ানদের সিলেবলত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলেছেন, সেটা সত্য না তার ঐ লেখাগুলি সত্য ?

## ভারতে ইউরোপীয় আক্রমণ ?

পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বজ্ঞদের কেহ কেহ, যারা নডিকতত্ত্ববাদী—তাদের প্রধান অবলম্বন ভারতীয় ভাষাভাষী হিট্টাইটআদি জাতি। তাঁরা ইন্দো শব্দটিকে ইউরোপীয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কাজেই ভারতীয়সংশ্রব এরা ত্যাগ করতে পারেন নাই। ইউরোপীয় শব্দটির উদ্দেশ্য—তাদের গোঁজামিল। ইউরোপে বা রাশিয়ায় এই হিট্টাইট-দের পূর্ব্বে কোন "ইন্দো" বা ভারতীদের প্রতিষ্ঠালাভ হয় নাই। সুতরাং ইন্দোইউরোপীয় কে খাড়া করতে হলে হিট্টাইট জাতিকে ইউরোপীয় এবং তাহাদিগকে ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আক্রমণ-কারী করে পাঠাতে হয়, আর এদের ইউরোপীয় সাজে সাজাতে হয়। এদের দুর্ভাগ্য এই যে এত প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ হ'ল, এই আক্রমণের প্রমাণ তো দূরের কথা এদের সঙ্গে ব্রোঞ্জযুগের অর্থাৎ সুমেরীয় এবং আক্কাদীয় যুগের—এমন কি পরবর্ত্তীকালের অর্থাৎ লৌহ যুগের কালেও এই অঞ্চল থেকে কোন অভিযাত্রী ভারতসীমান্তে গিয়েছে এবং বৈদিক

সভ্যতা দান করেছে—ইহার কোন প্রমাণ নাই। ইউরোপ কর্তৃক ভারতআক্রমণের কথা উল্টাদিকের কথা। ভারত থেকেই আর্য্যদিগ্বিজয়কারী রূপে ভারতীয় বৈদিকভাষাভাষীরা পশ্চিম এসিয়ায় দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, রাজ্য গড়েছে, সভ্যতা ও ভাষা দান করেছে—তাহাই প্রমাণ হয়।

ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে এই নর্ডিকবাদীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বৈদিক প্রমাণের যুক্তিগুলি আলোচনা করেছি। এখন এদের ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলির অযৌক্তিকতা ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশঃ উত্থাপন করছি।

## আরামাইক সংস্কৃতি ও ভাষা

আরামাইক ভাষাকে সেমেটিক বলা হয়েছে। ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, "In the table of Nations (Genesis, Chap. X), the ancestor of Arameans is described as a son of Shem, while Genesis XXII, 21, makes him a grandson of Nahar, Abraham's brother Jacob—an wandering Aramean ; his mother and his wives are also represented as Arameans." (Alphabet, p. 252)

ইহা ইহুদীদের বাইবেলের জেনেসিসের কথা। জেনেসিসের লিখিত বিবরণের উপর যে ঐতিহাসিক মতবাদ স্থাপন করা যায় না—ইহা পরে দেখান হবে।

ঐতিহাসিককালে অনুমান খৃষ্টীয় সহস্রাব্দে আরামীয়দিগকে পার্ব্বত্যঅঞ্চলাগত দুর্দ্ধর্ষ বেদুইনজাতীয় যাযাবর জাতি বলে পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা সুসভ্য অবস্থার যাযাবর ছিল না। এই মেষপালক বর্ব্বর যাযাবর জাতির সংস্কৃতি এমন হতে পারে না যে

অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্ত পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবে।

সিরিয়ার প্রতিবাসী তৎকালীন গ্রীকগণের কাছে আরাম শব্দের অর্থ ছিল সিরিয়ান। ইহা ডাঃ ডিরিঞ্জারই লিখেছেন।

"Syria and Syrians were the Greek terms for Aram and Arameans. In the Rabbinical literature, the term Aram is equivalent to heathen members of the Jew who spoke Aram. The Jews preferred to use the Greek term Syriac to designate these Arameans."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সিরিয়াবাসীদিগকেই প্রকৃত আরামাইক নাম দেওয়া উচিত।

Encyclopadia Americana, Aramaic Language শীর্ষক আলোচনার ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "Aramaic Language in its eastern form is closely related to Syriac and its Western form is Hebrew. By the time of the fall of Damascus and Syria, Aramaic had become the Lingua franca of the fertile Crescent (722 B. C.)"

উক্ত উদ্ধৃতিতে বোঝা যায়—যে সুসভ্য জাতি fertile crescentএ খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রকে উপনিবিষ্ট হয়ে, পশ্চিম এসিয়াকে জ্ঞান ও শিল্পে সমৃদ্ধ করেছিল, সেই সিরিয়াবাসী ঔপনিবেশিকগণ যখন স্থানীয় জাতির মধ্যে মিশে গিয়েছিল, তাহাদের নামই আরামাইক দেওয়া হয়েছিল। সেই জাতিই ক্রীট, ফিনিসিয়, হিট্টাইট, হিকশোস প্রভৃতি জাতির বংশধরেরা। এদের যখন নূতন বর্ব্বরদের আক্রমণে শাসনভার খসে গেল, তখন এরা জনসমাজে মিশে গিয়ে, তাদের জ্ঞান ও সভ্যতা সকলের মধ্যে বিস্তার করে দিয়েছিল বলেই আরামীয় ভাষা এত বিস্তার লাভ করেছিল।

এরা স্থানীয় ব্যাবিলোনীয়, ইহুদী, আমোরাইট সমাজের সংশ্রবে তাদের নিজ ভাষা নিমজ্জিত করে দিয়েছিল, তাতে তাদের ভাষার উচ্চারণ অনেক বিষয়ে হিব্রুভাষার মত হয়েছিল বটে কিন্তু সেমেটিক পরিবারের সঙ্গে তার তফাৎ ছিল।

Encyclo. Americana লিখছেন,

"Aramaic is differentiated from other members of the semetic family by a predilection for the Vocalic sound, a reluctance to use prehistoric Vowels and various consonantal preferences such as d for z, t for sh and n for l. Laxicographically many Aramaic words are borrowed from the foreign tongues specially Akkadian and Persian."

Encyclopedia Brittanica, এই প্রসঙ্গে ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "Religious pantheon included Cannanite and Assyrian Gods. The Arameans had deities of their own. Their chief God was Hadad or Rammon, equated with the Hurrian storm God Teshub. His chief temple was at Damuscus. Their chief goddess was Atargatis (Atarte), A festival of two deities corresponding to Phonecia, Astarte and Anath, Her chief Shrine was at Heiropolis in Syria."

উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে হাইরোপোলিসের মন্দিরটি হিট্টাইট দেবতা তেষবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই আরামাইক জাতির মূল কোথায় এবং এরা যে হিট্টাইট জাতির মিশ্র-রক্ত সম্ভূত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

## সেমেটিক কারা ?

পশ্চিম এসিয়ার কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে দিগ্বিদিক চিন্তা না করেই সেমেটিক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই নামটাকে কোন বিশেষ জাতির সঙ্গে একার্থবাচক করার উপায় নাই। এই সেমেটিক জাতিত্ব যদি প্রকৃতই জাতি বলে পরিচিত হয়ে থাকে—ইহা এত মিশে গিয়েছে যে, একে সংস্কৃতি বলা ছাড়া আর কিছু বলে পরিচয় দেওয়ার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলেছি, বাইবেলের গল্প হেম, সেম, জাপেথের কাহিনী অবলম্বন করে, সেম নাম থেকে সেমেটিক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। এই গল্পটিও ঐতিহাসিক নয়—এটি একটি আজগুবি গল্প।

সাধারণতঃ দাড়ি রাখা এবং সুন্নত করার প্রথাকে অবলম্বন করে সেমাইট নামটিকে নির্দ্দেশ করা হয়। পারসীকগণ দাড়ি রাখত, ভারতীয়গণের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রথা ছিল—সুতরাং এই পরিচয় যথার্থ সেমেটিকত্বের পরিচয় নয়।

সুন্নত করাও তাই। ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয়দের মধ্যে সুন্নত করার প্রথা ছিল। মিশরীয় সুন্নত করা সত্ত্বেও সেমেটিক বলে পরিচিত ছিল না। সুতরাং উক্ত দুইটি বিশেষত্ব দ্বারা সেমেটিক শব্দ নির্দ্দেশ করা চলে না।

প্রথম মীমাংসা ঃ প্রকৃত সেমেটিক শব্দ দ্বারা বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টির কথিত জাতিকে পরিচিত করলে, সেমেটীক. শব্দ ও সংস্কৃতির একটি ব্যাখ্যা হয়। আরব ও ইহুদী জাতিরই মূল ধর্ম্মশাস্ত্র—ওল্ড টেষ্টামেন্ট। এই পুস্তকের লিখিত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হলেন মোজেস। ইনি এই দুই জাতিরই ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। ইঁহারই আদেশ—ইহার অনুবর্ত্তীগণ সুন্নত করবে। এই আদেশ অনুসারে ইহুদী ও মুসলমানের ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সুন্নত অত্যাবশ্যকভাবে জড়িত। অন্যান্য জাতির মধ্যে এই প্রথাটি নাই, তবে কেহ ইহা

করলে তাহা অন্যান্য কারণ জড়িত, ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই প্রথাই এদের সেমিটিকত্বের কারণ হতে পারে।

দ্বিতীয় মীমাংসা : এই দুইটি জাতির ইতিহাস পশ্চিম এসিয়ার সকল সভ্যজাতির পরবর্ত্তী কালের। এরা ছিল প্রথমে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুপ্রকৃতি, যাযাবর ও ভ্রমণকারী জাতি। মাটির সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এদের যা কিছু শিক্ষা প্রতিবেশী সুসভ্য জাতির কাছ থেকেই। সুতরাং এদের সভ্যতা বুঝতে হলে তার মূল এদের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতির মধ্যে খুঁজতে হবে। আরব জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানীয় আধিবাসী ছিল যাযাবর অনুন্নত আমুর্রুগণ। এরা হিট্টাইট ও সুমেরীয় সংস্পর্শে সুসভ্য হয়েছিল। তার পরে তারা এদের সঙ্গে মিশে যায় এবং আক্কাদ ও আসীরীয় সাম্রাজ্য গঠন করে। এদের পরের যাযাবর জাতি ইহুদী। এরাও ফিনিসিয় ও হিট্টাহিটদের মধ্যে মিলে যায়, কিন্তু এদের একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা এদের জাতিগত দেবতা ইহোভা। এই জাতিগুলির স্থায়ী বাস না থাকার কারণ, এই অঞ্চলের শুষ্কত্ব, অনুর্ব্বরত্ব এবং খাদ্যদ্রব্যের অভাব। জগতের নিয়মই এই যে কোন জাতি খাদ্যে স্বাবলম্বী না হলেও জাতিহিসাবে উপনিবিষ্ট হতে পারে না। এদের লক্ষ্য থাকে নিকটবর্ত্তী উর্ব্বর ভূমিখণ্ড ও ধনজনে পরিপূর্ণ দেশের প্রতি। সুযোগ পেলে এরা ঐ সমস্ত লুঠ করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কোন জাতি বা দেশের মানবিকতা ও সভ্যতা নির্ভর করে সেই দেশের খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আত্মনির্ভরতার উপর। ইহার অভাব হলেই তারা অন্যজাতির উপর আক্রমণ করে এবং তাকে নির্মূল করার চেষ্টা করে এবং কখনও কখন সাফল্য লাভ করে। সেমেটিক বিশেষণে বিশেষিত ইহুদী ও মুসলমান জাতি সম্বন্ধে—উপরের এই নির্দ্দেশিত সংজ্ঞার অন্তর্গত বলে এদের ধরা যেতে পারে।

সিন্ধু বা সুমেরীয় সংস্কৃতিকে এই হিসাবে পরিচিত করা যায় না। সুমেরীয় শুধু প্রাচুর্য্যের দেশের অধিবাসী ছিল না। এরা ছিল মাটির

সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। এদের বৃত্তি ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। সিন্ধুর অধিবাসীগণ জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে গৃহহীন ও যাযাবরে পরিণত হলেও এরা ছিল মূলতঃ কৃষিজীবি এবং পরবর্ত্তী কালে এরা কৃষি ভুমিতেই উপনিবিষ্ট হয়েছিল।

সুতরাং সভ্যতার সংস্কৃতি ছিল এদের নিজস্ব। সিন্ধুর জাতিরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে, পশ্চিমে ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ধরে এলাম, সুমেরে, অক্ষুনদীর উপত্যকা দিয়ে কাশ্যপতীরে, মেসপটেমিয়ায়-সিরিয়া থেকে ব্যবিলন পর্য্যন্ত উর্ব্বর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে আর্য্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছিল।

মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়া ছিল এই সুসভ্য আর্য্য ও সেমেটিকদের পর পর সংঘর্ষের লীলাভূমি। ইহা ছিল আর্য্য বনাম অনার্য্যের যুদ্ধক্ষেত্র। সুতরাং সেমেটিক জাতিকে এ্যালফাবেটের স্রষ্টা বলে পরিচিত করতে হলে এই মূলগত প্রভেদটাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসে সভ্যতার চিত্রঅঙ্কনে গলদ ঢুকে যায়। সুতরাং ফিনিসিয়, হিট্টাইট, সুমের, আক্কাদ ও ব্যবিলনীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করতে হলে, সেমেটিক শব্দটি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার।

আক্কাদীয় ও আসীরিয়গণকে সেমেটিক বলা হয়। উহারা সেমেটীকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বটে। সর্ব্বত্রই সব জাতিই এইরূপ মিশ্রণ লাভ করেছে। এই মিশ্রণের মধ্যে এদের পূর্ব্বীয় ইতিহাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতটুকু আছে, উহার অনুসন্ধানই প্রকৃত ইতিহাসের গবেষণা। এই হিসাবে আক্কাদ ও আসিরিয়ার সংস্কৃতি সম্পূর্ণই সুমেরীয় সংস্কৃতি তথা সিন্ধু সংস্কৃতি—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

## ফিনিসিয় সংস্কৃতি ও ভাষা

ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, "The development of Phonician Alphabet in all its subdivisions, including Punic aud Neopunic and in all its form, was like that of early Hebrew and Aramaic Alphabets, purely

external, the number and the phonetic value of the letters remained always the same. The direction of the lines always horizontal, was Constantly from right to left. The main distinctive characteristic of the Phonecian scripts was that the letters became constantly longer and the unit, which as already mentioned became increasingly thicker and shorter."

ডাঃ ডিবিঞ্জারের মতেই ফিনিসিয় লিপি আরামাইক লিপির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আরামাইক লিপির কৃতিত্ব যদি হিট্টাইট ইত্যাদি জাতির সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে ফিনিসিয় লিপির মূলেও ঐ জাতিগুলির কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে—কেননা ফিনিসিয় সভ্যতা হিট্টাইটদের সভ্যতারই সমসাময়িক এবং উহার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ফিনিসিয়া শীর্ষক বিবরণের ৮৯৫ পৃষ্ঠায় আছে,

"The Phoincian script of 22 letters purely abstract and purged of pictorial association appeared at Byblos, already complete by the 15 Century B. C., if not earlier. The fact that always written from right to left suggest that it was first evolved by stone masons holding a hammer in the right hand and working with a chisel in the left."

উক্ত উদ্ধৃতি ক্রমে হইা স্পষ্টই দেখা যায় যে আরামাইক আলফাবেট আবিষ্কৃত হওয়ার কৃতিত্ব আরও আগেকার সভ্যজাতির—ইহারা ফিনিসিয়; ইহাদের ২২টি অক্ষর এবং তাহা চিত্রাক্ষর বিরর্জিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ ডিরিঞ্জারের দেওয়া Alphabet আবিষ্কারের গৌরব তথাকথিত আরামাইক জাতি বা সেমেটিক জাতি নয়। ইহার গৌরব ফিনিসিয়দের।

# ফিনিসিয়গণ কি সেমেটিক ?

ইতিপূর্ব্বে কয়েক স্থানে আলোচনায় দেখিয়েছি যে এরা বৈদিক যুগের পণিজাতি—যাদের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদে যা বর্ণনা আছে তাতে বোঝা যায়—পণিদের তখনকার ভারতসীমান্ত থেকে বেশী দূরবর্ত্তী স্থানে বসতি ছিল না।

তারা সম্ভবতঃ মাকরান অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। এই মাকরান সিন্ধু সভ্যতায় একটি বড় বিশিষ্ট স্থান। মকর একটি কাল্পনিক সামুদ্রিক মৎস্য। গঙ্গাদেবীর বাহন। ফিনিসিয়দের সংস্কৃতিতে মৎস্য মহাদেবীর কথা আছে। এমনও হ'তে পারে যে এই মকরই তাদের মহাদেবীর মৎস্যরূপী বাহন ছিল। পরবর্ত্তী বৈদিক সভ্যতার কালে মাকরাণের সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ কম ছিল না। হিঙ্গুল নদী এবং হিংলাজ তীর্থ এই অঞ্চলেই। গেবর বাঁধের অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন প্রাচীর প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়। লর্ড কর্জন বলেন যে মাকরান নামটি মকর থেকে হয়েছে। মাকরান থেকে পারস্য সাগর বেশী দূর নয়। পারস্য সাগরের বেহেরিন দ্বীপের সঙ্গে ইহার বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রাচীন কালে ছিল—তাহার প্রমাণ আছে। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। পারস্য সাগরের বেহেরিন দ্বীপের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ফিনিসিয়দের কীর্ত্তিকলাপ অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে। তাহারা এখানে বাস করত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হেরোডোটাস লিখেছেন যে ফিনিসিয়গণ বলেন যে তারা পারস্য সাগরের উত্তর থেকে এসেছেন।

ইতিপূর্ব্বে সিরিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই সিরিয়ার দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর উপকূলেই ফিনিসিয়া। সিরিয়ার উপনিবেশ ছিল হিট্টাইট ও হিকসোসদের। সুতরাং ফিনিসিয়গণের সমসাময়িক এই আর্য ঔপনিবেশিকের সান্নিধ্য থেকে অনুমান অসঙ্গত নয় যে ইহারাও আর্য্যঔপনিবেশিক। আর এরা যে ঔপনিবেশিক এবং পারস্য সাগরের উপকূল থেকে আগত—তাহা এদের নিজের কথা। পারস্য

সাগরউপকূলে বাস এবং মাকরাণের সঙ্গে বাণিজ্য এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ—এদের সিন্ধু সভ্যতার মানুষ ছাড়া আর কিছু নির্দ্দেশ করে না।

এদের বিষয় জাতিতত্ত্বের বিবরণে আরও বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

মিথস অব ব্যাবিলনিয়ায়, ডোনাল্ড মেকেঞ্জি ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "উত্তর ব্যাবিলন এবং আসীরিয়া সম্ভবতঃ ভূমিকর্ষণ-কারীদের আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু সমুদ্রপথের যাত্রীদের জন্য নিশ্চয় অন্য পথ ছিল। এদের নিজ কাহিনীর মতে এদের আদিবাস ছিল পারস্যসাগরের উত্তর তীরভূমি। যতদূর আমাদের জানা আছে, ভূমধ্যসাগরের তীরে এদের প্রথম আগমন খৃঃ পূঃ ২০০০ শতকে। এখানে তারা প্রাচীন ক্রীটের বণিকগণের সঙ্গে প্রতিযোগতায় সামুদ্রিক বণিকের ব্যবসায় গ্রহণ করেছিল;"

এদের সংস্কৃত ছিল মাতৃ সংস্কৃতি।

"এদের মহামাতার মঙ্গলদায়িনী রূপটি সুমেরিয়ান বাউএর সঙ্গে এক। আবার ইনি ফিনিসিয়ান বাউএর সঙ্গে এক। বাউএর অন্য আর এক নাম "মা" এবং "নিনটু;" দেবতা 'মা'র একটি রূপ ছিল অর্দ্ধ নাগ এবং অর্দ্ধ মানুষ, তাঁকে একটি শিশু নিয়ে স্তন্যপানে রত দেখা যায়।" ১৫৬

এই মাতৃ সংস্কৃতি ও মা নামটি ভারতীয় সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে। নাগ মাতার পরিকল্পনাও সিন্ধু সভ্যতার স্মৃতি এবং ভারতের প্রাচীন ও সুবিস্তৃত নাগ উপাসনার অঙ্গ। নাগ ছিল সিন্ধু সভ্যতার টোটিক নিনটু শব্দটি নিনা বা নানার অপভ্রংশ বলেই মনে হয়। মাকরাণের সন্নিহিত লাসবেলায় হিঙ্গুলা দেবীর প্রাচীন নাম "নানা"। সুতরাং এই সংস্কৃতিটিও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

---

১৫৬ M. O. B. Mackenzic p. 150

পণি জাতি যে প্রাচীন ভারতের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল, তাহার আধুনিক নিদর্শন পাওয়া যায়। বেলুচিস্থানের শিবি-ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে।

"The Panis or Parnis was originally a nomad race of the Gourghonia Afgans. Safi, a branch of the tribe are still found in considerable numbers near Gazni and another large section known as Gadeens reside in the Peshwar District to the East of Esufgoi Country." (Sibi Dist. Gazetter).

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে সিন্ধু অঞ্চল বাসের অযোগ্য হওয়াতে, স্থানীয় অধিবাসীরা যাযাবর অবস্থায় পতিত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই আহার ও বাসস্থানের জন্য বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস অন্যত্র চলে যায়। শুধু পণি জাতি কেন, বৈদিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক উচ্চ জাতি এই ভাবে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

এদের যজ্ঞ করার পদ্ধতিটি হিট্টাইটদের অনুরূপই ছিল।" (Encyclo. Brit. p. 895)

এতে মনে হয় এরা হিট্টাইটদের ( তথা ইহুদীদের মত ) সমসাময়িক কালেই সিন্ধু অঞ্চল ত্যাগ করে এসেছিল।

সুকুমার কলায়, ফিনিসিয়দের সংস্কৃতির কালের নাম দেওয়া হয়েছে "Orientalising period."

Encyclopedia Brittanicaতে আছে "The reflections of Phonecian embroidery, weaving and metal work is clearly seen in the decoration and shapes of Greek pottery of the 7th Century B. C. aptly. called, "Orientalising period" especially in the animal friezes and the border of lotus and palmette patterns."

এই Orientalising period এর অর্থ ফিনিসিয়া বণিকদের নিকট "পুর্ব্বদেশের কলা বিদ্যা গ্রহণের যুগ"। পদ্ম এবং তালপত্রের সংস্কৃতিটি ভারতের স্মৃতির সঙ্গেই বিজড়িত। ফিনিসিয়গণ যে পূর্ব্বদেশীয় ইহা এই প্রাচীন সংজ্ঞাটি তাহারই স্মৃতিবহন করছে।

এরা বণিকজাতি। স্থানীয় সেমেটিক জাতির মিশ্রণে এদের ভাষা সেমেটিক ভাবাপন্ন হলেও এদের সমাজব্যবস্থা ও দেবতা সেমেটিক-ভাবাপন্ন হয় নাই। ইহুদী জাতিই এদের কাছ থেকে তাদের সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু নিয়েছে। ফিলিষ্টাইন জাতি ইহুদেরই স্বজাতি। ইহারা ক্যানান এবং প্যালেষ্টাইনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিনিসিয়গণের ভারতীয় ইতিহাসের নাম পণি। গ্রীকদের নিকট ইহাদের নাম পইনি। মতিলাল দাস তাঁর ভারতবাণীর ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "পণিগণ ফিনিসিয় বণিকগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইন্দ্রের সহিত পণিগণের যুদ্ধ বারংবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। পণিগণ ফিনিসিয় বণিকগণের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বে বোধ হয় ইহারা ইরাণে ও গান্ধারে ছিল (আফগানিস্থানে)। পণিদিগের নানা দুর্গ ছিল। ইন্দ্র সেই সব দুর্গ তাঁর ধূমবর্ষী কামানে (বজ্রে) ধ্বংস করিয়া অপহৃত গাভীর উদ্ধার করেন।"

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার "হিন্দু রিচুয়ালিজম" গ্রন্থে লিখেছেন, "পণির বিষয় ঋক ৪, ২৫. ৭এ আছে," সোমপায়ী ইন্দ্র ধনী পণিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না, কারণ এদের সোম নাই।" সায়ণ এই শব্দটির অর্থ করেছেন" বণিক। পুনরায় ৭, ৬, ৩ ঋকে পণিদিগকে অযাজ্ঞিক দস্যু বলা হয়েছে। তার পর ১০ সুক্তে ১০৮ পৃষ্ঠায় সরমা ও পণির কথোপথন সম্বন্ধে লেখা। প্রথম ঋকে আছে হে সরমা, তুমি কি জন্য এখানে এসেছ? তোমার রাস নদীর জল পার হতে কত রাত লেগেছে, কেমন করে তুমি রাস নদী অতিক্রম করেছ? এই ঋকের ভাবার্থ এই যে, সরমার পণিদের দেশে পৌছতে কয়েক

রাত্রি লেগেছিল: এতে মনে করা যায় যে পণিদের দেশ ভারতের সীমানার বাহিরে অবস্থিত ছিল।"

ডাঃ দত্ত লিখছেন "এই যুক্তি থেকে বোঝা যায় যে পণিরা গাভী ও অন্য প্রকার সম্পত্তি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল এবং পর্বত দ্বারা ভালভাবে রক্ষিত ছিল। তারা বৈদিক দেবতা জানত না এবং বৈদিক পথ অনুসরণ করত না। তারা সম্পূর্ণ বাহিরের জাতি ছিল।

"হিরোডোটাস্ বলেন ( ১, ৭ এর ৯ এ ) যে ফিনিসিয়দের কাহিনীতে আছে যে তারা পারস্য সাগর থেকে আগত। হল বলেন, "ইহা অসম্ভব নয় যে হিব্রুদের বাইবেলের কাহিনী যাতে এদের উদ্ভব ব্যাবিলন বলে বর্ণিত হয়েছে—তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলা যায়। প্রলয়ের কাহিনীটা সেমাইট এবং বৈদিক ভারতীয়দের সংশ্রবের আর একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে না কি? অনেকের মতে প্রলয়ের কথাটা আর্য্য কাহিনী—যাহা পরে সেমাইটগণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এতগুলির নামের সাদৃশ্যদ্বারা এই পরস্পর ঋণের কথা ধারণা হয়।" ১৫৭

পারস্য সাগরের উপকূলে বসবাসকারী পণিজাতি সিন্ধু সভ্যতার সীমার মধ্যেই পড়ে। ইহা আমরা ইতি পূর্ব্বে সিন্ধুসভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ সিন্ধু সভ্যতায় শিবপশুপতির সংস্কৃতি থাকলেও ইন্দ্র নামের কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় নাই। সিন্ধু সভ্যতার উপনিবেশ ছিল এই জাতির। এই সময় ইহারা সুমেরের পরবর্ত্তী আদিবৈদিক সংস্কৃতির সমকালীন ও সমপ্রকারের ছিল। পরবর্ত্তী কালে সেমেটিক সংশ্রবে ইহাদের ভাষা ও লিপির নাম সেমেটিক হয়ে যাওয়ায় প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহাদের সেমেটিক আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু ইহারা ছিল সিন্ধু সংস্কৃতির অন্তর্গত।

শচীন্দ্রনাথ "প্রাচীন ইরাকের ২১৬ পৃষ্ঠায়" লিখেছেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক

১৫৭ Hindu Ritualism, p 43, 44

খননকার্য্যে আসুরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে এখানকার সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। নিনেভের নিকট টেপিগওরা নামক স্থানে একটি সাম্প্রতিক খননকার্য্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দের প্রাচীন সহর আবিস্কৃত হয়েছে, আর সেখানে পাওয়া গেছে মন্দির ও সমাধি ছাড়াও বিবিধ উপকরণ। ভস্মীভূত নগর আসুরের অঙ্গারস্তূপের তলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আসীরিয়ার আদিম অধিবাসীরা সেমেটিক জাতীয় মানুষ ছিল না, তারা ছিল সুমেরীয়দেরই জ্ঞাতি, মেডিটেরিয়ান জাতীয় এবং তাদের সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ সুমেরীয়।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন সংস্কৃতি বিশিষ্ট ফিনিসিয়ানরা যারা পারস্য সাগর-তীরে বাস করত, তাদের কখনই সেমেটিক বলা যায় না। বাণিজ্য উপলক্ষে এদের উপনিবেশ এখানেও থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, কারণ এদের বসবাস, পারস্য সাগরের তীরে, ইহা সুমেরেরই অন্তর্গত। এই সংস্কৃতি সিন্ধুরই বিকাশ।

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, "উত্তর বাবিলন এবং আসীরিয়া সম্ভবতঃ ভূমিকর্ষণকারীদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সমুদ্রপথের যাত্রীদের জন্য নিশ্চয় পৃথক পথ ছিল। এদের নিজ কাহিনীর মতে এদের আদিবাস ছিল, পারস্য সাগরের উত্তর তীরভূমিতে। যতদূর আমাদের জানা আছে, ভূমধ্যসাগরের তীরে এদের প্রথম আগমন, প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ শতকে। এখানে তারা প্রাচীন ক্রীটের বণিকগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সামুদ্রিক বাণকের ব্যবসায় গ্রহণ করেছিল।" ১৫৮

ডাঃ দত্ত যে ভারতের সীমানার বাহিরে পণিদের দেশ বলেছেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায় না। ইহার কয়েকটা কারণ দিচ্ছি।

(১) প্রথমতঃ সিন্ধু সভ্যতার জাতিগুলির জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে

১৫৮ M. O, B ; D. Mackenzic, p. 245

এক স্থানে বাস করার উপায় ছিল না। তারা পারস্য উপসাগর থেকে কাশ্যপ সাগর পর্য্যন্ত নানাস্থানে বাসস্থান বদলাতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন জাতিগুলি যথা মেদ, পরশু, গাদার, ( গান্ধার ) পিশায়ৈ ( পিশাচ ) প্রভৃতি জাতির এই এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে থাকা প্রমাণ হয়। পণিরাও এই এলাকাবাসী। বৈদিক সাহিত্যে এদের সরস্বতী তীরবর্তী বলে বর্ণনা আছে। তবে এই সরস্বতী সম্ভবতঃ কম্বোজ দেশে ( আফগানিস্থান ) অবস্থিত সরস্বতী (সম্ভবতঃ এই সরস্বতীই পারসিকগণের হরহৈতি)

(২) দ্বিতীয়তঃ এরা ছিল স্পষ্টতঃ বণিক জাতি। এরা এই প্রাচীন বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এরা পারস্য উপসাগরে বেহেরিণ দ্বীপে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছিল, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়েছে। আবার ঐ স্থাপত্য-রীতি অনুযায়ী মাকরাণেও, বর্ত্তমানে পীরের আস্তানা বলে পরিচিত কতকগুলি মুসোলিয়ম আছে। ইহাতে মনে হয় যে এই পণিদের এই স্থানেও উপনিবেশ ছিল। বিশেষতঃ বেদের বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে যে তাহারা পর্ব্বত দ্বারা রক্ষিত ছিল এবং তারা সম্পত্তিশালী ছিল ; ইহাতে মাকবাণ অঞ্চলের সঙ্গে এই বর্ণনা খুব সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। মাকরাণ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান ছিল। ইহা প্রাচীনকালে ব্যবসার কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এরা ইন্দ্রসংস্কৃতির অনুগামী ছিল না। মাকরাণ নামটিও এদের প্রাচীন জলদেবতার সংশ্রব প্রমাণ করে। এদের জলদেবতাই মহাদেবী আফ্রোডাইটিস, আতারগাতিস বা ডরসেটা। এই দেবীর অর্দ্ধাঙ্গ মৎস্য এবং অর্দ্ধাংশ নারী। এই সংস্কৃতি ছিল হায়রোপোলিসের—ফিনিসিয় ও হিট্টাইটদের। এই আকৃতিটি ইহাদের মৎস্য টোটেমবাদের পরিচয়। টোটেম দেবতার অস্তিত্ব টোটেমবাদের প্রধান পরিচয়। এই টোটেম কখনও কখনও দেবতার বাহন বা পার্শ্বচর ভাবে পূজিত হয়, কখনও বা দেবতার অঙ্গরূপে পরিচিত হয়। মৎস্যকে এখানে এই মহাদেবীর অঙ্গরূপে পূজা

দেওয়া হচ্ছে। এই সংস্কৃতিটি ভারতের পুরাণেও বর্ণিত আছে। মকর বা মৎস্য ও জলদেবতা—গঙ্গার সংস্কৃতিটির সঙ্গে এই সংস্কৃতির সাদৃশ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মাকরাণ নগরীটিও এই সংস্কৃতিরই পরিচয়। লর্ড কার্জ্জন লিখেছেন মকর থেকেই মাকরাণের নামের উৎপত্তি। সুতরাং এই প্রমাণটিও ফিনিসিয় সংস্কৃতির সঙ্গে মাকরাণের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) বেদের উল্লিখিত রাসবেলা বা লাসবেলা শব্দটিও বিশেষত্বপূর্ণ। লাস শব্দ রাস শব্দের অপভ্রংশ। বেলা শব্দটির অর্থ সমুদ্রতীর অথবা নদীতীর। বেদের রাস নদী লাস নদীরই অপভ্রংশ। ঐ নদীর ধারেই মাকরাণ এবং হিঙ্গুলাতীর্থ। বেদের উল্লিখিত সরমা খরস্রোতা রাস নদী পার হতে পেরেছেন কিনা—ইহার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এই লাসবেলা নদী, যাহা হিঙ্গুলানদী, তাহা প্রাচীনকালে খরস্রোতা ছিল বলে বোঝা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই নদী খুব খরস্রোতা ছিল। আলেকজাণ্ডার ভারত সীমান্ত জয়ের পর বেলুচিস্থানের সমুদ্রতীর দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই নদীর ধারে আসার পর পর্ব্বত থেকে একটা বিরাট স্রোতবেগ তার সৈন্য বাহিনীর উপর পড়ে, এবং তার বহু সৈন্য এবং সমস্ত রসদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই কাহিনী ঐতিহাসিক।

এই নদী যে খুব খরস্রোতা ছিল তার প্রমাণ এখনও আছে। ঐ নদীর উৎপত্তি ঐ লাসবেলার উত্তর—পর্ব্বতে। এই পর্ব্বতের উপত্যকায়, নদীর নিকটে অসংখ্য প্রস্তর প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়—উহার নাম গেবর বাঁধ। ভ্রমণকারীরা বলেন যে উহার উদ্দেশ্য ছিল জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ। ১৫৯

নদীর সঙ্গে পণিদের সম্বন্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। এই বর্ণনার অনুরূপ নদী সমস্ত পারস্য ও বেলুচিস্তান অঞ্চলে আর দ্বিতীয় স্থানে পাওয়া যাবে না।

১৫৯ MOB & A. D. Mackenzic, p 426, 427 & 437

(৪) চতুর্থতঃ পণিদের দেশকে ভারতের বাহির বলা অসঙ্গত। মাকরাণ শুধু বৈদিককালেই নয়, চন্দ্রগুপ্তের সময়, ভারতেরই এবং পরবর্ত্তী মুসলমানদখলের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, ইহা ভারতের অন্তর্গতই ছিল।

## মহাদেবের সংস্কৃতি

ইতিপূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে ফিলিস্তিন জাতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহারা ক্রীট সভ্যতারই শেষ বংশধর। এই প্যালেষ্টাইনে মেকাল অর্থাৎ মহাকালের মন্দির ছিল এবং ইহার সংস্কৃতি ছিল মাতৃদেবতার সংস্কৃতি, সর্প টোটেমের সম্পর্কযুক্ত। যথাস্থানে ইঁহার আলোচনা করা হবে। এই দেবতা ক্রীটবাসীর ও ফিনিসিয়দের সংস্কৃতিরই পরিচয়।

## ভারতীয় নাম

H. C. Raichowdhury তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, "বৃহদাশ্ব, যজদাত্ত, সূর্য্যদত্ত প্রভৃতি নামের পরিচয় প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।" ইহা ফিনিসীয় প্রভাবের ফল। ১৬০

## শবদাহ প্রথা

স্কফিল্ড লিখেছেন যে ফিনিসিয়দের মধ্যে শবদাহপ্রথা ছিল। "গেজেরে এক প্রাক্‌সেমেটিক জাতি অগ্নিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিত। অবশ্য আমরা জানি যে, এর অনেক পরে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে কারমেল পর্বতের কাছে আথলিটে একটি ফিনিসিয় উপনিবেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। (Hist of Palestine and Syria, Olmstead ) গেজেরে এই প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধরেরা একটি গুহা ব্যবহার করত। দেখা গিয়েছে এখানে মৃত সংকারে নবজাতকের মৃত্যুর পর শবদাহ করা হয়েছিল।" ১৬১

১৬০ S. I. A.; H. C. Raichowdhury, p. 55।

১৬১ R. B. O. B.; Scoffield, p. 45.

## ফিনিসিয় লিপির মূল।

আরামাইক বা ফিনিসিয় সংস্কৃতির মূল সেমেটিক নয়, এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিম এসিয়ার যে সংস্কৃতি ও ভাষা আজ জগৎ জুড়ে বিস্তারিত, তাহার মূল যে সেমেটিক্ নয় উহা যে আর্য্য, তাহা "ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়াতেই বুঝা যায়। উহার কৃতিত্বকে ও সেমেটিক জাতির নামে বিশেষিত করা যায় না। এই ভাষাকে সেমেটিক মূল থেকে উদ্ভুত বলে প্রমাণ করা যায় না। ইহার লিপিও সেমেটিক লিপি নয়।

এলফ্যাবেটের মূল বলা হয় ফিনিসিয়। ফিনিসিয় জাতি যে সেমেটিক জাতি নয়, ইহা আমরা ভাল ভাবেই দেখেছি। ইহারা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তবাসী এবং এই অঞ্চলে সিন্ধুযুগে যে মূলভাষা ছিল, তাহাই এই ফিনিসিয় ভাষা ও লিপির জননী। ফিনিসিয় এ্যালফাবেট সৃষ্টির মূলে ছিল কীলক লিপি। ইহা পশ্চিম এসিয়ার সর্ব্বজনীন লিপি। হিট্টাইট ব্যাবিলনীয়দেরও রার্জকার্য্যে এই লিপি ছিল। পাথরে অথবা মাটির চাকতিতে লিখিতে হলে এই রকম লেখাই হয়। হিট্টাইটদের চিত্রলিপিও ছিল।

চিত্রলিপির ক্রমবিকাশ ধারা নির্ণয় করা যায়। সিন্ধুর লিপির বিকাশ দেখা যায় ইলামী, ক্রীট এবং হিট্টাইট লিপিতে। ফিনিসিয় লিপিতে সিন্ধু তথা হিট্টাইট লিপির চিহ্ন নিয়ে, কাজের সুবিধা করার জন্য, ভাবের সংক্ষিপ্ত আকার দান করা হয়েছিল। এটা হল ভাবের Short hand : প্রচলিত Short hand হচ্ছে ধ্বনিতাত্ত্বিক Short hand. ভাবের Short handকে সাঙ্কেতিক চিত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ভাবের সংক্ষেপ হলেও মূল লিপির রেখাচিত্র, মূল সিন্ধু তথা হিট্টাইট লিপি থেকেই অধিকাংশ গৃহীত হয়েছে। ফিনিসিয় লিপির ২২টি অক্ষরের মধ্যে অধিকাংশ অক্ষরই সিন্ধুর অক্ষর থেকে গৃহীত।

ডাঃ হ্রুণজি হিট্টাইট লিপির পাঠোদ্ধার করে যশস্বী হয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সিন্ধু লিপিতে চিত্রাক্ষর ও ধন্যাত্মক অক্ষর—দুইই আছে এবং তিনি সিন্ধুলিপি ও হিট্টাইট লিপির একাত্মতা দেখতে পেয়েছেন।

## ডাঃ হ্রুণজির মত

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,

"B Hronzy has recently, (1953) offered quite a new thing about the origin and early history of the people of Sindh and the Punjab, who built up Mohenjodaro, Harappa and other sites. He calls the builders of Sindh and Punjab cultures as Proto Indians and thinks that they are a branch of the Indo-European-speaking Hittites of Asiaminor with an admixture of local Asianic elements, (now Indo European) like the Caspian suberio Hurrites This mixed Proto-Indian people with its Indo-European language, allied to Hittite, brought its religion and culture and elements of hierogiyphical writing from Asiaminor and built up the great prehistoric culture of Punjab & Sindh The Proto-Indians flourished through trade with the near East and betwen 2000 to1500 Bc. Dravidian Speakers from the N. W. of India came down upon them and destroyed their culture, and their towns. This Dravidian barbarians of the Proto-Indians were in possesion of the Country, when between, 1500 to 1200 B. C. equally rude Semi-

nomad Vedic Aryans came into the field and established themselves as conquered over all the Pre-Aryan population."

উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ হ্রুণজি সিন্ধুলিপির মৌলিকত্ব স্বীকার করেছেন। ইহাকে তিনি আগেকার পণ্ডিতদের মত দ্রাবিড় অথবা বাহিরের আর্য্যআক্রমণ বলে অভিহিত না করে হিট্টাইট সভ্যতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তার এই হিট্টাইট সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাগ্বৈদিক সভ্যতা বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এই কথা বল্লেই গোলমাল মেটে না; আর্য্য বা দ্রাবিড় আক্রমণতত্ত্বটাকে খাপ না খাওয়ালে পূর্ব্বীয় পণ্ডিতদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না বলে তিনি আবার পর মুহূর্ত্তে "বর্ব্বর দ্রাবিড় ও মধ্য এসিয়ার বর্ব্বর আর্য্যদের পর পর ভারত আক্রমণ" করার গল্পটি বজায় রেখেছেন।

বলা বাহুল্য শেষের এই দুইটি তাত্ত্বিক গল্পের যুক্তি আমরা ইতিপূর্ব্বে খণ্ডন করেছি। এই যুক্তি অনৈতিহাসিক, অপ্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সুনীতিবাবু আরও বলেছেন,—

"Hronzy's Conclusions are based on assumptions that Sindh, and Punjab script and its languages (can be explained) by the Hieroglyphic Hittite script of Asiaminor and the Indo-European speech of Hittites. All these assumptions are highly speculative and some of these linguistics and cultural interpretations of Hronzy (His greatness as an investigator in having diciphered successfully the ancient Hittite script and read the language correctly, being always admitted) seem not to be warranted by actual facts, linguistic and otherwise. It still remains an open one." ১৬২

---

১৬২ All India Oriental Conference Pres. Address, p. 14, 15, 16.

সুনীতি বাবুর পক্ষে হ্রুজ্নির সিন্ধু সভ্যতাকে ভারতীয় এবং উহার ভাষাও ভারতীয় বলে মেনে নেওয়ার দুটি আপত্তি, আছে (১) ভাষা তাত্ত্বিক (২) অন্যান্য বিষয়ে।

(১) ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়ে আপত্তির কোন যুক্তি নাই কেননা এখনও ভাষাটির পাঠোদ্ধার হয় নাই। পাঠোদ্ধার না হলে তার বিষয়ে আপত্তির কোন অর্থ হয় না। (২) দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় বস্তু একমাত্র সাংস্কৃতিক কারণ। ডাঃ ডিরিঞ্জারের আপত্তির ভিত্তিও এই একটি মাত্র কারণ,—তিনি লিপির বাহ্য সাদৃশ্যটি মানেন না।

সুতরাং এখানে এদের উত্তর দিতে হলে দরকার সিন্ধুর লোকগুলির সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক বিরোধী যুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে। ভাষার আলোচনার মধ্যে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জাতিগুলির লিপি এবং ভাষা আলোচনা করলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে। হ্রুনজির গবেষণাকে স্বীকার করেছেন অনেকেই, কারণ তিনি হিট্টাইট লিপির পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। তিনি হিট্টাইট লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির আকৃতিগত সাদৃশ্য পেয়েছেন।

আমাদের আলোচ্য—হিট্টাইট তথা ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা—সিন্ধুরই ক্রমবিকাশ। সুতরাং এখন শুধু সিন্ধুর ভাষার সঙ্গে হিট্টাইট ভাষার সাদৃশ্যটিই আমাদের দরকার। হ্রুনজির কাছে শুধু ঐটুকু পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

## হ্রুনজির কাছে কতটুকু গ্রহণীয়

হ্রুনজি বলেছেন যে হিট্টাইটরাই সিন্ধু সভ্যতায় মূল স্রষ্টা। এটা প্রমাণ করার মত তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক প্রমাণ নাই। অক্ষরের সাদৃশ্য দিয়ে মূল বিষয় গুলি, যাহা ইতিহাসের মেরুদণ্ড তাহা উলটান যায় না। নৃতত্ত্বের জাতিতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি হ্রুনজিকে এ বিষয়ে সমর্থন করে না।

সিন্ধু সভ্যতা যে সর্ব্বপ্রাচীন সভ্যতা—এ বিষয়ে সকল শ্রেণীর পণ্ডিতেরই সমর্থন আছে। সিন্ধু সভ্যতা সর্ব্ব প্রাচীন—ইহা আমাদের আগেই প্রমাণ দেওয়া আছে। এখন সিন্ধুর লিপির সঙ্গে হিট্টাইট লিপির সাদৃশ্যের প্রমাণ হ্রুনজির কাছে পাওয়া গেল। বাঁকী যাহা, তাহা হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য। এই বিষয়ে নৃ-তাত্বিক ও বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য আগে দেওয়া হয়েছে। এখন ভাষাতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে ইলামের বিষয়েই ধরা যাক

## ইলামীয় ভাষা ও লিপি

আসীরিয় ও সুমেরীয় সম্রাটদের অনেক চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ ডিরিঞ্জীর লিখেছেন,

"In the 2nd Mellenium B. C, cunieform writing and Akkadien language became the international language of the ancient civilised world. This has been proved from the 15th and 14th centuries,

In addition to summerians, Babylonians, Assyrians, many other peoples, and belonging to different races and, speaking different languages (the Elamites, the Kassites, the Hittites, the Hurrians, the Urartu and the Parsis took over cunieform writing. Some adopted it more or less successfully to their own languages, introducing necessary changes, others took it over without great modifications and some preferred to take it together with Akkadian language." (Alphabet p. 453)

ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রকে পশ্চিম

প্রাচীন সভ্য জগতে cunieform লিপি ও আক্কাদী বা কীলক লিপি সার্ব্বজনিক বলে গৃহীত হয়েছিল।

প্রাচীন ইলামীয়দের লিপি যে ধ্বন্যাত্মক এবং চিত্রাক্ষরীয় ছিল, এবং বাবিলনিয়ার মত ছয় শতাধিক অক্ষরও তাদের ছিল না—একথা ডাঃ ডিরিঞ্জারেরই কথা। সুতরাং বাবিলনিয়ার চিত্রলিপি কীলকাকৃতি হলেও ইলামের পক্ষে উহাকে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। আর পারসীদের কথা—তাদের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ ৮।৯ শতকের আগে নয়—একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরের আগেকার কীলক লিপি পারসীকগণের গ্রহণ করায় কথা ওঠে না। বিহিস্তান পর্ব্বতেও ব্যবহৃত তিনটী ভাষার মধ্যে একটি জেন্দ বা পল্লবী ভাষা, দ্বিতীয় ইলামী ও তৃতীয় আরামাইক। সুতরাং তিনটি ভাষা ব্যবহারের জন্য পারসিকগণের বাবিলনীয় কীলক লিপি গ্রহণের কথা বলা যায় না। তারা স্পষ্টতঃ জেন্দ ভাষা এবং তৎকালীন ব্রাহ্মী অক্ষরই ব্যবহার করেছে। ইলাম ও পারস্যের নিজস্ব ভাষা ও লিপি তো ছিলই। উহা সিন্ধু উপত্যকার ভাষা ও লিপির ক্রম-বিকাশজাত সংস্করণ মাত্র।

মিটান্নী, হিট্টাইট বা ব্যাবিলনীয়গণ ঐ লিপি সরকারী ভাবে ব্যবহার করলেও, তাদের নিজস্ব লিপি ছিল এবং সেই লিপি যে সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—ইহা ডাঃ হ্রুনজি প্রমাণ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ ডিরিঞ্জার কীলকলিপি ও ব্যাবিলনীয় বা আক্কাদীয় ভাষা সভ্যজগতে যে সার্ব্বজনিক ভাষারূপে গৃহীত হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাদপূর্ণ।

ডাঃ ডিরিঞ্জার আরও লিখেছেন, "Elam is the Biblical term corresponding to Babylonia and Assyrian—Elammus and to the Greek—Elammus. The later Greek term was Sushiane. At last in the new Elamite

text Khatauti, which was the name of one of the main tribes of Elamites."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় "খাটাউটি" শব্দটি "খাটটি" শব্দের অপভ্রংশ হতেও পারে। তাহ'লে হিট্টাইটদের "খাটটি" নামটার সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া সম্ভব।

ইলাম দেশ সুমেরের পূর্ব্বদিকে এবং গান্ধারের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বর্ত্তমান ইরাণের অন্তর্গত। ইহার প্রধান নগর বা রাজধানী সুসা। ইহার সভ্যতা সুমেরের সমসাময়িক। প্রাচীন কালে ভারতের উত্তর অঞ্চল থেকে সিন্ধুসভ্যতা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। ঠিক তেমনি ভাবে সুমেরের সভ্যতার সঙ্গেও এ দেশের যোগাযোগ ছিল। সিয়ালকের ভূতত্ত্বখননের ফলে জানা গিয়েছে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা। এদের চোঙ্গা শীল; মাটির চাকতির লিখন পাওয়া গিয়াছে। এদের অক্ষর নিজস্ব—প্রোটোইলামাইট লিখন। এ থেকে মনে হয় এদের সভ্যতা সুমেরীয়দের মতই প্রাচীন। এদের অঞ্চল থেকে কাসসাইট জাতি ব্যাবিলেন অনুপ্রবেশ করে বসতিস্থাপন করেছিল; এই কাসসাইটরা—এদেরই কোন উপজাতি বলে অনুমান করা যায়, কারণ দুর্ব্বল স্থানীয়অধিবাসী এরা নয়; যদি তাই হোত, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে এরা ব্যাবিলনের মত প্রতাপশালী শত্রু পরিবেষ্টিত রাজ্যের আধিপত্য সাময়িকভাবে নয়, প্রায় ৬০০ বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিল। কাসসাইটরা ছিল আর্য্যগোষ্ঠীর লোক। ইহারা তাদের সগোত্র ছিল। মিটান্নী ও কাসসাইট দেবতা ছিল সূর্য্য, মারুত, বোরিয়াস এবং দেবতার নাম আর্য্য ভাষারই পরিচয় দেয়। এরা ছিল কৃষিজীবি ও পশুপালক; ইলামের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। মাতৃগত সমাজ ছিল এদের। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইলামের উত্তরে কাসসাইট লুলুবি ও গুটি জাতীয়দের বসবাস ছিল, তারা ও ইলামীরা একজাতীয় মানুষ, ভাষাও তাদের একরূপ।" (ইরানের উপকথা, পৃ ২৩)

আককাডের রাজা সারগন (খৃঃ পূঃ ২৬৫০ ) ইলাম আক্রমণ করে উহাকে সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। পরে ইলামের রাজারা তাদের স্বাধীনতা উদ্ধার করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ইলামকে সেমেটিক বলে পরিচিত করা হয়েছে। সেমেটিক শব্দ সংস্কৃতিবাচক। উহা যে জাতি বাচক নয় একথা আগেই বলেছি। ইলামীদের নিজস্ব ভাষা এবং লিখন,—তাদের সঙ্গে সেমেটিক ভাষাকে পৃথক করে দিয়েছে। পরবর্ত্তীকালে আরব দেশের ও তার উত্তরে আমুরুর দেশই এই সেমেটিক ভাষার দেশ বলে পরিচিত। আসীরীয় সম্রাটদের সময়ে প্যালেষ্টাইন থেকে ইহুদীদের ইলামে নির্বাসিত করা হয়; সেই সময় এবং পরবর্ত্তী আস্সুর রাজাদের বেলায় কোন দেশের লোকের স্থানীয় বিশেষত্ব রাখা সম্ভব ছিল না। সমস্ত দেশটী আস্সুরীয় সংস্কৃতিভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল; রক্তের, ভাষার ও সংস্কৃতির কোন বিশেষত্ব ছিল না বললেই হয়। আস্সুর ও আক্কাড রাজত্বের আগে প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইলাম, অসেমেটিক বলেই প্রমাণিতহয়। সুমেরীয়দের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয়ের কাহিনীতে এদের ইতিহাস ভরা। এদের রাজা ছিল সুমেরের মত পুরোহিত। দেবতার নাম সুসিনিক। বনের মাঝে আশ্রমে তাঁর বাস। সেখানে রাজা ও পুরোহিতই প্রবেশের অধিকারী ছিলেন। বিজয় উৎসব কালে দেবমূর্ত্তি গুলি বাহির করা হোত। জনগণ তাদের শ্রদ্ধানিবেদন করত। এই ছিল রাজকীয় দেবতার কথা; জনসাধারণের ছিল মতৃসাংস্কৃতি। এই মাতৃদেবতা গ্রাম্যসংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং সর্ব্বপেক্ষা প্রাচীনতম। তিনি গৃহ বা কোন উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষতলে পুজিত হতেন। সুতরাং রাজার দেবতার সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ না থাকাই সম্ভব।

আস্সুররাজ আস্সুরবানিপালের হাতে ইলাম ধ্বংস হয়েছিল ষষ্ঠ শতকে। সিন্ধু সংস্কৃতির সঙ্গে সুমেরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এ আমরা

দেখেছি। ইলাম সিন্ধুর আরও নিকটবর্ত্তী। সুতরাং ইহাকে সিন্ধু সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না।

অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে আসুর রাজ্যের আগে, সেখানে কিকিয়া, আদাসী উসপিয়া নামের শাসক ছিল, তারা সুমেরিয়ান বা সেমেটিক ছিলনা।

নিনেভের প্রাচীন দেবীর নাম সৌসকা। ইনি হিট্টাইট ও মিটান্নীর দেবতা তেষপের পত্নী। সুতরাং অনুমান যুক্তিহীন হবে না, যদি বলা যায় আসুরের প্রাচীন অধিবাসী মিটান্নীরা ছিল। প্রকৃত পক্ষে পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় ইহা মিটান্নীদের বাসস্থান।

মিঃ জনও বলেন মিটান্নীদের নামের অধিকাংশ এলামাইট। সুতরাং এই সূত্রে এলামের সঙ্গে মিটান্নীর সম্বন্ধ প্রমাণ হয়। (ডোনাল্ড মেকেঞ্জি পৃ ২৭৮)। সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবের দ্বারা যে অনুমান হয়েছিল সেই প্রমাণের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে ইলামাইটরা বৈদিক ভারতের কৃষ্টির অন্তর্গতই ছিল। তারা সেমাইট নয়। পরবর্ত্তীকালে বাবিলনের সিংহাসনে রাজত্ব করায়, তাদের ভাষা আসুরীয় হয়ে যায়।

এদের রাজাকে পুরোহিত বলা হয়েছে। এই বিবরণ সত্য বলে মনে হয় না, কেননা রাজারা রাজধানীতে থাকেন আর বনে থাকেন দেবতা; ইহা সম্ভব হতে পারে না। এই অযৌক্তিক বিবরণের একটি মাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে। বনে যে আশ্রম থাকত উহা নিশ্চয়ই তপোবন। ঐ তপোবনে নিশ্চয়ই রাজপুরোহিত থাকতেন, যেমন বৈদিক রাজগুরুরা তপোবনেই বাস করতেন। রাজা গুরুর কাছে তপোবনে যেতেন। দেবার্চ্চনা বা যজ্ঞাদি মহোৎসব বৎসরে একবার হোত; যেমন ভারতে অনুরূপ ব্যাপার এখনও ঘটে। বাবিলনের মত রাজাই দেবতা বা পুরোহিত হলে, কখনই বনে আশ্রয় এবং লোকালয় থেকে নির্জনে সাধনার স্থান যেমন হয়, সেইভাবে গোপনতা পোষণ করা দরকার হোত না।

তারপর আর এক কথা—সুসা একটি বিরাটভাবে সুগঠিত এবং সুরক্ষিত দুর্গ—নগরী। এই রকম দুর্ভেদ্য দুর্গের অধিকারী হওয়া সিন্ধুসভ্যতার লোক না হলে, সে যুগে অসম্ভব বলে মনে হয়।

ইলাম ছিল মাতৃগোত্রীয় জাতির দেশ; সুতরাং নগরের অধিষ্ঠিত দেবতা ছিলেন মাতৃদেবী। তাঁর নাম সুসা। এই ইলামীদের সগোত্র—কেশী বা কাসসাইটরা ও মিটান্নীরা। মিটান্নীদের দেবতার নাম ছিল সৌসকা; সুসা থেকে ষ্ণক প্রত্যয়ে সৌসক হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে সৌসকা—সুতরাং মাতৃ সংস্কৃতিতে ইলামী ও মিটান্নীর সাদৃশ্য অনস্বীকার্য্য। এদের আবাসস্থলটিও একই স্থান—ইলামের উত্তর। সুতরাং মিটান্নীর মত এরা বৈদিক সংস্কৃতির সাক্ষ্যই দান করে। ইহাও উল্লেখ করা যায় যে মিটান্নীর রাজা দশরথের নামও ছিল সৌসাতার। মিঃ জন যে বলেছেন মিটান্নীদের নামের অধিকাংশই এলামীয়। যদি এটা তিনি ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বলে থাকেন তবে বলতে হয় ইলামীদের ভাষা মিটান্নীদের মতই বৈদিক ভারতীয়।

ইলামের সঙ্গে আর্য্যজাতীয় মিটান্নী ও কাসসাইটের শত্রুতা ছিল না। একটি ঘটনাতে এদের ঘনিষ্ঠতার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। ইলামের সঙ্গে সুমেরের বিবাদ প্রায় খৃঃ পূঃ আড়াই হাজার বছর থেকে। কখনও সুমের, আবার কখন ইলাম জয়ী হচ্ছে। আক্কাদীয়দের সঙ্গে এই একই ব্যাপার। এ্যামোরাইট, ব্যাবিলোনীয়দের সঙ্গে এই একই জয় পরাজয়ের ব্যাপার। তরপর খৃঃ পূঃ ১৭৬০ সালে ব্যাবিলন কাসসাইট অধিকারে আসার পর প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর আর ইলামের সঙ্গে কোন বাদ বিসম্বাদ নাই; ইহা নিশ্চয়ই কৌতূহল উদ্রেক করে। শেষের দিকে খৃঃ পূঃ ১১৬৮ সালে ইলাম, কাসসাইট—ব্যাবিলন আক্রমণ করে। ইহার কারণ আছে—-কাসসাইটদের সঙ্গে আসুররাজের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহাতেও ইলামের সঙ্গে কাসসাইটদের মনো-মালিন্যের কারণ ছিল না। অপর পক্ষে আসুররাজ ইলামকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছে; তাতেও ইলাম বিচলিত হয়

নাই। যখন আসুররাজের কন্যার পুত্র ব্যাবিলনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হল এবং আসুররাজ তাহার অভিভাবক হন, তখন ব্যাবিলনের কাসসাইট প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ঐ রাজপুত্রকে হত্যা করে; পুনরায় আসুররাজ তার দ্বিতীয় দৌহিত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ব্যাপারই ইলামের, কাসসাইট-ব্যাবিলন আক্রমণের হেতু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বভাবতঃই ইলাম কাসসাইট—ব্যাবিলনের সঙ্গে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ইহা স্বজাতীয়ত্বের সহানুভূতি ছাড়া আর কি হতে পারে?

## বৈদিক রাজাদের দিগ্বিজয়ে ইলামের পরোক্ষ সাহায্য

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, দিবোদাস প্রভৃতি রাজার দিগ্বিজয়ের কথা বর্ণনা করা আছে।

এই সময় ভারতের সীমানা, সুসার প্রান্তদেশেই ছিল, ইহা মান—চিত্রের দিকে নজর করলেই বুঝা যায়। পরবর্ত্তী কালে হেরোডোটাস টালেমী প্রভৃতির সাক্ষ্যও আর্য্যসংস্কৃতির সীমানা এতদূর বিস্তৃত বলে প্রমাণ করেছে। এই দিগ্বিজয়ে আর্য্য রাজারা কার উপর আক্রমণ চলিয়েছিলেন? এইরূপ শত্রুদেশ তো ইলাম নয়। ইহা একমাত্র বিজাতীয় ব্যাবিলনই এবং আসুরিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? খৃঃ পূঃ ২০০০ শতকের কাছাকাছি সময়ে আমরা হিট্টাইট, মিটান্নীর নড়াচড়া দেখি এই অঞ্চলে—ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। এই সময়ের কাছাকাছিই বৈদিক দেবতাদের পশ্চিম এশিয়ায় অনুপ্রবেশ হয়েছে। এই সময়টিই হল প্রায় হাম্মুরাবির সমসাময়িক। এই সময়ের কাছাকাছিই আর্য্য অভিযান হয়েছিল আকস্মিকভাবে আসীরিয়া ও বাবিলনের উপর। সুতরাং ঋগ্বেদের মধ্যে মিটান্নী, কেশী প্রভৃতির উল্লেখ, উর প্রভৃতি উপনিবেশের কথা, যা, ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, তাহা সম্ভবতঃ মিটান্নী, প্রভৃতি অভিযানসমূহের বর্ণনাই হবে। বৈদিক দিগ্বিজয়ী রাজারা

যাদের রাজ্য ইরাণ, ইলাম প্রভৃতি সৌভ্রাতৃক দেশ নিয়ে সুবিস্তৃত ছিল, উহাদের প্রতি তাহাদের সৌভ্রাতৃক টান ছিল। উহাদের বাদ দিয়ে তারা দিগ্বিজয় সম্পন্ন করতে পারেন না। উহারা অবশ্য তাদের সহযোগী ছিলেন।

মিটান্নীরা লৌহাস্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার করেছিলেন; বৈদিক রাজারাও লৌহাস্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার করতেন। অথর্ববেদে লৌহাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের সকল মন্ত্রই সমকালীন নয়। কতকগুলি খুব প্রাচীন, তাম্রযুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার নিকটবর্ত্তী, আর কতকগুলি লৌহযুগের মধ্যে পড়া সম্ভব। লৌহযুগই দিগ্বিজয়ের যুগ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরের সমসাময়িক যুগ। এ সময় ভারতীয় রাজারা দিগ্বিজয়ে লৌহাস্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার করতেন।

## ননা সংস্কৃতির সঙ্গে ইলামের সম্বন্ধ

হিংলাজের ননা দেবী ছিলেন সুমেরেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাহার নাম ঋগ্বেদে আছে, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইহাও সম্ভব হতে পারে, এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৫০০ শতকের আগে ঋগ্বেদের ঐ সুক্ত রচনা হয়েছে।

"সুসাতে ননাদেবীর ভ্রমর-লাঞ্ছন পাওয়া গিয়েছে।" (ভাঃ শঃ, উপেন্দ্রনাথ দাস পৃঃ ২৩)।

"সুসায় এই দেবী ননাইয়া নামে পূজিত হতেন।" ১৬৩

এই ননাসংস্কৃতির প্রমাণে, ঋগ্বেদের কালের পূর্ব্বে, প্রাগ্বৈদিক যুগের সঙ্গে ইলামের যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ ডিরিঙ্গার লিখেছেন, "Elam is the name of ancient country north of Persian Gulph, to the east of lower Tigris, which corresponds roughly with the modern

১৬৩ ইরাণী উপকথা, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩।

Persian province of Khuzisthan. Its early history is closely interwoven with that of southern Mesopotemia.

That country was inhabited by non-semitic and non-Indo-European tribes who spoke agglunative dialect, apparently related to Caucasious group of languages.

At a later period, the Elamites abondoned their indigenous script and adopted Babylonian Cuneiform writing. There are only a few word signs and determinatives, a greater part of the signs being syllabic; number of all characters is 113, while the number of syllabic signs is over 80." (Alphabet, p. 55.)

উক্ত উদ্ধৃতিতে ডিরিঞ্জার সাহেব বলেছেন, (১) এলামাইটরা non-Indo-European (২) এদের ভাষা agglunative (৩) এরা নিজেদের লিপি ত্যাগ করে ব্যাবিলনের লিপি গ্রহণ করেছে। (৪) বর্ণসংখ্যা ১১৩, Syllableএর সংখ্যা প্রায় ৮০টি।

ডাঃ ডিরিঞ্জারের প্রথম আপত্তির উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছি। (১) ইলামাইটগণ সিন্ধু-সংস্কৃতিরই অধিকারী। ডাঃ ডিরিঞ্জার বলেছেন যে এলামী ভাষাও Caucasious group of languagesএর সম্বন্ধে এক। সুতরাং ইহাকে Indo-Iranian groupএর অন্তর্গত করায় বোধ হয়, আর কোন আপত্তি নাই। ইতিপূর্বে ক্রীট ও ফিনিসিয়দের প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে যে ঘুঘু, মাতৃসংস্কৃতি ও স্বস্তিকা সীলমোহর ইলামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে ডাঃ মোডের হরাপ্পা কালচার পাঠ করতে অনুরোধ করি।

(২) এর ভাষা বৈদিক কালের পূর্ববর্তী। প্রত্যয়, বিভক্তি

প্রভৃতি প্রয়োগ, ভাষার বিশেষ উন্নত অবস্থা না হলে হয় না। বৈদিক ভাষার আগে যখন সিন্ধুভাষা ছিল তখন ঐ ভাষা agglunative থাকা অসম্ভব নয়। ইলামীয় ভাষা যদি agglunative হয়েই থাকে তবে উহা প্রাচীন সিন্ধু ভাষারই রূপ। বৈদিক ভাষার প্রথম অবস্থা যে agglunative ছিল তাহা হরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতি দ্বারা দেখিয়েছি।

(৩) এরা যখন ব্যাবিলনের লিপি গ্রহণ করেছে, তখন ব্যাবিলোনীয় ভাষা পশ্চিম এসিয়ার সার্বজনীন ভাষায় প্রবর্ত্তিত হয়ে পড়েছে। ব্যবসায় ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ভাষাই তখন উহা। ইহাদের নিজেদের কাজে নিজ নিজ ভাষায়ই চল্‌ত।

(৪) সিন্ধু ভাষার অক্ষর ১১০টি এবং সিলেবল্ প্রায় ৮৬টি —ইহাই ডাঃ হুনজির মত। ইলামীয় ভাষা ইহার পরবর্ত্তী—সুতরাং ইহার অক্ষর ১১৩ এবং সিলেবল্ ৮০ হলে, (ডাঃ ডিরিঞ্জারেরই মত)—এই দুই লিপি যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাষা হলেও হস্তলিপির বৈষম্যের জন্য ইহার রূপ বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তন লাভ করে। আর স্থানকাল পরিবর্ত্তনে, এই পরিবর্ত্তন আরও বেশী হয়ে যায়। এদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতাকে বুঝতে হলে মৌলিক চিত্ররেখা ও ভাষা তত্ত্বের সাদৃশ্যটুকু দ্বারাই উহা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে; সব দিক দিয়ে আঙ্গিক সাদৃশ্য পাওয়া অসম্ভব। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাহায্যেই ইহার সর্বাঙ্গীন সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতে পারে।

ইলামের অবস্থান প্রাচীন ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে। বেলুচিস্থান ও কম্বোজ প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত এবং বৈদিক আর্যদেরই বাসস্থান ছিল। আবার এই অঞ্চলই সিন্ধু সভ্যতার লীলাভূমি। সুতরাং ইলামকে অন্য সংস্কৃতির অন্তর্গত করার ভৌগোলিক কারণেরও অভাব আছে। এই ইলামের মধ্য থেকেই

হুরাইট, মিটান্নী, কাসসাইট তথা হিট্টাইট এবং হিকশোস সভ্যতার উদয় হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আসুরীয় ও ব্যাবিলনীয় যুগের পীড়নের ফলে এরা পশ্চিম এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা—প্রকৃতপক্ষে ইলামের মাধ্যমে সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয়স্তরের তথা আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি।

## ক্রীট, ইলাম ও সিন্ধুর সংস্কৃতির সাদৃশ্য

মাতৃদেবতার সংস্কৃতিটি সিন্ধু উপত্যকার। আদিপিতা ও আদিমাতার সংস্কৃতি এই অঞ্চলের প্রাচীনতম গ্রাম্যসংস্কৃতি। সিন্ধু উপত্যকার বৈশিষ্ট্যটি ক্রীট ও ইলামেও দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। এমন কি সুমের সভ্যতারও গতি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল। এই জন্যই সিন্ধুর সঙ্গে ক্রীটও ইলামের সংস্কৃতির সাদৃশ্য নির্ণয় করা সহজ।

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, "ক্রীটের মাতৃদেবতার সঙ্গে ঘুঘু এবং সাপ সম্বন্ধযুক্ত ছিল।" এই সংস্কৃতি হিট্টাইট ভাস্কর্য্যে দেখা যায় এবং এশিয়া মাইনরের দেবী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে হয়। ১৬৪

হাইনৎসে মোডে এই সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন—"এই রকম গ্রাম্য সংস্কৃতি সিন্ধুর উত্তর পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে ইরাণীয় পূর্ব উত্তর এবং পশ্চিম উত্তর মেসপটেমিয়া, সাইপ্রাস দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সংস্কৃতির ঐক্য সম্বন্ধ ছিল।"

"গ্রাম্য সংস্কৃতি খৃঃ পূঃ ৪র্থ সহস্রক থেকে সিরিয়া, উত্তর মেসপটেমিয়া, ইরাণীয় উপত্যকা, পূর্ব ইরাণীয় সীমান্ত এবং ভারতের সীমান্ত অংশগুলি ব্যাপ্ত করে বিরাজমান ছিল। এই সকল স্থানে এমন কতকগুলি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যাতে এই রকম আর্থিক ও

১৬৪ মিথ ব্যা, ডোঃ. ম্যাকেঞ্জি পৃঃ ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩ ও ৪৩৪

সামাজিক সাদৃশ্য—যেমন মৃৎপাত্রের কৌশল, সীলমোহর এবং মাদুলী নির্মাণ, মুক্তা, বাসনপত্র ধর্ম্মীয় বিশ্বাস—যেমন উর্বরতাশক্তি এবং মাতৃদেবতার অর্চনা একই রকম।

"ক্রশ ( সরল এবং ধাপযুক্ত ), স্বস্তিকার জটিল বেষ্টনীর নমুনা ভারতের ষ্ট্যাম্পসীলের নিদর্শনরূপে ব্যবহৃত। ইহার ঠিক জুড়ি পশ্চিম ইরাণ, সিরিয়া ও ক্রীটের আবিষ্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য-পূর্ণ।"

"কারকেমিশের একটি খোদিত পাথরের একজন মানুষকে জানুর উপর উপবিষ্ট এবং জন্তু পরিবেষ্টিত দেখা যায়। ইহা ভারতীয় মূর্তির পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে পশ্চিমী শিল্পে, ভারতের প্রথাটাই যাহা সমানভাবে শরীরের নীচে রেখে বসার কায়দা, তাহা দেখা যায় না। আমি জানি খাফাজিতে আনীত সুমেরীয় মূর্তিতে এই ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়।" ১৬৫

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এবং হিংলাজ তীর্থে ননা মাইয়ের সংস্কৃতি থেকে প্রমাণ হয় যে সিন্ধু উপত্যকার যোগী শিব ও আদিমাতা ননাদেবী পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার সমাজ ও ধর্মের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত। এই সংস্কৃতি সিন্ধু উপত্যকার প্রাক্‌নাগরিক সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়ে সিন্ধু সভ্যতা ও পরবর্তী সভ্যতাগুলির মধ্যে ওতোপ্রোতো ভাবে বিরাজ করছে।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ মোডের বেহেরিন দ্বীপও এরিদু থেকে দিলমুন এবং মাক্কানের সঙ্গে ব্যবসার কথার বিষয় উল্লেখ করা যায়। দিলমুন নামটির সূত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, মাক্কান যে বেলুচিস্তানের মাকরাণ"—তাতে সন্দেহ নাই। পণিগণ সুমের থেকে ভারতের মাকরাণের সঙ্গে ব্যবসা করত।

১৬৫ Harappa Culture, H. Mode, p. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 & 12.

## ক্রীট ভাষা

ডাঃ হ্রুনজি ক্রীট লিপি পরীক্ষা করে বলেছেন যে উহা ইন্দো-ইউরোপীয়ান। এই লিপি ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ইহা হিট্টাইট কীলকলিপি ও চিত্রলিপির মধ্যবর্তী অবস্থার সংস্কৃতি। হ্রুঞ্জির ইন্দো-ইউরোপীয়ান শব্দটি সিন্ধু উপত্যতার প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতার অবস্থাই নির্দেশ করে।

সুতরাং উক্ত আলোচনায় ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে—ক্রীট ও ইলাম যে সিন্ধুরই স্মৃতি বহন করছে তাহা প্রমাণিত হল।

## হিট্টাইট ভাষা ও লিপি

হিট্টাইট জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে ইহাকে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং সিন্ধু সভ্যতার আক্রমণকারীরূপে শাবস্ত করায়, সেটাকে ইতিপূর্ব্বে অনেক নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে খণ্ডন করা হয়েছে। হিট্টাইট জাতি যে এসিয়া মাইনরের ও উত্তরইউরোপের সংযোগস্থল থেকে আগত নয় এবং এদের ভাষা ও সংস্কৃতি যে সিন্ধুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—এই বিষয়ে নিম্নে আরও আলোচনা করা হচ্ছে।

হিট্টাইটদের পূর্ব্ব থেকেই সিন্ধু উপনিবেশ যে পশ্চিম এসিয়ায় গিয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। সুমের ক্রীট ও ইলাম এই সময়ের উপনিবেশ। এই সময়ের সিন্ধুসংস্কৃতির ম্লাতৃ ও পিতৃ পূজা, গাছ, সাপ, ঘুঘু ও জল—এই সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে এই উপনিবেশগুলি জড়িত। এই সময় যজ্ঞসংস্কৃতির উদ্ভব হয় নাই। ভাষার কোন বাঁধন নাই। ভাষা aggluenative.

তারপর এল আদিবৈদিক সংস্কৃতি এই সময়কার ঔপনিবেশিকদের মধ্যে। ইহা পশ্চিম এশিয়ায় হিকশোস, হিট্টাইট, ফিনিসিয়, মিটান্নী, হুরাইট ও কাসসাইট সংস্কৃতি। এদের ভাষা এবং ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ

ইত্যাদি কৃষি-সৌভাগ্যের দেবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ততাই এদের বৈদিক সমসাময়িক কালের পরিচয় দান করে। তবে ভারতীয় যজ্ঞপদ্ধতি এরা জান্‌ত না। এই যজ্ঞপদ্ধতির সঙ্গে বৈদিক ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপির সম্বন্ধ ছিল। ব্রাহ্মীলিপি ধ্বনিতাত্ত্বিক ও উন্নত প্রকৃতির। ইহার মূলে অবশ্য এদের ভাষা ও লিপিও ছিল। এই সমসাময়িককালে অর্থাৎ সিন্ধুর দ্বিতীয় বারের উপনিবেশের সময়ই, ভারতের মধ্যে সিন্ধু ও অঙ্গা উপত্যকায় আদিবৈদিক সংস্কৃতির সঞ্চরণ হয়। ইহারই ফলে যজ্ঞ পদ্ধতির বিস্তৃতি বিকাশ এবং বিরাট বৈদিক ও বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব। এই দ্বিতীয় উপনিবেশ পরে সুরাসুর বিচ্ছেদের সময় নির্দ্দেশ করে। এই আদিবৈদিক সংস্কৃতিতে মন্ত্রের বিশুদ্ধি ও যজ্ঞ-পদ্ধতির বিস্তৃত আচরণের আরম্ভ মাত্র, তখনও বিকাশ হয় নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

## হিট্টাইট ভাষা

ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, "The ritual texts of Bagzokai Contains many passages in 3 other languages, one of them, "Luile" or Laurian, at first mistakenly regarded as a Finnougrian languages (closely related to Hittite but it seems to show a still greater influence of the indigeneous language of the Asia minor; Hurrian is another native language. It is an Indo-European speech, which very little differs from the language of the Mittanti (It is perhaps the same), while the 3rd language Hattec was the non-Indo European language used by the indigenous people of Asia minor, and belonged probably to the Caucasian group of languages.

American scholar Sturtevant holds that the Hittite and the Indo-European speech discended from a still earlier stock which he calls Indo-Hittite. According to *Sturtevant*, Hittite alone preserves certain archaic features, while the historic Indo-European languages agree in the same." ( Alphabet, p. 90. )

উক্ত উদ্ধৃতিতে হিট্টাইটের যে কয়টি শাখার উল্লেখ করা হয়েছে—উহাদের ইন্দো-ইউরোপীয় স্থানীয় ভাষা বলা ও হুরিয়ান ভাষাকে মিটান্নী ভাষা বলা হয়েছে। সুতরাং হিট্টাইটদের ভাষাকে—ইউরোপের বা রাশিয়ায় কোন উচ্চ সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত জাতির ভাষার সঙ্গে পরিচিত করা যায় নাই। বরঞ্চ ডাঃ ডিরিঞ্জার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে হুরিয়ান শাখা মিটান্নীর ভাষা। এই মিটান্নী জাতি ইন্দো-ইরাণী জাতীয় এবং ইহাদের বিষয় বেদে উল্লেখ আছে। ইহারা আর্য্য। তারপর Sturtevant সাহেবের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে ইন্দো-হিট্টাইট ভাষা হিট্টাইট ভাষা অপেক্ষা আরও প্রাচীন এবং উহা প্রাচীনতর ভাষা থেকেই উদ্ভুত। ইহাতে হিট্টাইটদের ভাষার সংশ্রবই প্রমাণিত হয়। পরের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের বহুতর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। Sturtevant-এর ইন্দো-হিট্টাইট ভাষা সিন্ধু উপত্যকারই ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এখানেও ইউরোপীয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

Encyclo Brit. লিখেছেন,

"The Hittite shape of many of the most elementary lexical items is consistently hidden by the Scribal shorthand of Sumerian ideograms.

Basic comparison, "genu"-knee (Latin gunu) "Pad" —foot (Ger pad). Suptan (he sleeps) Sans. স্বপিতি"

উক্ত শব্দগুলি সমস্তই ভারতবর্ষীয়। ইহাকে European সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় না।

জার্ম্মান গ্রীক প্রভৃতি ভাষার শব্দের মত এই ভাষার সাদৃশ্য আছে বলে ইহাকে Indo-European বলা যায় না, কারণ ঐ শব্দগুলি মূলতঃ ভারতীয় ভাষারই সঞ্চরণ। ল্যাটিন বা জার্ম্মান ভাষার সঙ্গে হিট্টাইট ভাষার সংশ্রব প্রমাণিত হলে উহাকে ইটালী বা জার্ম্মানী থেকে আগত বলে প্রমাণ করা যায় না; উহা যেখানে সংস্কৃত ভাষার মূল সেই ভারতবর্ষেরই অর্থাৎ সিন্ধুর কাছে ঋণী বলেই প্রমাণিত হয়।

## জাতিতত্ত্ব

ডাঃ ডিরিঙ্গার লিখেছেন,

"In short linguistic and ethnic evidence suggest that Asiaminor was inhabited originally by the Hattee people, speaking non-Indo European tongue and belonging to the Armenoid type." (Alphabet p. 90)

উক্ত উদ্ধৃতিতে আর্ম্মানি জাতির সংশ্রবের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আমরা দেখাব যে আর্ম্মানি জাতির মূল ভারতীয় উপনিবেশ এবং ইহারা মিটান্নী সংশ্রবযুক্ত।

এই ভাষা আর্ম্মানয়েড হলে non-Indo-European tongue বলা স্পষ্টতঃ ভ্রান্তিপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

## বৈদেশিক দেবতা

En. Brit. লিখেছেন, "Foreign gods specially Mesopotamean and occasionally Cannanite are found in imported rituals and myths, many such are included in state treaties as devine witnesses for the opposite parties. The best known examples are Indo-Iranian

Gods—Indra, Mitra, Varuna and 2 Nasatyas in the Metiwaza treaty. They belonged to the Parthian, worshipped by Aryan rulers of Mittani (p. 559) ১৬৬

ডাঃ ডিরেঞ্জার এখানে এই ইরাণী দেবতা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলা যায় যে বিদেশী দেবতার কথা বলা হয়েছে, উহা ঠিক নয় কারণ বিদেশী দেবতা হলে কি কখনও তাঁহাকে সাক্ষী করে দলিলে স্বাক্ষর করে শপথ করা হয়? ইহা হিট্টাইটদের নিজস্ব দেবতা ছিল। হিট্টাইট দেবতা তেষব বৈদিক ও সিন্ধুর মহাদেব ও শুসামাতা বা "মা"। এই বিষয়ে হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর গবেষণা থেকে ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করেছি।

## Cults

En. Brit. লিখেছেন, "The layout of the Vast temple in the lower city of Hattusis agrees with the inferences from the text. Around a paved Central court, more ranged rows of Vestibules, antechamber, secristes and store rooms and between their Sancfum (Cells containing the cult and state) are usually made of precious metal and rare wood and represented the divinity with his customary cult, attributes, animals and attendants, of these types lies huwazi stone and a much used cult stele with symbolic carvings."

উক্ত উদ্ধৃতির বিবরণ সিন্ধুসভ্যতার এবং আধুনিক ভারতের যে কোন প্রান্তীয় মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৬৬ Encyclo. Britan. page 557 ; Hittite.

এই সংস্কৃতিটি প্রাবৈদিক এবং অযাজ্ঞিক। ইহা পূজার সংস্কৃতিতে এখনও ভারতে প্রচলিত আছে।

## Culture

Ency. Brt. লিখেছেন, "There is a general spirit of enlightened respect of human life and dignity, reflected specially in the penal regulation of oriental law. In contrast to the semitic principles of tallow and the general retribution mentality of the Mesopotemian and Mosaic Code, restitution is the dominant means of the rulers. As in Mesopotemia, premeditated murder is still essentially extra-judicial to be avenged by blood feud or composed privately at the discretion of the surviving kinsmen, the previledge of bond of blood, corresponding to the God of Dueteronomy is expressly stated in the edict of Telephim." ১৬৭

উক্ত উদ্ধৃতিতে সেমেটিক বর্ব্বরতা এবং আর্য সভ্যতার পার্থক্যটির সুন্দর প্রভেদ দেখান হয়েছে। এই প্রমাণটি হিট্টাইটগণের আর্যত্ব সংশ্রবেরই সাক্ষ্য দেয়।

## শবদাহ

Ency. Brit. লিখেছেন, "Royal burial entailed cremation of the body on a pyre on the day or night of the death. On the following date, the fire was extenguished with beer and wine, the bones

১৬৭ En. Brit. Hittite, p. 550.

were gathered and dipped in a silver Jar containing oil wrapped in linen and another fine cloth and placed in a chair. In the course of elaborate ceremonies lasting a total of 13 days, they were subsequently deposited on a funeral couch inside the stone house. These usages are curiously reminescent of the Homeric rites fcr Patreches and Hector.

In the necropolis for ceremonies among the rocky outcrops between Bogzecoi and Vazelikeys cremations seem to have predominated from the earliest times, but mere interment is also found. The ashes were deposited in urns or jars, among animal skeleton, found with many burial heads of horses predominate." ১৬৮

উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা গেল হিট্টাইটদের মৃৎসংকারের শোক উৎসব বা অশৌচ ১৩ দিন ছিল। ইহা ভারতীয় ক্ষত্রিয় জাতির অশৌচকাল। আর হোমারের বর্ণিত সংকারের রীতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্যটিও গ্রীক জাতির আর্যত্বের একটি বড় সাক্ষ্য।

সাধারণ লোকের পক্ষে যে শবদাহ প্রথা—উহাও সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভস্মাধারের ব্যবস্থাটিও সিন্ধুসভ্যতারই মত ঘোড়ার বা অন্যজন্তুর মস্তক মৃতের সঙ্গে পরিচর্য্যার জন্য পরিকল্পিত হওয়ার প্রথা—ইহা সিন্ধুসভ্যতারই প্রথা। বৈদিকদেরও এই প্রথা ছিল। ইহা ইতিপূর্ব্বে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৮ Ency. Brit, Hittite, p. 550-557,

# ভাষা

ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, "The number of Signs is about 222 but according to Meriggi the Hittite Heirogly-phic system numbered as many as 419 symbols. They are purely idiographic and partly phonetic. The greater part of the characters are idiograms, for instance the symbols are for god, kings, princes, great, City, Sacrifice. land or signs representing animals plants, parts of the body are employed either as word signs or determinatives ; 57 signs—according to Gild a syllabic value." ১৬৯

"খৃঃ পূঃ ১৩৮০ শতকে হিট্টাইট ও মিটান্নীদের সঙ্গে বিখ্যাত সন্ধি হয় যাহাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য সাক্ষী করে সন্ধি করা হয়েছিল। রথের দৌড় খেলা যাহা মিশরে প্রচলিত ছিল বলে হিট্টাইট দলিলে দেখা যায়—উহা সংস্কৃতের শব্দ একবর্ত্তন (এক পাক) তেরাবর্ত্তন ( পাঁচ পাক ), সত্তবর্ত্তন ( সাত পাক )। মিটান্নী রাজ্যে ভারতীয়েরা যে বাস করত—ইহা তার স্পষ্ট প্রমাণ ( হুণজি )।"

ভাষার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় যোগ থাকলে ঐ ভাষা ব্যাকরণ সংশ্রব যুক্ত বলেই প্রমাণিত হয়। হিট্টাইট ও মিটান্নীর দলিলের ভাষায় কিছু কিছু বিভক্তি প্রত্যয় প্রাথমিক বৈদিক ভাষারই সাক্ষ্য দেয়। এই ভাষা স্থানীয় জাতিদের ভাষার সঙ্গে, এই হিসাবেই বিরাট পার্থক্য যুক্ত। আর্য্য সংস্কৃতির পক্ষে ইহা একটা বড় প্রমাণ। বিভক্তি ও প্রত্যয় থাকলেও এই সময় উহার ভ্রূণ অবস্থা। ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাকরণের উদ্ভব তখন অবশ্যই হয় নাই।

১৬৯ Alphabet; page 94.

সময়ের প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ বছরের কিছু আগে বা পরে। প্রায় খৃঃ পূঃ ১৮০০ শতকে ব্যাবিলনে হাম্মুরাবিবংশের পতন হয় হিট্টাইট আক্রমণে। মিশরে হিকশোস আক্রমণ হয় খৃঃ পূঃ ১৭৮৮ শতকের পর।" "বজ্রধারী দেবতা হিট্টাইটদের যেমন ছিল, তেমনি তিনি উত্তর আমোরাইটদের, মিটান্নী এবং কাসসাইটদেরও দেবতা ছিলেন। এই দেবতা সম্পূর্ণ সিন্ধু উপত্যকায় নিজস্ব মহাদেব এ বিষয় যথা স্থানে আলোচিত হয়েছে। ১৭২

হিট্টাইট জাতি নিজেদের হাট্টি বা খাট্টি নামে অভিহিত করত—ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। শব্দের প্রথমে সংস্কৃত বর্ণ "স" পশ্চিম এসিয়ায় উচ্চারিত হয় 'হ' রূপে বা খ রূপে। এই হিসাবে হাট্টি বা খাট্টিকে ছত্রি বা ছত্তি শব্দের অপভ্রংশ মনে করা যায়। ইহারা ক্ষত্রিয় বা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। মনুসংহিতায় আছে যে ইহারা বর্ণাশ্রম বা উপনয়ন সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না বলে ভারতের বাইরের ভারতীয় জাতিগুলিকে মনু বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেছেন। শক এবং ইরানীরা ভারতীয় জাতি এবং এককালে ইরাণ ছিল বৃহত্তর আর্য্য ভারত। ইহারা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন—এই জন্য ইহারা নিজেদের খত্তি বা ছত্তি বলে পরিচয় দিতেন। এদের সঙ্গে আর্ম্মানিয়ানদের সগোত্র সম্বন্ধ ছিল। এই সূত্রেই আর্ম্মেনিয়ানরা ইরাণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। ডোনাল্ড বলেছেন বর্ত্তমান আর্ম্মেনিয়ানগণ ইন্দো-ইউরোপীয় (অর্থাৎ ভারতীয়) ভাষায় কথা বলত এবং মাননাই জাতি বলে পরিচয় দিত—এদের চওড়া মাথা, এদের হাট্টি বংশীয় বলেই মনে হয়। এরা আসিরিয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল ও ঐ ভাষার লিপি গ্রহণ করেছিল। তাদের দেবতার নাম খালদিসা, জাতির নাম দিয়েছিল "খালদিয়া।"

১৭২ মি, ব্যা ও আ ; ডোনাল্ড মেকেঞ্জি ; পৃঃ ২৫৯।

"উত্তর সিরিয়ায় হিট্টাইটদের আবির্ভাব নাটকীয়। এসিয়া মাইনরে একজন বড় সম্রাটের আবির্ভাব হয়, নাম সুব্বিলুলি উমা, ইনি প্রথম হাট্টুসিলের উত্তরাধিকারী, যিনি এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রায় দুইশত বৎসর জীবিত ছিল। তার রাজধানী বোগ-জো-কুই।" (ঐ, পৃঃ ২৮৩)

"সাইস এই মত প্রকাশ করেছেন যে বাইবেলের টাইডালের সঙ্গে তুদখুল বা তুধুলা, যার অর্থ জাতিগুলির অধিপতি; ইনি আরিওকের আমফ্রাইলের এবং চেদোর লাওমাকে সহযোগী করেছিলেন। এই তুধুলা একজন হিট্টাইট রাজা। "জাতিগুলির" অর্থ এই হল যে এসিয়া মাইনরের জাতিগুলি হাট্টিদের দ্বারা পরিচালিত হত। বাইবেলের গল্পের অংশ যাহা ডাঃ পিঞ্চেস সম্পাদন করেন—প্রফেসর সায়েস বলেন যে টাইডাল শব্দের স্থানে তুধকুল আছে এবং তাহাকে উত্তরের জাতিগুলির রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ "গয়েইম"। এই নামটি হিট্টাইট। দ্বিতীয় রামেশিসের হিট্টাইট বিরুদ্ধ অভিযানের কাহিনীতে লিখিত আছে যে টাইডাল এবং বোগ-জো-কুইয়ের একজন হিট্টাইট রাজারও ঐ নাম ছিল, ইহা কীলক অক্ষরে "তুধ খালিয়া" বলে লিখিত আছে। ১৭২

## হাট্টিজাতি ইন্দোইউরোপীয় নয়

ইতিপূর্ব্বে নর্ডিকবাদীদের দাবীর কথা বলা হয়েছে এবং তাহার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ইহারা বলেন যে হিট্টাইটদের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণী যাদের নাম হাট্টি তারা অন্ততঃ অ-আর্য। অন্য গুলিকে তারা ইন্দোইরাণীয় বা আর্য বলেই মনে করেন। আমরা দেখেছি যে পশ্চিম এসিয়ায় যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে তাতে প্রমাণ হয়েছে যে এখানে যে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক জাতি বাস করত তারা

১৭২ মেকেঞ্জি; মি, অ, ব্যা. পৃঃ ২৭৮, ২৮০ ও ২৮৩।

সেমাইট নয়। তারা স্থমেরীয় বা ইলামীয়। যে সমস্ত শীলমোহর, মূর্ত্তি বা বাসন-কোসন ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তাতে যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাহা সিন্ধু অঞ্চলের গ্রাম্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ভাষাতত্ত্বেও দেখা গিয়েছে উহাদের ভাষা সিন্ধুভাষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। লৌহ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে যা পাওয়া যায়, তাতে শুধু ব্যবহৃত জিনিষগুলি নয়, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, বাণিজ্যিক লেন দেন প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসই সিন্ধুর আর্য্যদের সঙ্গে

## পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সংশ্রব

পশ্চিম এসিয়ার সঙ্গে মিশরেরই সংস্রবের পরিচয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনকালে পাওয়া যায়। স্কফিল্ড লিখেছেন, "In earliest times, the contacts on the west were throughout with one and the same people, the Egyptians, and the story of their penetration of Palestine before the entry of the Israelites extends from the dawn of history."

পশ্চিম এসিয়ায় স্থমের ও মিশরের আবির্ভাব সকলের চেয়ে প্রাচীন। স্কফিল্ড বলেন যে সকলের চেয়ে প্রাচীন যুগে এখানকার পশ্চিমাঞ্চলের দিক থেকে মিশরের ও পূর্ব্বাঞ্চলের দিক থেকে স্থমেরের পুরাতন সংস্রব হয়েছিল। ইহার পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ মেসপটেমিয়া এবং সিরিয়া অঞ্চলে এ্যামোরাইটের বসবাস ছিল। এদের সেমেটিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা এই সমস্ত অঞ্চলে বিশেষ কিছু চিহ্ন রাখে নাই। সমাধি স্থান—যাহা দণ্ডায়মান প্রস্তর এবং কোথায়ও বা লিঙ্গাকৃতিস্তম্ভ দ্বারাই এদের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্তম্ভকে লিঙ্গের প্রতীক বলেই স্কফিল্ড মনে করেছেন। তিনি বলেন যে পরবর্ত্তী কালে এমোরাইটদের দেবতা আমরুরুর স্ত্রী আসে-রিয়াতের সঙ্গে উহা সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল। এমোরাইটদের পরে ব্রোঞ্জ

যুগের মাঝামাঝি অনুমান খৃঃ পূঃ ২২০০ শতকের পর খৃঃ পূঃ ১৮০০ শতকে বিরাট পরিবর্তন হয় হিকশোস আগমনের ফলে। ১৭৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সেমেটিক এমোরাইটদের আগে এই মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে আর কোন সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপীয় কোন জাতির অস্তিত্বের খোঁজ এখানে পাওয়া যায় না।

হিট্টাইট, মিটান্নী, হিকশোস জাতির আগে এই অঞ্চলে কোন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি আসে নাই।

এই বিষয়ে ডোনাল্ড মেকেঞ্জিরও এই মত। তিনি বলেন যে এই সময় মেডিটোরিয়ান জাতি সিরিয়া ও এসিয়ামাইনরের বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস করছিল। মেডিটোরিয়ান জাতিকে ইউরোপীয় বলা যায় না। তার পর মেকেঞ্জি লিখেছেন, "The Mediteraneans mingled in Northern Syria and Asia Minor with the broad headed Armenoid peoples who are represented in Europe, by the Alpine race. With them they ultimately formed the great Hittite Confederacy." মেডিটোরিয়ান জাতি বলতে সাধারণতঃ ক্রীট ও ফিনিসিয়ানদের বুঝায়। এই দুই জাতিই যে সিন্ধুজাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধযুক্ত এবং উহাদিগকে সিন্ধুর উপনিবেশ ছাড়া কিছু বলা যায় না—ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে।

হাট্টি বা খাট্টির আবির্ভাব সম্বন্ধে মিশরে দ্বাদশ রাজবংশের সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এদের ব্যাবিলনে আবির্ভাব হাম্মুরাবির সময়ে—প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ বছরের কিছু আগে বা পরে।" ( ঐ পৃঃ ২৫৯ )

"যে সমস্ত আক্রমণকারীরা খৃঃ পূঃ ১৮ শতকে ব্যাবিলনে প্রবেশ করেছিল, ইসাগলিয়াতে আগুন লাগিয়ে ছিল, মেরোডাক দেবতাকে ও তার পত্নী জেরপাণিতুকে নিয়ে গিয়েছিল—এদের নাম হাট্টি। এদের মিটান্নীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।" ( ঐ পৃঃ ২৭১ )

১৭৩ R. B. O. B.; Scoffield p. 13.

সুতরাং ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা যে হিট্টাইট ও হাট্টি জাতি পৃথক এবং হাট্টি জাতি অ-আর্য্য—এই চেষ্টায় কোন যুক্তি নাই। অমরা ইতিপুর্ব্বে পশ্চিম এসিয়া অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্য জাতির মধ্যে কোন ইউরোপিয়ান খুঁজে পাই নাই এবং হাট্টি জাতিও যে হিট্টাইট জাতির সঙ্গে অভিন্ন তাও দেখতে পেলাম। সুতরাং হিট্টাইটদের সাংস্কৃতিক সাক্ষ্যে যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী বলে তাদের জানা গিয়েছে—উহার সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়।

## হিকশোস সংস্কৃতি

"একজন হিকশোস রাজা তার নাম ইয়ান বা খিয়ান, ইয়ানিয়া অব মানেথো, একজন প্রধান রাজা ছিলেন অথবা প্রধান রাজার সহযোগী ছিলেন; ইনি এসিয়ায় একটি বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম সুদূর ক্রীটে নচ্ছস এবং টাইগ্রীস তীরে কাসসাইটদের প্রাচীন অবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এই রাজ্য এক সময় কাসসাইটদের শাসনাধীনে ছিল। এতে বোঝা যায় যে তার রাজত্বের সময় এসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ব্যবসায়ে প্রচুর সমৃদ্ধি হয়েছিল, সুদূর অঞ্চল ব্যাপ্ত করে। হিকশোস নামটিই এই বিষয়ে ইঙ্গিত বাচক। ব্রেষ্টেডের মতে ইহার অর্থ 'সকল দেশের অধিপতি; ইহার সঙ্গে বাইবেলের "টাইড্যাল অব নেশন্‌স্" তুলনীয়। এই টাইড্যাল অব নেশানকে, শায়েস বলেছেন যে ইহাতে হিট্টাইট রাজারই নাম উল্লেখ করা হয়েছে।" (মেকেঞ্জি, পৃঃ ২৭১)

হিকশোস জাতি সম্বন্ধে দেখান হয়েছে যে এদের সংস্কৃতি ছিল হিট্টাইটদের মতই। এরা হিট্টাইট মিটান্নির সগোত্র এবং এরা সিন্ধুসভ্যতার আর্য্যশাখাভুক্ত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যাদের ইন্দ্রাদি যজ্ঞ সংস্কৃতি ছিল না, তাদের সগোত্র হলেও যাজ্ঞিকরা তাদের ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তাদের ব্রাত্য দানব, দৈত্য, অনার্য্য প্রভৃতি

নানা নিন্দনীয় শব্দে অভিহিত করা হয়েছে। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, কিন্নর প্রভৃতি কয়েকটি জাতি এই পর্য্যায়ের। ইহারা বেশী পরাক্রমশালী বা জনবহুল ছিল। ইন্দ্রসংস্কৃতির আর্য্যরা এদের সম্ভ্রম করত। এদের কৃষ্টি ছিল সিন্ধুর সংস্কৃতি।

## হিকশোস শব্দের ব্যুৎপত্তি ও হিঙ্গুলা দেবী

যক্ষ জাতি এইরূপ একটি জাতি। এদের বাড়ী কুবেরের আলয় থেকে উত্তরে। ইহার অর্থ হিমালয়ের কৈলাশ পর্বতের উত্তরে। অর্থাৎ হিন্দুকুশ এবং পামীর উপত্যকায় উত্তর-মদ্র এবং উত্তরকুরুতে। খস, বাহ্লীক, পারদ প্রভৃতির সঙ্গে এরা সমগোত্রীয়। ইতিপূর্ব্বে কাসসাইট, মিটান্নী সম্বন্ধেও হিকশোসদের সগোত্রীয়তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যক্ষজাতিকেও হিকশোস জাতির সঙ্গে একই পরিচয়ে পরিচিত করা যায়। যক্ষ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ ইয়ক্স। ইয়ক্স শব্দই হিক্স শব্দে পরিণত হয়েছে। মেদ, মিটান্নীর সঙ্গে সগোত্রীয়তা এবং শব্দের উচ্চারণের মিল ধরে ব্যাখ্যা করলে ইহাই যুক্তিসঙ্গত পরিচয়। বেলুচিস্তানের হিঙ্গুলা দেবীর রক্ষক ছিল যক্ষরা। এই যক্ষদের প্রাসাদ এবং পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীন চিত্র এখনও হিঙ্গুলা দেবীর মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখা যায়। এখানকার কিম্বদন্তী এই যে ইহা যক্ষদের আবাস ছিল; ইহারা হিঙ্গুলা দেবীর প্রহরী। সম্ভবতঃ এরা এখান থেকেই বহির্গমন করে সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে এই অঞ্চল বাসের অযোগ্য হয়েছিল।

## ডাঃ হ্রুনজির হিট্টাইট ও ডাঃ হলের দ্রাবিড় সভ্যতা

ডাঃ হলের দ্রাবিড় সভ্যতা ঐতিহাসিককালের দ্রাবিড়ের গৌরবকথা নয়। ইহা প্রাগৈতিহাসিকযুগের সভ্যতার কথা। ডাঃ হল ইহার সঙ্গে বর্তমান দ্রাবিড়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। তার মূল চেষ্টা ছিল সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সিন্ধুর উপত্যকার

অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা। ইহাতে তিনি সফলতা লাভ করেছেন। কিন্তু তার দ্রাবিড় সভ্যতার সাক্ষ্য উল্টে যেয়ে প্রমাণিত হয়েছে—সিন্ধুর ভারতীয় সভ্যতা।

ঠিক এই ভাবে, ডাঃ হ্রুনাজি হিট্টাইট সভ্যতার গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইহাও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুর গৌরব। ডাঃ হ্রুনাজিও প্রত্নতাত্ত্বিক হিট্টাইট বা আর্য্য হিট্টাইটের সঙ্গে সিন্ধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। ডাঃ হ্রুনজিরও মূল চেষ্টা হিট্টাইট সংস্কৃতির সঙ্গে সিন্ধুর অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা। ইহাতে ডাঃ হ্রুনাজিও সাফল্যলাভ করেছেন কিন্তু তাঁর প্রোটো-হিট্টাইট সভ্যতাই হয়েছে প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতা।

উভয়ের এই ভ্রান্তির কারণ নর্ডিক-তত্ত্ব। এরা নর্ডিকবাদীদের কুচক্রের উর্ধে উঠতে সাহস পান নাই।

## হিকশোস ও ফিনিসিয় উপনিবেশে শবদাহ

Religious background of the Bible এর ৪৫ পৃষ্ঠাতে স্কফিল্ড লিখেছেন, "গেজেরে এক প্রাকসেমেটিক জাতি অগ্নিতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করত। অবশ্য আমরা জানি যে এর অনেক পরেও খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে কারস্মেল পর্বতের কাছে আথলিটে একটি ফিনিসিয় উপনিবেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ( History of Palestine and Syria, Almstead ). গেজেরে এই প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধরেরা একটি গুহা ব্যবহার করত, দেখা গিয়েছে যাতে মৃত সংকারে নবজাতকের মৃত্যুর পর শবদাহ করা হয়েছিল।"

গেজেরে হিকশোসদের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

## হিকশোসদের মাতৃসংস্কৃতি

ইতিপূর্ব্বে ডাঃ মোডের গবেষণায় যে মাতৃসংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে হিকসোসদের সাদৃশ্য আকর্ষণীয়।

"হিকশোস জাতি প্রায় খৃঃ পূঃ ১৮০০ শতকে প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করে। ইহারা হিট্রাইট ও মিটান্নীর সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী বলে প্রতিপন্ন এবং তাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমপর্য্যায়ের কৃষ্টি সম্পন্ন—যেমন মহামাতৃদেবতার পূজা। তাদের বিজয়, সিরিয়া ও মেসপটেমিয়ার সেমেটিক জাতির মধ্যে তাদের জাতিগত কৃষ্টির বিকাশের পক্ষে শক্তি সঞ্চার করেছিল। জেকবেল এবং আনাতেল নাম হিকশোস প্রদত্ত। ইহা সিরিয়ার দেবী কৃষ্টির সাক্ষ্যদান করে। হিকশোসদের সঙ্গে যে উর্ব্বরতার কৃষ্টি এবং মাতৃ দেবতার উপাসনা এসেছিল ইহা বিশেষত্বব্যঞ্জক। এই কৃষ্টিতে দেবী মানবমূর্ত্তিতে প্রকাশিত। বিশেষ ভাবে প্যালেষ্টাইনে নগ্নমাতৃমূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আর এই নারী মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে জন্তুর প্রতীকের অস্তিত্ব ছিল—যেমন সর্প ও পারাবত। ব্যাবিলনের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সাপের সঙ্গে বক্রগতি নদী এবং উর্ব্বরতার প্রতীকের সমবায় আছে। এই প্রকার মূর্ত্তি ব্যবহার এই সময় ক্রীটে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বহু প্রমাণ আছে যে প্যালেষ্টাইনে সর্পকৃষ্টি প্রচলিত ছিল। বেথলামে একটি মন্দিরে ইহার প্রতিকৃতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। গেজের এবং গ্যাথে ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত সর্প পাওয়া গিয়েছে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে সর্পের দ্বারা ইভকে প্রতারিত করা এক উর্ব্বরতা কৃষ্টির পরিচয়। আর একটা গল্প আছে যে মোজেস ব্রোঞ্জ সর্প দ্বারা লোকের রোগ আরোগ্য করেছেন। পায়রাও মাতৃ দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তেল এল আজজুলে প্রাপ্ত হিকশোস মৃৎপাত্রে একটি পায়রা ও তৎসঙ্গে তারা চিত্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ইহাও স্মরণ করা যায় যে যীশুর জন্মের সময় মেরী ইহুদী আইনের অনুসারে ২টি পায়রা বলি দিয়েছিলেন।"

"হিকশোসগণ মিশর ও প্যালেষ্টাইন থেকে খৃঃ পূঃ ষোড়শশতকে বিতাড়িত হয়, মিশরীয়দের দ্বারা। হিকশোসদের কীর্ত্তি তারপরও চলতে থাকে। তাদের দ্বারা যে ধর্ম্মমত প্রচলিত হয়েছিল এবং যে

শক্তি বড় বড় মন্দির, ভাণ্ডারগৃহ এবং বাসগৃহ তৈরীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিল, তাহা তাহার পরেও দ্রুতগতিতে চালিত হয়েছিল। প্রত্ন-তাত্ত্বিকের কাছে এই কালের সাক্ষ্যগুলি খুব মূল্যবান, কারণ বর্তমানে অনেক বিস্তারিত অট্টালিকার চিহ্ন ভূখননে আবিস্কৃত হয়েছে।"

## বেথশানের মহাকাল মন্দির

মাতৃসংস্কৃতি ছাড়াও মহাদেবের সংস্কৃতি ও সিন্ধুর সম্বন্ধ প্রমাণ করে।

"বেথশানে এই প্রকার যুগল মন্দির বাহির হয়েছে। সেখানে একটাতে সর্পের এবং একটাতে মেকাল দেবতার। (মহাকাল) ইনি মহাদেব, বেথশানের ঈশ্বর। ইহার পূজা এখানেই হোত। মূর্ত্তিটি চুণব পাথরে খোদিত। ইহার মুখে শ্মশ্রু, হাতে মিশরীয় দণ্ড এবং জীবনের চিহ্ন। মাথায় কোণাকার শৃঙ্গবান মুকুট, আর তিনি পদ্মের অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটি বেসনাটর বেদী, তিন ফুট উচু। অন্য মন্দিরে একটি সর্প চিহ্নিত মৃৎপাত্র, যাতে নারীর স্তন আছে। আর একটি দুইমুখী পাত্র পাওয়া গিয়েছে যাতে দুই ধারে দুইটি সাপ পাত্রের দুই মুখে প্রবেশ করছে।"

"বেদীর ধাপের নীচে ভিতের অবশেষ থেকে প্রমাণ হয় যে এই মন্দির পরে তৃতীয় এমেনহোটেপের দ্বারা (খৃ পূঃ ১৪১১—১৩৭৫) পুনরায় নির্ম্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে দেবীর মাথায় কোণাকার মুকুট আর তাতে দুটি শিং ছিল। এতে প্রমাণ হয় এই দেবী আসতার্ত্তে, যে আসত্যার্ত্তের দুইটি শিং ছিল এবং দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে তাঁর নামে একটি সহরের নামকরণ হয়। এখানেও হিট্টাইটদের বজ্রদেবতা তেষবের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ছিল।" ১৭৪

৫৭) এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই মন্দিরের তেষবের মূর্ত্তি থাকায় ইহাই প্রমাণ হয় যে ঐ তেষব, ভারতের রুদ্রশিব। এই বিষয় ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ঐ রুদ্রশিবই, মহাকাল।

১৭৪ স্কফিল্ড; রি, ব্যা, বা; পৃঃ ৫৪, ৫৫।

দেবীর এই সিংচিহ্নিত মুকুট সিন্ধুর শিবের মুকুটের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং ইনি যে মহাকাল দেবতা এবং ঐ মন্দির ভারতীয় ঔপনিবেশিক জাতিদের মধ্যে হিকশোস, ফিনিসিয় বা হিট্টাইটদের যে কোন জাতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "ব্যক্তিগত মন্দিরে স্থানীয় দেবতার প্রতি উৎসব করা হোত। ঐ দেবতাকে এই দেশে কেউ জানত না, যেমন নূতন নূতন দেবতার আমদানী হয়েছে তেমনি স্থানীয় দেবতাদের নূতনের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে—যেমন বেথশানের মন্দিরে মেকালের স্থান রেশেফ নিয়েছে, আর তাঁর শক্তি হয়েছে অনাথ ( সম্ভবতঃ ইনিই আনাইতা বা সিংহবাহিনী উমা ) এই অনাথ যেমন প্যালেষ্টাইনে তেমনিভাবে মিশর ও সিরিয়ার প্রিয় ছিল।"

"জেরুজালেমে এক রাজা ছিল নাম আবদ খিবা ; এই নামে বোঝা যায় যে ঐ দেবী হিট্টাইট দেবী খিবার উপাসক ছিলেন।"

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে হিট্টাইট দেবতা "খিবা" শব্দটি "শিবারই" অপভ্রংশ। "শ" স্থানে "খ"-এর অপভ্রংশ অজানিত নয়।

"ইহুদী সলের একটি কন্যার নাম মিকাল। উহা বেথশানের দেবতার নামে ; আর একটি ছেলের নাম ব্যাল।"

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মিকাল মন্দির যেমন মহাকাল ভৈরবের মন্দির, তেমনি ব্যাল দেবতা ছিল ঐ ভৈরবেরই রূপান্তর। এই দেবতা ফিনিসিয় সংস্কৃতির।

"ওল্ড টেষ্টামেণ্টের লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে এই সব দেবতা এক পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল, "ব্যালিম এবং আসতারথ—ইহা মহাদেবতা ও তার শক্তির প্রতীক।" (রি, ব্যা, বা, পৃ ৫৮৭)

## হিকশোসেরা আর্য্য

"হিকশোসদের সঙ্গে হিট্টাইটদের আকৃতিগত যোগ ছিল। এবং এদের পরে কাসসাইটদের সঙ্গেও। এদের আর্য্য সংশ্রব ছিল। ক্রীটের নচ্ছস এবং মেসপটেমিয়ার বাগদাদে এদের প্রভাবের বিষয়

জানা যায়। এদের অধিকার প্রায় ২০০ বৎসর ছিল। প্যালেষ্টাইনে এদের অনুপ্রবেশ সুবিস্তৃত ছিল; এদের অবশেষ এবং চিহ্ন গ্যালিলি সাগরের উত্তরে হাজরের উপকূল ভাগে আস্কেলনে; জুডিয়ার পাহাড়-তলীতে এবং জেরিকোতে পাওয়া যায়। (রি, ব্যা, বা, পৃ ১৫, ১৭)

## উরারুতু বা আর্ম্মেনিয়ার ভাষাও সংস্কৃতি

উরারুতু বা আর্ম্মেনিয়া পারস্যের উত্তরে উরুমিয়া হ্রদ এবং ভ্যান হ্রদের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত অঞ্চলটিকে উরারটু বল্‌ত। ইহা আসীরিয় রাজ্যের উত্তরে এবং পারস্যের প্রধান শস্যভাণ্ডার, যাহা কাশ্যপ সাগরের দক্ষিণাংশ; উরুমিয়ার তীরভূমি তাহার সংলগ্ন, পশ্চিম দিকে। ইহা একটি প্রাচীন বৈদিক আর্য্য প্রভাবিত দেশ। এই দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইতিহাসে এই দেশটি নাইরি নামে পরিচিত।

এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের ২নং জার্ণাল ৪ এর ৩৮ পৃষ্ঠায় আসেদুরগুজেল্লান লিখেছেন, "আর্ম্মেনিয়ার প্রাচীন, চিত্রলিপির প্রায় দুইশতটি, অতি প্রাচীন কালের; উহা এরভানের ষ্টেট লাইব্রেরীতে পাওয়া গিয়াছে। সোভিয়েট আর্ম্মেনিয়ান পণ্ডিত আসট আব্রামিয়ান আর্ম্মানীয় লিপি সম্বন্ধে ইজিপ্সিয়ন ও হিট্টাইট লিপির তুলনা করে কিছু ফল লাভ করতে পারেন্ নাই। তারপর তিনি এই চিত্রলিপির সঙ্গে সিন্ধুচিত্রলিপি নিয়ে গবেষণা করায় আশ্চর্য্য ফল পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "যখন আমি সিন্ধু চিত্রলিপির অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করি, লক্ষ্য করি যে উহার মধ্যে আর্ম্মেনীয় লিপির ডবল অক্ষর আছে। এদের উভয়ের সাদৃশ্য অক্ষরগত-ভাবেই দেখা যায়। এতে সন্দেহ করার কিছু নাই যে এরূপ সাদৃশ্য হতে প্যারে না। ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে এই চিত্রলিপিগুলি ভারত থেকে আর্ম্মেনিয়ায়

এসেছিল এবং মূলতঃ ইহা আর্ম্মেনিয় কিম্বা এসিয়ামাইনরের অন্যজাতির নিজস্ব ছিল না।

ভারত ও আর্ম্মেনিয়ার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ ছিল। এমন কি খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকের আগেও আর্য্যরা আর্ম্মেনিয়ায় উপনিবিষ্ট হন। আর্ম্মেনিয়া সম্বন্ধের বিষয় বোধ হয় প্রথম গ্রীক লেখক জেনফনের "কাইরোপিডিয়া ( খৃঃ পূ পঞ্চম শতক ) থেকে পাওয়া যায়। এই সংবাদ থেকে জানা যায় যে আর্ম্মেনিয়গণ ভারতে প্রায়ই আসতেন, এদেশে সৈনিক বিভাগে কাজ করতে। প্রফেসর বংগড লেভেনিয়ন, ( য়িনি ইউ এস এস আর এর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ) বলেন, যে আর্ম্মেনিয়া শুধু রোমীয় সম্রাটের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ রক্ষা করে নাই, সে পার্থিয়া, চায়না ও ভারতের সঙ্গেও রাখত। এইসব দেশের সঙ্গে সংস্রব রাখার জন্য আর্ম্মেনিয়ার রাজারা পার্থিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যাক্ট্রিয়া থেকে ভারত ও চীনের সঙ্গে ব্যবসার রাস্তা খুলেছিল। জেনো, প্লিনি লিখেছেন যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে আর্ম্মেনিয়ায় ব্যাপক ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। "ইহারা সেখানে জাতীয় দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। আসিত সহর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত হয়। তারা ২০টি সহর প্রস্তুত করেছিল। তারা মন্দিরে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরের কতকগুলির নাম গত শতকেও ছিল! এখানে ভারতীয় ১৫০০০ জন ছিল। রাজ্যের ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম হওয়াতে, তারা সাহসের সহিত রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরা এদের লিপি সঙ্গে এনেছিল এবং আর্ম্মেনিয়গণ তাহা গ্রহণ করেছিল। খৃষ্ট ধর্ম্ম জয়ী হবার অন্ততঃ তিনশত বছর আগে ইহা বর্ত্তমান ছিল। তার লেখা ভারতে আর্ম্মেনিয় উপনিবেশ থেকে উদ্ধৃত করছি, "গিয়া ও দিমিতার রাজা দিনক্ষপানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য নির্ব্বাসিত হন। রাজা আরসাসেস্ তাহাদিগকে স্থান দেন। তারা……অক্ষত ছিলেন।"

প্রাচীন ইরাকে "শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন" আসীরিয় সাম্রাজ্যের যুগে আরমেনিয়া ছিল নাইরি, উরারতু ও, মাননাই জাতি

সমূহের বাসভূমি। সপ্তম খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পশ্চিম অঞ্চলের ফ্রিজিয়া থেকে আর্য্য ঔপনিবেসিকগণ এখানে প্রবেশ করেছিল। দারায়ুসের বিহিস্তান শিলালিপিতে সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশরূপে আর্ম্মেনিয়ার উল্লেখ আছে।" আসীরিয়রাজ সালমানেসারের রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলে উরারতু রাজ্য কর্তৃক আসীরিয় সাম্রাজ্যের উপর হামলা সুরু হইয়াছিল এবং নাইরি ভুমির জাতিসমূহ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সালমানেসারের পর উরাবতু রাজ্য বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ১৭৫

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, "সিরিয়া—ক্যাপ্পাডোসিয় হিটাইট রাজ্যগুলি, এসিয়া মাইনরের তাবালের সঙ্গে এবং উত্তর সিরিয়ার কারকেমিসের সঙ্গে আসিরিয়ার বিরুদ্ধে শেষবারের জন্য যুদ্ধার্থে সজ্জিত হচ্ছিল। মিতান মুক্ষি ফিরাগয়ানের রাজা এবং উবারতুর রাজা তৃতীয় সারদুরিশের পুত্র রুসসের নেতৃত্বে এরা যুদ্ধার্থে সজ্জিত হচ্ছিল। ৭১৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সারগন রুসসকে পরাজিত করার পর রুসস আত্মহত্যা করেন।"

"উরারুতুর পশ্চিমে মাননাই নামে কতকগুলি জাতি ছিল; ইহারা মিডিসদের উত্তরদিকের শত্রু, ইহারা ইন্দোইউরোপীয় ভাষার কথা বল্‌ত। (ইন্দোইউরোপীয় অর্থ ভারতীয়)—এই শব্দের পূর্ব্ব-চলিত অর্থ ই ইহা।) উবারুতুর জনসাধারণ হাট্টিবংশীয় বলে মনে হয় কারণ তাদের চওড়া মাথা যেমন এখনকার আর্ম্মেনীয়গণ; ইহারা তাদেরই বংশধর।"

"এরা আস্যুরিয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। ঐ ভাষায় কথা বল্‌ত। তাদের দেবতার নাম খালদিস, আর তাদের জাতির নাম দিয়েছিল খালদিয়া।"

## ইনাম, হিকশোস, হিট্টাইট, মিটান্নী, কাসসাইট, হুরাইট একই সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা

এসিয়া মাইনর জাতিগুলির জাতিতত্ব সম্বন্ধে ডোনাল্ড লিখেছেন, "ভূমধ্য সাগরীয় লোকেরা, উত্তর সিরিয়া এবং এসিয়া মাইনরের

১৭৫ প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; পৃঃ ২৩৫।

আরমেনয়োড জাতির লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ; আরমেনয়েডগণ ইউরোপে আল্পাইন জাতি বলে পরিচিত। এদের সঙ্গেই হিট্টাইটরা মহান হিট্টাইট কনফিডারেসি গঠন করেছিল। হাট্টি বা খাট্টিচওড়া-মাথা জাতি আলপাইন বা আর্ম্মেনয়েড পার্ব্বত্যজাতি বলে পরিচিত ; ইহারা বর্ত্তমান আর্ম্মেনিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ।" ১৭৬

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডোনাল্ডের মতে আর্ম্মেনীয়া হিটাইট জাতির উপনিবেশ।

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, "উইনক্লার বিশ্বাস করেন যে ইহা পূর্ব্বদেশ থেকে প্রথম হাট্টি জাতির আক্রমণ প্রথম বারের আগমন।"

উইনক্লার হাট্টিদের পূর্ব্বদেশআগত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। হাট্টি বা হিট্টাইট জাতিকে আর্ম্মেনিয়ানদের সগোত্র এবং বর্তমান কুর্দ্দদের পূর্ব্বপুরুষ বলে মনে করা হয়। আমরা আর্ম্মানি জাতির সম্বন্ধে উক্ত আলোচনায় দেখতে পাই যে ইহারা সিন্ধুউপত্যকার ঔপনিবেশিক জাতি ছাড়া আর কেহ নয় ; ইহারা হিট্টাইট, মিটান্নী, কাসসাইট, ইলামীয়দেরই সগোত্র। ইলামের উত্তরে ভ্যান হ্রদের ধারে উর্ব্বর ভূখণ্ডে এদের বিস্তৃতি হয় ; এই অঞ্চলই আর্ম্মানী জাতির প্রথম উপ-নিবেশ এবং এখান থেকেই উহারা মেসোপটেমিয়ার উর্ব্বর অর্দ্ধচন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে। ইহারা সিন্ধুর যাযাবর আর্য জাতিরই ঔপনিবেশিক ভ্রাতৃব্য—তাহা এই পুস্তকে নানা প্রসঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে। ১৭৭

হিট্টাইট জাতি মিশ্রিত হবার পূর্ব্বে আসিরিয় রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলে থ্রেস (বুলগেরিয়া কনষ্টান্টিনোপল (তুরস্ক) অনুপ্রবেশ করে এবং যৌথরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা রক্ষা করে। পরে এরা যবন এবং গ্রীক সমাজের নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

১৭৬ মি, অ, ব্যা, মেকেঞ্জি ; পৃঃ ৪৬০, ৪৪৬, ২৬২।

১৭৭ ডোনাল্ড মেকেঞ্জি, মি, অ বা পৃঃ ১১, ২৬৮ ও ২৬৯।

"এই ব্যাবিলনকে হিট্টাইটরা তাদের মেসোপটেমিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, প্রায় একশত বছরের মত—যতদিন না কাসসাইটগণ টাইগ্রোইউফ্রেটিস উপত্যকার রাজনৈতিক আধিপত্য লাভ করেছিল এবং তারা মিশরের হিকশোস আক্রমণেরও নেতা ছিলেন; ইহা হিকশোসগণ তাদের হি াইট ও আমোরাইট সহযোগীর সাহায্যে সম্পন্ন করেছিল।" ১৭৮

ইলামের উত্তরে মিটান্নী, কাসসাইট, হুরাইট ও হিকশোসগণ এবং তারই উত্তরে আর্ম্মানীয়গণ—প্রায় একই সময় একই পরিবেশে একই সংস্কৃতির অন্তর্গত আর্য্য ঔপনিবেশিক।

আর্ম্মানিয়ানগণ ভারতের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ সম্বন্ধ রেখেছিল। আফগানিস্তান অঞ্চলে বর্ত্তমানেও আর্ম্মানি জাতির একটা উপনিবেশ আছে বলে গেজেটিয়ারে লিখিত আছে। এদের মাতৃ দেবতার নাম ছিল সৌসকা। এই নামটি এদের সঙ্গে এলামের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে। আবার অন্যত্র দেখা যায় এদের আর এক মাতৃ দেবতা ছিল আনাইতিস। (আনাইতিস নানাইয়া শব্দের অপভ্রংশ।) ইনি পারসিক মাতৃদেবতা অনাহিতার সঙ্গে এক। এই সূত্রে পারসিকদের সঙ্গে আর্ম্মানীদের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। নানাইয়া বা আনাইতা, নানামাই অর্থাৎ হিঙ্গুলা দেবীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। এদের ভাষা হিট্টাইট গোষ্ঠীর সঙ্গে এক। সুতরাং এই ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভারতীয় প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এদের চিত্রাক্ষর-লিপি সিন্ধুলিপির সঙ্গে একগোত্রীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। একথা মিঃ আসাদুর উল্লেখ করেছেন। ইহার পাঠোদ্ধার হলে প্রমাণটি আরও দৃঢ় হতো। তবুও লিপির অঙ্কন সাদৃশ্য এবং সংস্কৃতির একত্ব ইহাকে সিন্ধুর সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত করে। এই দেশটীর দক্ষিণাংশ লেক ভ্যানের নিকটবর্ত্তী। ইহা অতি মাত্রায় উর্ব্বর এবং এই জন্য পরবর্ত্তীকালের পারস্য সাম্রাজ্যের খাদ্যশস্যের মূল

১৭৮ M O B and A; D. Mackenzie, p. 271.

ভাণ্ডারই এই অঞ্চল বলে মনে করা হোত। অপর পক্ষে প্রাচীন সিন্ধুর জলবায়ুর বিপর্য্যয়ের কালে যখন ঐ অঞ্চলের অধিবাসী আদি স্তরের আর্য্যজাতি বাসস্থানের অনুসন্ধানে যাযাবর বৃত্তি অনুসরণ করেছিল, তখন ঐ সুসভ্য সিন্ধুর আর্য্য জাতি এই উর্ব্বর অঞ্চলেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই উপনিবেশই হচ্ছে মিটান্নী রাজ্য। এই রাজ্যের বিষয় ঋগ্বেদে আছে—ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। মিটান্নী ও হিট্টাইট জাতি যে এক জাতিরই দুই শাখা—ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হয়েছে।

হিট্টাইট ও হিকশোস জাতি যে সিন্ধুসভ্যতার পরবর্ত্তীকালের উদ্বাস্তু আর্য্য জাতির উপনিবেশকারী, তাহা উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকেই প্রমাণিত হয়। এদের সহবাসী ছিল মিটান্নীগণ। এই মিটান্নীগণ উত্তর ইরাণে কাশ্যপ তীরে একটি রাজ্যের আর্য্য প্রতিষ্ঠাতা এদের সংস্কৃতি ছিল প্রথমতঃ শিব ও উমা এবং পরে সূর্য্য বরুণ ইত্যাদি। ইহারা প্রাচীনতম দেবতা শিবের উপাসক (তেষব এবং সৌসকা) এরা গণতান্ত্রিক রাজ্য পদ্ধতির অনুবর্ত্তী ছিল। এদের ভাষা ছিল আর্য্য ভাষা। ইহাদের দেবীকে এরা "মা" নামে অভিহিত করত। ইহারা বৈদিকদের মত অশ্বারোহী জাতি ছিল। মিটান্নী জাতির বিষয় ঋগ্বেদে আছে; কাসসাইটের কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। আর্ম্মানীয়দের সঙ্গে এদের সগোত্র সম্বন্ধ ছিল। এই দুই জাতি গ্রীক ইতিহাসের পূর্ব্বকালে এসিয়া মাইনরের অধিপতি ছিল, এরা ক্রমশঃ সিরিয়া থ্রেস, মাকিডন এবং গ্রীসে অনুপ্রবেশ করে, কতকটা নূতন—উপনিবেশের আশায় কতক বা আসীরিয়দের প্রবল বাধায় অতিষ্ঠ হয়ে। গ্রীসের আর্য্য সংস্কৃতি এদেরই দান। এশিয়ামাইনরে পরবর্ত্তীকালে যাকে গ্রীক উপনিবেশ বলা হয়, সেইখানেই গ্রীক দর্শন এবং হোমারের কাব্যের উৎপত্তি। সুতরাং এই সকল প্রমাণের বিশ্বস্ত উপকরণ থেকেই যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে গ্রীক জাতির মূল উৎস—হিকশোশ, হিট্টাইট, মিটান্নী প্রভৃতি জাতি, তাহলে সেই

সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলা যায় না। এই প্রবল জাতি কয়টির উৎপত্তিতে আর্য্য সংস্রব পাওয়া যায়—ইহা সকল ঐতিহাসিকেই মেনে নিয়েছেন কিন্তু ইহারা কোথায় গেল সেই রহস্যটি কেহই উদঘাটন করেন না।

## মিটান্নী সংস্কৃতি

"অনেক পরে আমরা এসে পড়ি অজানিতভাবে, যখন মিশরে হিকশোস আধিপত্য নষ্ট হয়ে গেল খৃঃ পৃঃ ১৫৮০ শতকে। এই সময় পশ্চিম এশিয়ায় মহাশক্তিশালী রাজ্য ছিল হিট্টাইট, মিটান্নী, আসিরিয়ান এবং কাসসাইট ( ব্যাবিলোনিয়া )"

"প্রাচীনকালে বোধ হয় তৃতীয় থটমিসের সহস্র বৎসর আগে অর্থাৎ তার সঙ্গে মিটান্নীর সিরিয়ার যুদ্ধের হাজার বৎসর আগে, আর্য্য ভাষাভাষী লোকের দ্বারা আসিরিয়া উপনিবিষ্ট ছিল"। ( মেকেঞ্জি, পৃঃ ২৭৮ )

মিঃ জনস্ উল্লেখ করেন, "আসীরিয় দলিল অনুসারে, কিকিয়া, আদাসী, উসপিয়া আসুরের প্রাচীন শাসক ছিল। এরা সুমেরিয়ান বা সেমেটীক ছিল না। নিনেভের দেবীর প্রাচীন নাম ছিল সৌসকা ; ইহার সঙ্গে সৌসকাস যিনি তেষবের পত্নী তাহা তুলনীয়। তেষব হিট্টাইট, মিটান্নীর বড় দেবতা। মিঃ জনের মতে মিটান্নীর নামের অধিকাংশ, প্রকৃত পক্ষে এলামাইট, সেইজন্য তিনি মনে করেন যে আসীরিয়ায় এই প্রাচীন বিজেতাদের এলামীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। জনসের মত এই যে সেমেটিক রাজত্বের পূর্ব্বে, আসিরিয়া, মিটান্নীর সামরিক আর্য্য কৌলিন্যের দ্বারা অধিকৃত হওয়াই সম্ভব।" ( ঐ পৃঃ ২৭৮ )

দেখা যায় যে পর পর ৫ জন মিটান্নী রাজা আসিরিয়ায় অধিপতি হন, যাতে হিসাব করলে একশত বছরের কম করা যাবে না। সৌসাতার ( দশরথ ) তৃতীয় থট্‌মিসের পর অথবা তার উত্তরাধিকারী

দ্বিতীয় এ্যামেনহোটেপের পর আসিরিয়া আক্রমণ করেন। এইসব ঘটনা টেল-অমরণার পত্র আর এসিয়া মাইনরের কাপ্পাডোসিয়ায় বোগজোকুইএর মৃৎপদক, যাহা উইনক্লার আবিষ্কার করেছিলেন, তার থেকে পাওয়া যায়।" (ঐ, পৃঃ ২৮০)

"উইংক্লার বিশ্বাস করেন যে হিট্টাইট রাজ্যসমবায় ছাড়া ও একটি বড় শক্তি ও মেসপটোমিয়ায় উদ্ভূত হয়। উহার নাম মিটান্নিজাতি। উইংক্লার বিশ্বাস করেন যে ইহা প্রথমে হাট্টিজাতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, যে হাট্টিরা পূর্ব্বদেশ থেকে আগত। তেষপ মিটান্নীদের দেবতা, ইহা তুরকুর সঙ্গে এক। এরা ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় (ভারতীয় আর্যভাষায়) কথা বলত এদের রাজাদের নাম সৌস্তার, আর্ত্তামা, স্থুতার্না, আর্ত্তস্থুমার, তুষরত্তি এবং মাত্তিউজা, আর তাদের দেবতার নাম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য। মিটান্নীদের খারি বলত; কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে ইহা আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ। মিটান্নী শব্দের অর্থ নদীর ভূমি এবং কাপ্পাডোসিয়ার অধিবাসীদের উত্তরাধিকারীদের নাম গ্রীকরা দিয়েছিল, মাত্তিওনাই। হ্যাডন বলেন তাহারা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কুর্দ্দদের পূর্ব্বপুরুষ। ইহারা লম্বা মাথাবিশিষ্ট স্পষ্টতঃ আর্য্য ভারতীয়, ঠিক যেমন, প্রাচীন আর্য্য ভারতীয় ও গলজাতির মত; তেমনি তাহারা অতিথি সৎকারপরায়ণ এবং আক্রমণের প্রবৃত্তিশীল ছিলেন।" ( ঐ ২৬২ )

ডোনাল্ড লিখেছেন, "Judging from what we know of the northern worshippers of the hammer god in later times, it would appear that when they were referred to as the Hatti or Khatti, the tribe of that name was the dominating power in Asia Minor and north Syria. The Hatti are usually identified with the broad headed mountaineers of Alpine or Armenoid type—the ancestors of the northern Armenians."

"Tribes of Aryan speech were associated with the Kassite invaders of Babylon, who took possesion of northen Babylonia after the disastrous Hittite raid. It is believed that they came from the east through the highlands of Elam.

For a period the date of which is uncertain, the Mitannians were overlords of Assyria including Nineve and even Assur as well as the district called Musri, by the Assyrians and part of Cappadocia. They also occupied the city of Haran and Kadash. Probably they owed their military success to their cavalry. The horse became common in Babylon during the Kassite dynasty which followed the Hammurabi and was there called, "the ass of the east' a name which suggests whence the Kassites and Mitannies came."

"The Mitannians, as has been stated, recognised a Baal called Teshup, who was identified with Turku of the Western Hittites and with their own tribal Indra also.." ( ঐ ২৭০ )

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ডোনাল্ড সাহেবের ইহা একটা ভুল, কারণ মিটান্নীরা ইন্দ্রপূজক হলেও ঐ ইন্দ্র তেষবের সঙ্গে এক নয়। এই তেবব রুদ্রশিব। এই বিষয় H. C. Rai Chowdhuryর আলোচনায় অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

## কাসসাইট

"এই আর্য্য ভাষাভাষী জাতির সঙ্গে ব্যাবিলনের কাসসাইট আক্রমণকারীদের সম্বন্ধ ছিল। এই কাসসাইটগণ হিট্টাইটদের সর্ব্বনাশকর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বাবিলনের অধিকার গ্রহণ করেছিল।"

"কাসসাইটগণ ব্যাবিলন জয় করে সামরিক কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল, উহা প্রায় ছয়শত বৎসর স্থায়ী ছিল। এই কৌলিন্য সমবায়টির নাম ছিল কারদুনিয়াস।"

"আসিরিয়ার রাজা আসুর-উবাল্লিট তাঁর কন্যার সঙ্গে ব্যাবিলনের কাসসাইট রাজা করথর্দ্দাসের বিবাহ দেন। এদের পৌত্র কাদাসমান খার্ব্বে ব্যাবিলনের রাজ্য পান। ব্যাবিলনের কৌলিন্য সমবায়, ইহাকে আসুরীয় আধিপত্য মনে করে তাহাকে হত্যা ক'রে নাজিবুগাসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে। ইহাতে আসুর উবাল্লিট কাসসাইট সাম্রাজ্য আক্রমণ ক'রে, তাঁর প্রপৌত্র করিয়াগলজুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

সবচেয়ে প্রাচীন ঔপনিবেশিক কাসসাইটদের জাতি সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। ইহারা হাম্মুরাবির সময়ে ঐ দেশে উপনিবেশ আরম্ভ করে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কাসসাইটদের "কাসসাই" এর সঙ্গে এক মনে করেন। গ্রীকগণ এদের মিদিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার মাঝামাঝি, তাইগ্রিসের পূর্ব্ব এবং ইলামের উত্তরে উপনিবিষ্ট দেখেছেন। হিট্টাইটগণ এক শতক পরে আক্রমণকারীরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা সম্ভব যে আক্রমণকারী কাসসাইটগণ ইলাম আক্রমণ ক'রে হস্তগত করে এবং ইহারা ইলামী রাজা রিমসিনের সৈন্যদের সহযোগী ছিল।"

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইলামের আক্রমণকারী হলে ইলামের রাজাদের সহযোগী হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইলান আক্রমণের অনুমান ঠিক নয়।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার প্রাচীন ইরাকের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

"কাসসাইটরা আর্য্যজাতি, অনেক পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। জাগ্রোস পর্ব্বতাঞ্চলে ( বর্তমান লুরিস্তান প্রদেশে তারা বসবাস করত, পঞ্চদশ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকার উত্তর পশ্চিমভাগে মিটান্নি নামক দেশেও আর্য্য জাতির শাসন আরম্ভ হয়েছিল। কাসসাইটরা ছিল এই শাসকজাতিরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন রাজ্যের যখন বিলুপ্তি ঘটল তখন তারা সুযোগ বুঝে ব্যাবিলনে অনুপ্রবেশ করেছিল। কাসসাইটরা কালক্রমে সমগ্র রাজ্যটিকে অধিকার করে বসেছিল। এখানে এই জাতির আবির্ভাব হয়েছিল পারস্যের পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্যপ্রদেশ সমূহ হইতে। আসিরিয়রা এই জাতির নাম দিয়াছিল ক্যাসি, গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো কাসসাইট জাতির আদিনিবাস কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূল বলে নির্দ্দেশ করেছেন।" "সবিতৃদেবতাকে সূর্য্য নামে অভিহিত করে পূজা করত ক্যাসসাইটরা। ভারতীয় মারুত ও গ্রীক বোরিয়াস ছিল তাদের অন্যান্য দেবতা।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বোরিয়াস গ্রীসের দেবতা হলে—কাসসাইটদের সঙ্গে গ্রীকদের সংস্কৃতির সম্বন্ধ ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

"উরুমিয়া হ্রদের পশ্চিমে নবাগত আর্য্যরা মিটান্নী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৪৫০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে। এখানকার আর্য্যদের ভাষায় অনেক বৈদিক প্রাকৃতের ব্যবহার দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই জাতির সঙ্গে বৈদিক যুগের ভারতের সম্বন্ধ ছিল অভিন্ন। কাসসাইটদের বাসভূমি গিয়ান নামক স্থানে। মিটান্নীতে কাসসাইটরা. উর্বরা অর্দ্ধচন্দ্রের উত্তর দিক ঘিরে অবস্থান করছিল এরূপ মনে করবার কারণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যা মরগ্যান বলেন আর্য্যদের ব্যক্ট্রিয়া আক্রমণ ২৫০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঘটেছিল এবং মিডিয়গণ উত্তর পশ্চিম পারস্যে অনুমান ২০০০ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে প্রবেশ করেছিল।

এই মতবাদ গ্রহণ করে স্যার পার্সি সাইক্‌স্ মনে করেন কাসসাইটরা মিডিসদেরই একটি উপজাতি। ফুটনোটে, "গ্রিসম্যান বলেন, ২৪ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের একটি ইলামী শিলালিপিতে কাসসাইট জাতির নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।" ১৭৯

ডাঃ ভাণ্ডারকার দেখিয়েছেন, "এই রকম মিটান্নী নামটি ঋগ্বেদে অন্ততঃ ৩ বার আছে। সম্ভবতঃ ইলামের উত্তর পশ্চিমের মিটান্নীর সঙ্গে ইহার একত্ব সুদূরস্পর্শী হবে না। এই মিটান্নী খৃঃ পূঃ ১৪ শতকের বাগজোকাই ক্ষোদিতলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ সুদূরস্পর্শী হবে না যদি আমরা ধরে নিই যে কেশীরা খৃঃ পূঃ ১৮ শতকে বাবিলনিয়া আক্রমণ করেছিল। এরা ভাল অশ্বারোহী ছিল এবং ইহারা কাসসাইট বা কাশ্‌শি। ঋগ্বেদের অনেক জায়গায় কেশী অশ্বারোহীর কথা আছে। অধিকন্তু ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের চতুর্থ সুক্তে কেশী অর্থে অশ্ব ধরা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কেশী বলে জাতির উল্লেখ আছে। আর এই রাজার প্রজারা পাঞ্চাল জাতির শাখা।" (সাম এসপেক্টস অব এরিয়ান কালচার, ভাণ্ডারকার)। পৃঃ ২

## আর্যজাতির রাজনীতি গণতান্ত্রিক

আর্য্যজাতির বিশেষত্ব এই ছিল যে এরা যৌথসমবায়ে রাজ্যশাসন করা পছন্দ করত। হিট্টাইট, মিটান্নী, মিড্‌স, উরারুতু, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যে এই ব্যবস্থাই ছিল। কাসসাইটগণের মধ্যেও ইহাই ছিল। ইহাদের চিন্তাধারা গণতান্ত্রিক ছিল; বাবিলনে ইহারা জমিদারী ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়েছিল। "নেবুক্যাডনেজার কুড়ি বৎসরের কম ব্যাবিলনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। কাসসাইটরা যে জমিদারী ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন করলেন ভদ্র সমাজের সমর্থনলাভের জন্য। ১৮০

১৭৯ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; ইরানের উপকথা, পৃঃ ৪৬।

১৮০ মিথস অব ব্যাবিলনিয়া, পৃঃ ৩৮২

হিট্টাইটগণ প্যালেষ্টাইনে ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। প্যালেষ্টাইনে এদের আর্য্যসংশ্লিষ্ট নামের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে—ইহা হিট্টাইটদের আর্য্যসংস্কৃতির প্রমাণকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তার Studies in Indian Antiquities গ্রন্থে মিটান্নী, হিট্টাইট ও কাসসাইটদের নাম সম্বন্ধে আর্য্যসংশ্রবের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি সুবিদিত বাগাজোকুই লিপির নামগুলি ছাড়া প্যালেষ্টাইনে কয়েকটি নূতন নাম উল্লেখ করেছেন। "In Palestine we come accross such names as "Beridaswa ( বৃহদাশ্ব ), Yasdata ( যজদাত ) and Suwaradata ( সূর্য্যদত্ত )। ১৮১

( Studies in Indian, Antiquites, p. 53. )

## হুরিয়ান সংস্কৃতি

ইতিপূর্ব্বে পারসিক জাতিকে অসুর বা অহুররূপী মহাদেবের পূজক বলে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। হুর বা সুরেরা ছিল এদেরই সগোত্র। আদিবৈদিক যুগে এরা একত্র ছিল। এ বিষয়ের প্রমাণ বেদেই আছে। সুরগণও অসুরদের মত সিন্ধু সংস্কৃতির জন্মভূমিতে বাস করত। চিত্রল উপত্যকার উত্তরে ইন্দ্রালয় বলে একটা স্থানকে অনেক বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রের রাজধানী বলে নির্দ্দেশ করেছেন। যাহা হউক, এ সমস্ত ব্যাপার আদি-বৈদিক যুগের এবং শেষ সিন্ধুযুগের। ইহারা তখন অনেকেই জলবায়ুর তাড়নে যাযাবর। পারসিকগণ বা অহুরগণ সঞ্চরণ করলেন উত্তরে জাগ্রোস পর্ব্বতের উত্তরে কাশ্যপ হ্রদ ও অক্ষুর তীরে এবং বাহ্লীকে। আর হুর বা সুরেরা সমতল উর্ব্বর জমি সিন্ধু ও গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস এবং উর্ব্বর, অর্দ্ধচন্দ্রের পূর্ব্বদিকে বসতি করল। সুরেদের বংশই মিটান্নী, হিট্টাইট, কাসসাইট ও হুররাইট। ইহারাই আরমেনিয়া,

১৮১ Cambridge Ancient History, 1312, p. 553.

সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, আইওনিয়া এবং গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ইউরোপেও পশ্চিম এশিয়ার আর্য সংস্কৃতি ইহাদেরই দান।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখেছেন, "The earliest records of presence of demonstrably Hurrian Onomastic elements (personal and place names) goes back to Mesopotamian records of the late 3rd Millenium notably that of the 3rd dynasty of Ur. These point uniformly to the area east of the Tigris and the mountain region of zagros as the Hurian habitat and the gradual penetration to Mesopotamia proper.

From thereon specially during the early 2nd Milienium B. C., there is scattered evidence of a westward spread of Hurrians.

Northern Syria was considerably Hurianised in the 18th Century B. C. An even greater westward migration must have taken place after 1700 B. C. probably issuing from the area, between Lake Van and the Zagros. This Hurrian was probably set in motion by the intrusion of Indo-Iranians from the north into the region of the later Iran and is connected with the approximately, contemporary incursions of the Kassite into Babylonia and perhaps of the Hyksos into Egypt.

There is every indication that Hurrians overthrew the Assyrian dynasty of Samsi Adad and Ishure Dagon and subsequently dominated Assyria.

East of Tigris, the flourishing commercial centre of Nuzi was a basical Hurrian community as is shown by proper names and various records.

Hurrian names predominate in Acalakh and Ugarit has yielded its Cannanite records.

Hurrian religious texts are in alphabetic cunieform—a conventional syllabic Summero-Hurrian-Vocabulary and a short Hurrian Akkadian bilingual document.

Yet the Hurrian hinterland during the period of maximum expansion, was the country known as Hurri, where the political units were denominated by dynasty of Indo-Iranian regime.

In 15th Century, their principalities and their dependencies ranging from the Iranian mountains to Syria were united into a state, called Mitanni or Hamigalliat, under the leadership of an Indo-Iranian warrior Mariumma which like the royal names আর্ত্তম, সৌসাস্তার has a clearly Indo-European Etymology.

The carvings of Yazilkaya suggest that the official pantheon of the empire was thoroughly Huri through the inclusion and syncretisation of Hurrian deities specially Teshab and Habat. Hurrian culture texts were found at the capital site of Huttusas. Hittite queens had Hurrian names and Hurrian mythology appears in Hittite epic poems. Moreover Indo-Iranian overlords of Mittani had introduced horse breeding and chariot warfare into near East

and Mitanni specialists in this line were engaged by the Hittites at Hattusees.

The principality of Hayashe in the Armenian mountains were another Hittite dependency.

Suppululimmas in a famous treaty with its ruler Huquenas warns him against certain incestuous family relations which seem to have been originally current among the Hurrians under frartactual system also attested at traces at Nuzi.

The people of the Haldian or Khaldian kingdom of Urarutu during 9th to 7th Century B. C. spoke a language definetely Hurrian. Yet the typical Hurrian Armenoid physical type had left its lingering imprint on the racial features of the Near East." ১৮২

## স্ট্রকভেলের হুররীর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

হুররি জাতি সম্বন্ধে ইউ এস এস আর এর Acamedian স্ট্রকভেলের সিদ্ধান্ত, Dr, Bhupendranath Dutta, তাঁর Vedic Ritualism গ্রন্থের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—উহা এই, "সিন্ধুসভ্যতার মানুষ ছিল হুররি। বাগজোকাই লিপি থেকে জানি যে এরা মিটান্নীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং হুররির সংস্কৃত ভাষা মূলীয় সম্বন্ধ আছে। লিপিতেও বৈদিক দেবতার পরিচয় আছে। নিঃস্বার্থ পণ্ডিতলোকের সিদ্ধান্ত যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষের সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা লক্ষ্য করার বিষয়। ইহা

১৮২ En. Brit, Hurrian, P. 905

আমাদের নিজ সিদ্ধান্ত যে ভারতীয় আর্য্যগণের এই সভ্যতায় অস্তিত্ব ছিল।"

স্কফিল্ড লিখেছেন, "মিটান্নীরা আর্য্যগোত্র সম্ভব বলেই মনে হয়। তারা হুরী ভাষায় কথা বলত, বর্তমানে ককেশাস পর্বতে যে ভাষায় কথা বলে। ইহা সম্ভব যে ওল্ডটেষ্টামেণ্টে যাদের হোরাইট বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা হয়তো হুরিয়ান এবং এই গোত্র সম্ভূতা।" ১৮৩

## পারসিক ভাষা ও লিপি

ইলামী ভাষার লিপির খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকে ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ; "At the beginning of the 5th Century B. C. letters in this script dropped out, as the spoken Babylonian language fell into disuse.

The reason for this apparently curious sequence in dropping the various cunieform scripts is that the early Persian writing was in Pustu, an alphabet of 40 characters (language and Indo-European Idiom) and now Elamic system was a quasi syllabic script, the Babylonean on the other hand was a transional system with over 640 signs and Sumerian script presented an additional difficulty *i. e* language was quite unknown. (Alphabet p. 55 )

ডাঃ ডিরিঞ্জার অন্যত্র লিখেছেন, "Persians seem to have spoken ancient Iran dialect akin to Sogdian and lived in the mountainous country north of the Caspian sea.

About A. D, 220, Sassanians, a still more

১৮৩ ব্রি, ব্যা, অ, বা, স্কফিল্ড, পৃ ১৭)।

definitely Persian Oriental dynasty which lasted till the coming of Islam. The monarchy was strongly Persian, representing a revival of Persian nationality and Zorastrian religion. The Sogdian speech were-widely used in Central Asia for many centuries and particularly in the 2nd half of the 1st. Milenium A. D., as proved by trilingual (Turki, Sogdian and Chinese) inscriptions of the 9th century of Osara Belgusum on the Orkhuse, the then capital of the vast Ughir empire. This important movement seems to mark the northern limit of diffusion of the ancient. Sogdian speach, while its southern limit seems be marked by a stone inscription discovered in Ladakh, on the Tibetan frontier. Sogdian was actually the Lingua Franca of the Central Asia." (Alphabet p. 304 and 312)

উক্ত উদ্ধৃতিতে ডাঃ ডিরিঞ্জার যা বলেছেন তাহা মোটামুটি এই রকমঃ (১) ইলামীয় ১১৩ বর্ণের এবং ৮০ সিলেবলের লিপির পর প্রাচীন পারসিক ভাষার লিপির উৎপত্তি হল। (২) ইহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ শতকে পর অর্থাৎ পারস্য সম্রাজ্যের উৎপত্তির পরে। (৩) ইলামীয় ও অন্যান্য কীলক অক্ষরের লিপির ব্যবহার লোপ হওয়ার কারণ (ক) পারসিক লিপি পুস্তু ভাষায় ছিল এবং উহার ৪০টি বর্ণ ছিল। (খ) ইলামীয় অক্ষর ছিল উপ-সিলেবিক অক্ষর। (গ) ব্যাবিলোনীয় অক্ষর ছিল ৬৪০টি চিত্র চিহ্ন দ্বারা বিশিষ্ট। (ঘ) সুমেরীয় ভাষা এই সময় অপরিচিত থাকায় আরও বেশী অসুবিধা ছিল। ডাঃ ডিরিঞ্জারের উক্তির মধ্যে ভুলতত্ব বাদ দিয়ে স্বীকৃতি পাই যে পুস্তু ভাষা এবং ৪০টি অক্ষরের লিপি পারসিক

সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হত। ইহা ইন্দো-ইউরোপীয়ান। পারসী ভাষা যে শকদিয়ান ভাষার অনুরূপ, তাহা ডাঃ ডিরিঞ্জার স্বীকার করেছেন। এদের বাস কাশ্যপসাগরের উত্তরে ছিল না—উহার দক্ষিণে ছিল।

পারসিকগণের প্রাচীন ভাষাটি জেন্দ। সাম্রাজ্য বিস্তারকালে তাদের ভাষা ছিল পহ্লবী অর্থাৎ বাহ্লিকী। এই বাহ্লিকী ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত হত। ইহার বর্ণ সংখ্যা ছিল ৪০টি। আমরা জানি বৈদিক অক্ষরও ছিল ৪০টি এবং উহা শব্দ তাত্ত্বিক বর্ণ। সুতরাং এই তথাকথিত পুস্তু ভাষা প্রকৃতপক্ষে পল্লবী ভাষা এবং উহার অক্ষর ছিল ৪০টি অর্থাৎ বৈদিক অক্ষর। রাজকার্য্যে আরামাইক লিপি ব্যবহৃত হত, কারণ উহা পশ্চিম এসিয়ার lingua franca. পারসিক সাম্রাজ্যের যুগে যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হত—এ কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যবহার না করে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে। স্পষ্টভাবে বললে ব্রাহ্মী লিপি যে ফিনিসিয় লিপি থেকে উৎপন্ন, একথার ভিত্তি থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে এই ৪০ অক্ষরের লিপি, যাহা ইরাণী আর্য্যরা ব্যবহার করত তাহা ভারতীয় অক্ষরের শব্দতাত্ত্বিক লিপি। ইহা বৈদিক মাহেশ লিপিরই অনুরূপ। ইহার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হয়েছে। ইহার গঠন রীতি এ্যালফাবেটের মত নয়।

ফিনিসিয় বা আরামাইক এ্যালফাবেট যাহা পারসিক সাম্রাজ্যের রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হোত তাহার ব্যাপক প্রচার হয় পারসিক সাম্রাজ্যেই, সুতরাং ভারতীয় লিপির উদ্ভব হয়েছে এ্যালফাবেট থেকে—পাশ্চাত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিপূর্ণ হতে পারত যদি পারসিকগণের সময় ব্রাহ্মী লিপি না থাকত।

এই সময় কাশ্যপ সাগর থেকে অক্ষুতীরবাসী শক, বাহ্লিক, প্রভৃতি দেশে এবং মধ্য এসিয়ার একটি বিরাট সাম্রাজ্যে এই ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হ'ত। এই কথা ডাঃ ডিরিঞ্জার প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন নিজেই। সুতরাং পারসিকদের মধ্যএসিয়ায় আবির্ভূত হওয়ার সমসাময়িককাল থেকেই এই লিপির

প্রচলন হয়েছিল—তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। আর আমরা দেখেছি যে প্রত্নতাত্ত্বিক লিপির প্রমাণেই পাওয়া যাচ্ছে যে আফদাই, মাদাই ও পারশু নামক জাতির কয়েকটি সর্দ্দার খৃষ্টপূর্ব দশ শতকের আগেই মধ্য এসিয়ায় প্রভাব বিস্তার করছিল। ইহারই দু-এক শতকের মধ্যে ব্যাবিলনে বিরাট পারসিক সাম্রাজ্যর উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং এই অনুমান অসঙ্গত হবে না যদি বলা যায় যে এরাই ব্রাহ্মী লিপি মধ্য এসিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল।

## সিন্ধু লিপির বিবর্ত্তন।

ডাঃ ডিরিঞ্জারের মতে সিন্ধু লিপির অক্ষর প্রায় ৩০০টি; ইহা আংশিকভাবে ভাবাত্মক ( সম্ভবতঃ সিলেবিক এবং অংশত ধ্বন্যাত্মক। এবং তিনি একথাও স্বীকার করেন যে কীলকাক্ষরের এবং এলামীয় অক্ষরের একমূল থাকা সম্ভব, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন অসম্ভব।• হিট্টাইট ভাষা বিশেষজ্ঞ হ্রুনজির মতে সিন্ধু ভাষার ১১০টি সিলেবল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধ্বন্যাত্মক চিহ্ন এদের মধ্যে কমপক্ষে ৮৬টি, ৬টি মূল শব্দের চিহ্ন।

ইলামীয় লিপি সম্বন্ধে ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন যে উহা সিলেবিক, উহার অক্ষর সংখ্যা ১১৩ এবং ইহার সিলেবিক চিহ্ন ৮০টিরও উপর।

ব্যাবিলনের লিপি সম্বন্ধে ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, যে এই ভাষায় চিত্র লিপিতে ৬৪০টি চিহ্ন ছিল।

হিট্টাইট ভাষার সঙ্গে মিটান্নী ও হুরাইট কাসসাইটের ভাষার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। এদের ভাষায় দু-প্রকার লিপিই পাওয়া যায়। চিত্রাক্ষরীয় ও কীলকাক্ষরীয়—দুপ্রকার হিট্টাইট লিপি পাওয়া গেয়েছে।

ডাঃ ডিরিঞ্জার এদের লিপি সম্বন্ধে লিখেছেন, যে এদের ২২৮টি চিত্রাক্ষর, কিন্তু মিরিগণের মতানুসারে ইহার অক্ষর ৪১৯টি। এরা সম্পূর্ণ ভাবাত্মক লিপি এবং অংশতঃ শব্দতাত্ত্বিক। গিল্ডের মতানুসারে ওদের ৫৭টি চিহ্নের সিলেবিক মূল্য আছে।

ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, 'In Hronzy's opinion the Cretean language was Indo-European holding a mediate position between the language of the Hittite cuneiform inscriptions and the language of the Hittite Hieroglyphic writing." (Alphabet p.77)

ভাষার আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষর থাকবেই। ঐ চিত্রাক্ষরের সংখ্যা থাকে অনেক। ইহার উদাহরণ চীনের চিত্রাক্ষর। ক্রমশঃ ঐ চিত্রাক্ষর ভাবাক্ষরে পরিণত হয়। একটি চিত্র থেকে তার ভাব গ্রহণ করে সমজাতীয় চিন্তা দ্বারা ভাবাক্ষরের সৃষ্টি হয়। এই ভাবাক্ষরও সংখ্যায় বেশী থাকে এবং ইহা বিভিন্ন মানুষের পক্ষে বিভিন্ন হয় বলে উহাকে সার্ব্বজনিক করার চেষ্টা হয়। ভাবাক্ষর সার্ব্বজনিক করার চেষ্টাতেই এ্যালফাবেটের জন্ম। ইতিপূর্ব্বে হরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতি দিয়ে ভাবাক্ষর থেকে কিভাবে এ্যালফাবেট উৎপন্ন হয়েছে, তাহা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাবাক্ষর থেকে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় সঙ্কেতগুলিই হয় এ্যালফাবেটের অক্ষর। সুতরাং ইহার মূল কাল্পনিক। যেভাবে এ্যালফাবেটের অক্ষরগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, ইহার সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। চিত্রাক্ষরের সংখ্যা ব্যাবিলনীয় ভাষাতেই বেশী। চিত্রাক্ষর সংখ্যায় বেশী হয়, যত ইহার বিস্তার হবে। বাবিলনীয় সাম্রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল বলেই ইহার অক্ষর ছিল ৬৪০টি। সিন্ধুর লিপির অক্ষর সংখ্যা ছিল ৩০০। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই সময় সিন্ধু-সভ্যতার অক্ষর খুব বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই এবং ধ্বন্যাত্মক অক্ষর প্রচলিত হয়েছিল।

তারপর এলামীয় লিপির অক্ষর সংখ্যা ১১০টি। এই অক্ষর সংখ্যার হ্রাসের কারণটি সম্ভবতঃ ইলামীয় অধিকাংশ অক্ষর ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা নির্দেশিত হওয়ার ফলে। চিত্রলিপির যেমন বিস্তার হয়, লোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, শব্দ তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক রীতিগ্রহণের ফলেই ঐ বিস্তারকে

সংযত করা সম্ভব। ভাব-লিপির ও চেষ্টা চিত্রাক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করা। সুতরাং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত এ্যালফাবেট লিপি প্রবর্ত্তন করতে হলে যে জাতির সংস্কৃতি দূর-দুরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাহাদের দ্বারাই উহা সম্ভব। ফিনিসিয় জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল। ইহারা ভাবলিপির সঙ্কেত গ্রহণ করেছিল। আর সেই সঙ্কেতটিই এ্যালফাবেট। ইহা সকলেই রাজকার্য্য ও হিসাব রক্ষার জন্য উপযোগী মনে করেছিল। এই সঙ্কেত গ্রহণ করার কৃতিত্ব ফিনিসিয়দের—তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু লিপির অক্ষরের সংখ্যা হ্রাস করার যে মৌলিক কৃতিত্ব, তাহার মূলে সিন্ধুভাষার লিপির ক্রমবিকাশ। আমরা দেখেছি সিন্ধুভাষার লিপির মধ্যে ভাবাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক দুই প্রকার অক্ষরই ছিল। এই ধ্বন্যাত্মক অক্ষর, বৈজ্ঞানিক ইহা—অক্ষর-সংখ্যা হ্রাসের কারণ। প্রথম থেকেই সিন্ধু, ধ্বন্যাত্মক অক্ষর প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিল। এই ধ্বনিকে এলামীয় ভাষায়ও পাওয়া যায়, কারণ এলাম সিন্ধু থেকেই জাত। সেই সময় সিন্ধুর ভাষার অক্ষর আরও হ্রাস হয়ে ১১৩টিতে দাঁড়িয়েছে। এলামীয় ভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং সিলেবিক—দুই রকমই ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই দুই মূল ভাষায়ই ধ্বনিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এর পরে হিট্টাইট ভাষা আরও অগ্রসর হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে ৫৭টি অক্ষর সম্পূর্ণ সিলেবল—তাত্ত্বিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সিন্ধুভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ধ্বনিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং এই ধ্বনিতত্ত্ব হিট্টাইট ভাষার সিন্ধু ভাষার সঙ্গে এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ।

ক্রীটের লিপি এখনও উদ্ধার হয় নাই বটে কিন্তু ঐ লিপি হিট্টাইট লিপির পাঠোদ্ধারকারী হ্রুনজির অভিমত এই যে এই লিপির ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান এবং ঐ লিপি হিট্টাইট চিত্রলিপি ও হিট্টাইট কীলক লিপির মধ্যবর্ত্তী অবস্থার। সুতরাং এই হিসাবে ক্রীট লিপিও ধ্বনিতাত্ত্বিকতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে Alphabet-এর প্রাচীন ২২টি অক্ষরের মধ্যে ১২টি অক্ষরের সঙ্গে সিন্ধুলিপির অক্ষরের সাদৃশ্য আছে

বলে স্বামী শংকরানন্দ মত প্রকাশ করেছেন। ইহা যদি সত্য হবে তবে Alphabet-এর অক্ষরও সিন্ধু অক্ষরের ক্রমবিকাশের ধারার অনুগত যাত্রী বলেই ধরতে হয়। উহার পক্ষে পৃথক গৌরবের আর কিছু নাই। Taylor ও এই সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন।

## সিন্ধুভাষার বিবর্ত্তন

হিট্টাইট ভাষার পাঠোদ্ধার করে হ্রুনজি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন যে হিট্টাইট ভাষাটি ইণ্ডো-হিট্টাইট অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে যুক্ত। ভারতবর্ষের সঙ্গে হিট্টাইটের সংযুক্তির খবর খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরের সময় সোজাসুজিভাবে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। এই জন্য হ্রুনজি হিট্টাইট জাতিকে আরও হাজার বছরের আগে নিয়ে সিন্ধু যুগে ফেলেছেন। এই যুগে ইহাকে বৈদিক ভাষা আখ্যা দেওয়া বা অন্য কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে এই মত খাঁড়া করা যায় না। হ্রুনজির ইন্দো-হিট্টাইট মতটি খাঁড়া করতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক হিট্টাইটের ধারণা ত্যাগ করে ইণ্ডো-হিট্টাইট শব্দ দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়ে ইণ্ডো-হিট্টাইটকে বিশেষিত করতে হবে।

ইণ্ডো-হিট্টাইট অর্থে যদি সোজাসজি ভাবে সিন্ধু জাতি বলে ধরে নেওয়া যায় তা'হলে তাতে কোন গোজামিল দিতে হয় না। আমাদের এই পুস্তকে এই কথাটারই সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

সিন্ধুর ভাষা ক্রমবিকাশের নিয়মে বৈদিক যুগের সংস্কৃত ভাষায় বিবর্ত্তন লাভ করেছে। সিন্ধু যুগে ভাষা ছিল নিয়ম শৃঙ্খলাহীন। সিন্ধুর মানুষগুলি যেখানে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা অর্থাৎ হ্রুনজির প্রোটো হিট্টাইট ভাষা নিয়ে গিয়েছে।

সিন্ধুর মানুষ অর্থাৎ হ্রুনজির প্রোটো-হিট্টাইট মানুষ জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে যাযাবর হয়ে বেরিয়ে পড়ল, সুমের, ক্রীট, ইলামে। তার পর যারা ভারতের ভিতরে গেল এবং পরে যখন অক্ষু ও ইরাণের উর্ব্বর উপত্যকা, ভ্যান হ্রদের উর্ব্বর উপত্যকা ও

সেখান থেকে মেসপটে মিয়ার উর্ব্বর অর্দ্ধচন্দ্রে যেয়ে বাস করতে থাকল—দ্বিতীয় বারে—তখন খৃঃ পূঃ ২০০০ সাল। এটা লৌহযুগ।

## সিন্ধুভাষার মৌলিক রূপ

ইতিমধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারত সীমান্তে সিন্ধুভাষার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়েছে, বাইরে যারা গিয়েছে তাদের তুলনায়। দ্বিতীয় বারের উপনিবেশিকরা এই উন্নত ভাষার উত্তরাধিকারী। এই উন্নত ভাষার নাম আদি বৈদিক ভাষা। এই ভাষাই প্রত্নতাত্ত্বিক হিট্টাইটদের ভাষা ছিল। হুনজির ইন্দো-হিট্টাইটদের ঐ ভাষা ছিল না—তাদের ছিল এই ভাষার মূলের ভাষা—শাব্দিক ভাষা, এগ্লুনেটিভ, বিভক্তি প্রত্যয়হীন শব্দ রাশি। তবে এই শব্দ গুলির মধ্যে ছিল অধিকাংশই মৌলিক শব্দ যাহা, উচ্চারণে কোন জটিলতা থাকে না—অর্থাৎ ধ্বনি মূলীয় শব্দ। এই ধ্বনিমূলীয়শব্দের বিশেষত্ব হচ্ছে—সুর বা সঙ্গীতের ভিত্তি। সুর বা স্বর মূলে ছিল বলেই সিন্ধুর লিপির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণ পাওয়া গিয়েছে।

ইহার পর ক্রমবিকাশে ধ্বনিকেই অবলম্বন করে ভাষার বর্ণ সৃষ্টি করা হল। এই ধ্বনির ভিত্তির উপর বৈদিক ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাকরণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর ভাষা ও ব্যাকরণে পরিণত হল। ভাষার উন্নতির জন্যই বৈদিক জাতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, বলে পরিচিত হল। ইহার গৌরব মাখার জন্যই নর্ডিক তত্ত্বের গোঁজামিলের সৃষ্টি হয়েছে। এই গোঁজামিলের জন্য ভাষা, জাতি ও ধর্ম্মের ইতিহাসের ধারাবাহিক সম্বন্ধ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় উপনিবেশের কালে আদিবৈদিক ভাষা সৃষ্টি হয়েছে উহার নামই আর্য্য ভাষা। ইহার আগেকার ভাষার নাম আর আর্য্য ভাষা দেওয়া যায় না। উহা সিন্ধু ভাষা।

ফিনিসিয়, হিট্টাইট, মিটান্নী প্রভৃতি জাতি ভারতের উত্তরের

অঞ্চল থেকে থেকেই এই আর্য্য ভাষা নিয়ে বাইরে গিয়েছে। এই ভাষার শব্দতত্ত্বই শুধু নয়—এদের সঙ্গের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগুলি সম্পূর্ণই বৈদিক। স্থানীয় জাতিগুলির মধ্যে এরা মিশে নূতন নূতন জাতি ও ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় মৃধ্রবাক জন-সমষ্টির ভাষা, এদের উন্নত ভাষা মিশে অপভ্রংশরূপে বিবর্ত্তিত হয়েছে।

## স্বরভেদের সূত্রে জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না

শব্দের মিশ্রণে ধ্বনি বিকৃত হয়—এমন কি এক জাতির মধ্যেও কণ্ঠস্বর যন্ত্রের পার্থক্যের জন্যও কালবিবর্ত্তনে ভাষার পরিবর্ত্তন হয়, ইহা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং স্বর বিভেদের সূত্র ধরে জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। নর্ডিক তত্ত্ববাদীদের এই প্রচেষ্টায় ভাষাতত্ত্বের মধ্যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে।

দ্রাবিড় ভাষার কথাও তাই। দ্রাবিড়জাতি বলে কিছু ছিল না। ব্রাহুইগণ দ্রাবিড় জাতি নয় এবং তাদের ভাষাও দ্রাবিড় ভাষা নয়। ব্রাহুই ভাষা সংস্কৃত ভাষার একটি প্রাকৃত রূপ। ইহার সম্বন্ধে বেলুচিস্তানের লাসবেলা গেজেটিয়ারে আলোচনা আছে। যদি দ্রাক্ষিণাত্যের শব্দ ইহাতে দুই একটি থাকেও, উহা দাক্ষিণাত্যের আদিম ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণের জন্য প্রতি প্রদেশে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়ে পরবর্ত্তী ভাগে আলোচিত হবে।

সিন্ধুসভ্যতা একটি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিটি একটি ব্যাপক এলাকা নিয়ে উত্তর ভারত থেকে মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়া—তথা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে নানা আকারের ও নানা রংয়ের জাতি ছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে স্থানে স্থানে গ্রাম্য সভ্যতার মধ্যে অষ্ট্রীকজাতিও ছিল, তারাও এই সভ্যতার উপাদান। তারাও এই সমস্ত অঞ্চলে আগে থেকে ছড়িয়ে ছিল। আরও অন্যান্য জাতিও ছিল। সুতরাং এই সংস্কৃতিটিকে কোন একটি জাতির

আয়তনের মধ্যে আনা যায় না। ইহা একটি প্রবহমানউন্নতিশীল জন-সমষ্টির কালক্রমিক ধারা।

## ডাঃ ডিরিঞ্জারের অযাচিত উপদেশ

ইতি পূর্ব্বে ডাঃ ডিরিঞ্জারের মত গুলি বিচার করে দেখা হয়েছে। এখন তার ব্রাহ্মীলিপি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রতি উপদেশ আলোচনা করব। তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব, প্রশ্নের ঠিক পরেই দেওয়া হবে।

তিনি লিখেছেন, "The Indian scholars who patriotically consider the ব্রাহ্মী as the descendant of an indegenous prehistoric script may be reminded of the following facts.

Q 1. "The existence in the same country more script does not prove that one depends on the other, for instance early Greek Alphabet employed in Crete did not descend from the early Cretan or Minoean scripts."

এই তুলনাটি ভারতবর্ষের লিপির সঙ্গে খাটে না, কারণ প্রাচীন গ্রীক লিপি যাহা ক্রীটে পাওয়া গিয়েছে, তাহা ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতার প্রায় দেড়হাজার বছর পরে গ্রীসে প্রবেশ করেছে। আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লিপিগুলি বাহির থেকে আমদানী হয় নাই। তবে এই তুলনায় উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা ব্রাহ্মী-লিপিই যে বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক লিপির জননী, এ বিষয়ে কোন ভাষা তাত্ত্বিকের দ্বিমত নাই।

আমরা দেখিয়েছি যে ফিনিসিয়-হিট্টাইট উপনিবেশরই বিস্তৃতি-গ্রীস, সুতরাং ক্রীট, ফিনিসিয়, হিট্টাইট ভাষারই সন্তান গ্রীকভাষা।

এই হিসাবে গ্রীকভাষার আদিতত্ত্বই ক্রীট—তাহা বলা যায়। এই বিষয় গ্রীক সংস্কৃতির পৃথক আলোচনায় আরও অনেক প্রমাণ দেখান হবে।

Q. 2. Even if similiarities would be proved between the shapes of Indus Valley characters and Brahmi letters, evidence will be still lacking unless the likeness of the signs belonging to the two systems corresponds with the identity of the phonetic values. In this connection Minoean script as well as Cyproid syllabery contained many signs resembling early Greek letters but one was not derived from the other.

সিন্ধুলিপির অক্ষরের পাঠোদ্ধার হয় নাই সেই জন্য এই ছল গ্রহণ করা হয়েছে। সত্য বটে অক্ষরগুলির phonetic value এখনও সঠিকভাবে স্থির করা যায় নাই, তবুও যতটুকু পাওয়া গেয়েছে তাতে ল্যাংডন, হুনজি, কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক বাক্যেই স্বীকার করেছেন ইহা ভারতীয় ভাষারই লিপি।

এ কথার উপর জোর না দিয়েও বলা যায় যে সংস্কৃতি, ভাষার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য সত্য। আমরা সাংস্কৃতিক অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে, সিন্ধুর সংস্কৃতিই ভারতের বর্ত্তমান জাতিগুলির মধ্যে এখনও অবিকৃত রয়েছে, এবং বৈদিক সংস্কৃতি সিন্ধুরই ক্রমবিকাশ। মার্শাল প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকের যুক্তিগুলির ভুল এই পুস্তকে ভাল করে খণ্ডন করা হয়েছে। মিনোয়ান অক্ষর মিশ্র চিত্রাক্ষর, তার সঙ্গে গ্রীক ভাষার সংক্ষিপ্তাক্ষরের গতানুগতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অবশ্য ভুল সন্দেহ নাই, কিন্তু অক্ষরের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করতে হলে সিন্ধুর অক্ষবের ধারা বহন করেই যে ক্রীট, ইলাম হিট্টাইট অক্ষরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়—ইহা ইতিপূর্ব্বে

আলোচিত হয়েছে। এ্যালফাবেটের সংক্ষিপ্তীকরণ—প্রয়োজনীয়তা বাদ দিলে ভাষাতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গ্রীক সংস্কৃতি যে সিন্ধু সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং মিনোয়ান সংস্কৃতি ঐ প্রাচীন সিন্ধুর বংশলতিকার একই ধারা—তাহা প্রমাণ হবে। ফিনিসিয় alphabet এর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি অক্ষরের সঙ্গে সিন্ধু তথা হিট্টাইট ও ব্রাহ্মী অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। ইহা ক্রমবিকাশের ধারার নিদর্শন বলে সিদ্ধান্ত করার অন্যতম কারণ।

Q, 3. The main aceptance in the origin of alphabet is not invention of signs but the establishment of an alphabetic system of writing.

Thus Indus Valley script was presumbly a transitory system or a mixed syllabic ideographic script, whilst the Brahmic script was a semi alphabet. As far as we know our syllabic ideographic script became alphabetic without the influence of another alphabet script and this was more important historically than the material origin of such signs. No scholar has ever tried to show how the Indus Valley. idiographic script could have developed into Brahmic semi-Alphabetic writing.

ডাঃ ডিবিঞ্জার Alphabetic systems-এর গুণগান করেছেন এবং বলেছেন এক চিহ্নের অক্ষর না হলেও ইহার অন্য কোন লিপির নিকট ঋণ স্বীকার নাই—সেইজন্য ইহার ঐতিহাসিক গৌরব বেশী।

সংক্ষিপ্ত লেখন হিসাবে উর্দ্দুর মূল্যও কম নয়। বর্ত্তমানের phonetic short hand ও আছে; ইহার কার্যোপযোগিতা স্বীকার করা যায়। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি থাকতে পারে? শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপায়ণের সঙ্গে alphabet-এর গুরুত্ব কি আছে? এই system

ব্যবসার মহলের বলে সকল ব্যবহারিক কাজে সকল ভাষাভাষী ও সকল সংস্কৃতির লোকে গ্রহণ করেছিল।

এই বিস্তৃত ব্যবহারের জন্য ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন কি হয়েছিল? তা হয় নাই, কারণ ইহা কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রবর্ত্তক ছিল না। ইহা ফিনিসিয়দের দ্বারা সৃষ্ট হলেও ইহার সঙ্গে ফিনিসিয় সংস্কৃতির সম্বন্ধের বিশিষ্ঠতা কিছু ছিল না। ফিনিসিয় সংস্কৃতি মূলতঃ সিন্ধু এবং আর্য্য সংস্কৃতির সঙ্গেই সম্বন্ধযুক্ত।

ইহা হিট্টাইট আর্য্য সংস্কৃতির সগোত্র এবং ভ্রাতৃব্য। ফিনিসিয় ও হিট্টাইট সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার ছিল গ্রীকসংস্কৃতির। সুতরাং ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে এ্যালফাবেটের মূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হতে পারে না কারণ সিন্ধুর সংস্কৃতিই হিট্টাইট ও ফিনিসিয় লিপির ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সিন্ধুলিপি ক্রমবিকাশের সূত্রে অন্যান্য লিপির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। ইহা transitory systain তো বটেই। ইহাই তার গৌরবের কথা কারণ ইহা ক্রমবিকাশশীল।

ভাষার বিকাশের পথ থাকলে সেই ভাষাই জীবিত ভাষা এবং সেই ভাষার সম্পর্কিত লিপিও সেইজন্য জীবিত। Alphabet কোন শাশ্বত, সার্ব্বজনীন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের নিয়মের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত নয়। ইহার সঙ্গে যে সকল রাজ্য ও জাতি সম্বন্ধ যুক্ত, তাদের ভাষা সর্ব্বাত্মক ও শাশ্বত নয় এবং সেই সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গেalphabet এর সম্বন্ধ নাই।

পক্ষান্তরে ভাষার গতির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির যথেষ্ট ভাবে হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা ছিল বলে, ইহার মূলবর্ণ সংখ্যা বৃদ্ধি না করেও সংযুক্ত বর্ণ এবং বলমাত্রাদি দ্বারা ভাষার শব্দের সঙ্গে ভাষার নমনীয়তার সঙ্গতি রক্ষা দ্বারা, ইহা সীমাহীন চিন্তারাশিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। ইহার কারণ ইহা বিকাশের ভাষা।

ভাষার নমনীয়তার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির প্রকাশ ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধির

করায় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় সূত্রসাহিত্যের মত সংক্ষিপ্ত প্রকাশের ক্ষমতা এবং পুরাণ কাব্যসাহিত্যের বিস্তৃত বিকাশের মধ্যে। Alphabetএর দ্বারা ইহা সম্ভব হতে পারে না।

Alphabet শৃঙ্খলাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত ২২টি syllablesএর মধ্যে মানুষের মনের সীমাহীন চিন্তারাশি আবদ্ধ করে রেখেছে। ইহার শব্দ প্রকাশ ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং ইহার—ভাষার সঙ্গে শব্দের সমান তালে চলবার ক্ষমতার অভাব।

তারপর ডাঃ ডিরিঞ্জার স্পর্দ্ধার সঙ্গে বলেছেন যে কোন পণ্ডিত এপর্য্যন্ত সিন্ধুরলিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির ক্রমবিকাশের সূত্র দেখাতে পারেন নাই। এই স্পর্দ্ধার কারণ—নর্ডিকবাদী পণ্ডিতদের সিন্ধুর সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার অনিচ্ছাজনিত। সকলেই আর্য্য-আক্রমণ তত্ত্বের ধ্বজা ধরে আছেন; ঐ ধ্বজা না ছাড়লে উভয় সভ্যতার সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা হতে পারে না। এই গ্রন্থে ঐ আর্য্য-আক্রমণ তত্ত্বের আপত্তির সর্ব্বাঙ্গীন খণ্ডন করেছি। ইহাতে আর ক্রমবিকাশের সূত্রে কোন গোঁজামিল পাওয়া যাবে না।

Q 4. Extensive Vedic lIterature gives no indication of writing in early Aryan India.

ইহাতে কিছু সত্য নাই। আমরা দেখেছি যে ব্রাহ্মীলিপি যাজ্ঞিক লিপি। ইহা বৈদিক যজ্ঞের সমসাময়িক। কিন্তু যজ্ঞের সভাপতি ব্রহ্মারই শুধু এই লিপির অধিকার ছিল বলে ইহা বহুদিন গুপ্ত ছিল। জরাথুষ্ট্রের সমসাময়িক কালে এই লিপি প্রচার লাভ করে। ইহার পূর্ব্বেই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থে ঐ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

Q. 5. Only the Buddhist literature gives reference to writing. We may assume that in the 5th Century B. C, knowledge of writing was wide-spread (Panmi is cited in support).

ডাঃ ডিরিঙ্গার পাণিনিকেই ব্রাহ্মী লিপির প্রথম উদ্ভাবক মনে করেছেন। ইহাই তার বৈদিক সাহিত্যের চরম অজ্ঞতার নিদর্শন। ডাঃ বুলারও প্রমাণ করেছেন যে ব্রাহ্মীলিপি খৃষ্টীয় পূর্ব্ব নবম শতকে ছিল। হিট্টাইট দলিলে ইন্দ্রাদি দেবতার নাম আছে। ইহাই বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির প্রমাণ। বৈদিক যজ্ঞই ব্রাহ্মীলিপির ইতিহাস। কাজেই ব্রাহ্মীলিপির বয়স খৃঃ পূঃ ২০০০ বছরের কম নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যই যার জ্ঞানের সীমা তার পক্ষে ভারতীয় সাহিত্যর ইতিহাস আলোচনা করা কি প্রসংশনীয় ?

Q. 6. ডাঃ ডিরিঙ্গার Rhys Davids প্রভৃতি দ্বারা উল্লিখিত তাম্রপট্টক ও গিরিলিপির কথা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্রাহ্মীলিপি প্রাচীন হলে উহা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত।

ব্রাহ্মীলিপিও অন্যান্য লিপির মত বিবর্ত্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগের মূল আর্য্য সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছেন্ন হবার পর পারসিকদের মধ্যে ব্রাহ্মীলিপি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই ব্রাহ্মী-লিপিই তখন আর্য্যভাষার লিপি বলে পরিগণিত হল। মধ্য এসিয়ার অনেক গুলি প্রদেশ এই ভাষা ও এই লিপির অনুবর্ত্তী ছিল। তাদের বিভিন্ন প্রদেশে এই ভাষা ও লিপি প্রাদেশিক প্রাকৃত রূপে ব্রাহ্মীলিপি কিছু কিছু পরিবত্তিত হয়ে গেল—যেমন ভারতে, বিভিন্ন প্রদেশে কালক্রমে এক ব্রাহ্মীলিপি'র বহুরূপে বিবর্ত্তন দেখা যায়। পৈশাচী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচি, কম্বোজী, বাহ্লিকী, জেন্দ ও শগ্‌দিয়ান প্রভৃতি সকলই সিন্ধুভাষার রূপান্তর। লিপিও কাল ক্রমে এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য। মূলতঃ উহা যে ব্রাহ্মীলিপি, ইহা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

আদিপারসিক জেন্দ ভাষার লিপি যে খাঁটি ব্রাহ্মী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এঁদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয় স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে H. H. Willson

এর "Descriptive Account of antiquities of Afganistan" এবং ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগছির "ভারত ও মধ্য এসিয়া" পাঠ করা যেতে পারে। স্বয়ং ডিরিঞ্জারও তাঁর Alpahabet এর ৩১২ পৃষ্ঠায় শকদিয়ানার উঘির সাম্রাজ্যের বিবরণ দিয়ে স্বীকার করেছেন যে সেখানে তিন ভাষায় লিপি পাওয়া গিয়েছে। উহার একটি শকদিয়ান ভাষায়। এই শকদিয়ান ভাষার লিপি ব্রাহ্মীলিপি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ইহা উক্ত পুস্তকের বিবরণে পাওয়া যাবে। সম্রাট অশোকের অসংখ্য লিপির মধ্যে দুটি খরোস্থি লিপি ছাড়া আর সমস্তই ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত। সম্রাট দারাউসের সময় বিহিস্তান পর্ব্বতের তিন ভাষার লিপির মধ্যে একটি ভাষা ছিল আর্য্য পারসিক ভাষা—ইহা ডাঃ ডিরিঞ্জার স্বীকার করেছেন। এই আর্য্য পারসিক ভাষাটার লিপিও ব্রাহ্মীলিপি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিষয় এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় এবং "র‍্যাপসনের ক্যামব্রিজ হিষ্টরীর" ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত মন্তব্য পাঠ করতে অনুরোধ করি।

Q. 7 কেনেডি, রিস ডেবিডস, ভিঃ ইঃ স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে বলেছেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতক ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভবকাল—ইহাও ডাঃ ডিরিঞ্জার বিশ্বাস করেন না, কারণ সমুদ্রযাত্রার বিবরণের উপর নাকি বিশেষ নির্ভর করা যায় না।

ইহার উত্তর ইতিপূর্ব্বেই নানাদিক দিয়ে আলোচনায় দেওয়া হয়েছে; সুতরাং ইহার উত্তর সমস্ত বইখানার মধ্যে রয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব সিন্ধুলিপিরই বেশী—কারণ ইহা সকল লিপির জননী।

Q. 8. তারপর ডাঃ ডিরিঞ্জার লোঃ তিলকের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে ঐ কথার কোন ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় নাই।

ইহার উত্তর অনাবশ্যক, কারণ ইহা আগের প্রশ্নেরই অনুরূপ।

বৈদিক ভাষার তথা ব্রাহ্মীর প্রাচীনতার জন্য অরিয়ন এবং আর্কটিকতত্ত্ব দরকার হয় না। ইহা এখানে অপ্রাসাঙ্গিক।

Q. 9. Jainism and Budhism contributed to the diffusion of knowledge of writing."

ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মই যে বাহ্মীলিপির আরম্ভ নয় একথা, এই গ্রন্থে বহু প্রমাণে সাব্যস্ত হয়েছে। এই প্রশ্ন বালক-সুলভ।

Q. 10. "On the whole different lines of evidence suggest a date between 6th Century B. C. for the introduction of writing into Aryan India, thus confering the con-clusion that the Brahmi script was much later than the Indus Valley Civilisation and that the knowledge of writing flourised from the 7th to 6th Century B. C. onwards."

ডাঃ ডিরিঞ্জার যে খৃঃ পূঃ ৭ থেকে ৬ শতকের পর থেকে ব্রাহ্মী-লিপির উদ্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাহা তাঁহার যুক্তিগুলি খণ্ডন দ্বারাই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে সিন্ধুসভ্যতার পরে যে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ইহা আমাদেরও প্রমাণ্য বিষয়। ইহার জন্য একটি পৃথক প্রসঙ্গই করা হয়েছে।

## পারস্যেই ব্রাহ্মীলিপির বিস্তার হয়

জরাথুষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে পারসিক আচার্য ধল্লার মত যে খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর আবির্ভাব হয়। সুতরাং ব্রাহ্মীলিপির অন্যূন প্রকাশ খৃঃ পূঃ ১০০০ বছর বলে ধরা যায়।

তারপর এই লিপি সমস্ত এরিয়ানা অর্থাৎ কাবুল, বেলুচিস্তান, বাহ্লীক, শকদিয়ানা এবং সমস্ত অক্ষু উপত্যকার ভাষা হয় পহ্লবী,

পুস্ত এবং পৈশাচী। ইহার লিপি হয় ব্রাহ্মী। এখানে যে এই ভাষাগুলির বিপুল প্রভাব ছিল, এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। ডাঃ ডিরিঞ্জারও তার পুস্তক Alphabet-এর ৩০৪ ও ৩১২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, "Avestic alphabet is the script of the sacred Persian literature. It is a most cursive script of 50 signs. Its origin is uncertain. In my opinion unlike the Palhavi script, it is an artificial creation in which the inventor used both Parsik clement and his knowledge of the Greek Alphabet."

(Alphabet, p. 308).

এই জেন্দ ভাষার সে ৫০টি বর্ণ ছিল একথা ডাঃ ডিরিঞ্জার স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চাশটি বর্ণই সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষর। উক্ত স্বীকারোক্তি দ্বারাই উহা যে ব্রাহ্মলিপি তাহা প্রমাণিত হয়। তারপর ইনি বলেছেন যে ইহার মূল অনিশ্চিত।

আবার বলেছেন ইহাতে পারসিকত্বের মূল এবং ইহাতে পারসী-লিপির আবিষ্কারীর গ্রীক এ্যলফাবেট জ্ঞান ছিল।

ডাঃ ডিরিঞ্জারের অন্যান্য যুক্তিহীন কথাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। গ্রীকগণ আলেকজাণ্ডারের আগে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। অপর পক্ষে জেন্দাবেস্তার ইতিহাস কম পক্ষে খৃঃ পূঃ সহস্রকেরও পূর্ব্বে। হোমারের ইলিয়াড ও অনেক পরের কথা।

তিনি এই Parsic elements যে কি তাহা উল্লেখ করেন নাই। উহাই আর্য্য ভাষা। ডাঃ ডিরিঞ্জারের আর্য্য সভ্যতা এবং ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সুতরাং এ সমস্ত তাঁর অনধিকার চর্চা। এই জেন্দ্ ভাষাকে তিনি কৃত্রিম বলেছেন। এই ধ্বনিতাত্ত্বিক ভাষা ও লিপি প্রাকৃত ভাষা ও লিপি নয়—ইহা বৈজ্ঞানিক-ভাবে পরিকল্পিত। বৈজ্ঞানিক ভাষাকে ও লিপিকে কৃত্রিম বলতে হলে বলা যায়।

ইতিপূর্বে তার গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায়, তিনি বলেছেন যে প্রাচীন পারসিক লিপির বর্ণ ৪০টি এবং উহা পুস্তু ; ইহার ভাষা এবং প্রবাদ-বাক্যগুলি ইন্দোইউরোপীয়।" তারপর লিখেছেন—ঐ গ্রন্থের ৩০৪ পৃষ্ঠায়, "Persian seem to have spoken ancient Iran dialect akin to Sogdian and lived in the mountainous country north east of the Caspian sea."

ডাঃ ডিরিঞ্জার শুধু আর্য্য ভাষাতেই অনভিজ্ঞ নয়, তিনি পারস্যের ইতিহাস কিছুই জানেন না। পারসিকগণ কাশ্যপ হ্রদের উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করত"—এই জ্ঞানে যিনি ভাষার ইতিহাস আলোচনা করতে যান, তাতে তার যুক্তিগুলির যে কতমূল্য, তাহা আর বলে দিতে হবে না।

তারপর ডাঃ ডিরিঞ্জার তাঁর গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায় শক্‌দিয়ানা সম্বন্ধে বলেছেন যে Sogdian was actually the lingua franca of Central Asia." ইহাদ্বারা ভারতীয় ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপিকেই প্রকারান্তরে ইরাণী বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি আরও লিখেছেন, যে এই শকদিয়ানাতে খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সুবিস্তৃত উঘির রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ইহার বিস্তার উত্তরে শকদিয়ান ভাষার প্রচারিত অঞ্চল এবং দক্ষিণে লাদাখ। এদের রাজধানীতে অক্ষুর ধারে, তিন ভাষায় লিখিত লিপি পাওয়া গিয়েছে। (ইহা তুর্কী, শকদিয়ান ও চীনভাষায়) (Alphabet p. 312) এই উক্তি দ্বারা অস্পষ্টভাবে আর্য্যভাষার বিস্তৃতির পরিচয় দিয়েছেন। শকদিয়ানার ভাষাটি পৈশাচি প্রাকৃত বা পহ্লবী ভাষা এবং উহার লিপি ব্রাহ্মী। ইহা স্বীকার করলে তাঁর ইন্দোইউরোপীয় তত্ত্ব ভণ্ডুল হয়ে যায় বলে তিনি উহাকে শকদিয়ান বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগছি তাঁর "ভারত ও মধ্য এসিয়া" পুস্তক এবং চৈনিক ও জাপানী দলিলে প্রমাণিত হয়েছে যে ঐ ভাষা ছিল

আর্য্য এবং লিপি ছিল ব্রাহ্মী। এ বিষয় জাতিসঙ্করণের অধ্যায়ে বিশদভাবে উল্লেখ করা হবে।

এই অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার বিস্তারের বিষয় H. Willson এর পুস্তক, "Descriptive Account and antiquities of Afganistan" নামক পুস্তকে লিখিত আছে। এই বিবরণ আরও আগেকার। আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক কালের। এ ছাড়া জাতিসঙ্করণের অধ্যায়ে শকজাতির বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

## খরোষ্ট্রী ও ব্রাহ্মী

খরোষ্ট্রী শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ চামড়ার উপর লেখার প্রথা থেকে—ইহা উইলসন মন্তব্য করেছেন। খরোষ্ট্রী লিপি ডান থেকে বামদিকে লেখা হয়। বামদিকে গতি বিশিষ্ট লেখার নাম বামাবর্ত্ত। বামাবর্ত্ত লেখার নিয়মটির সুরু হয়েছে কীলকাক্ষরের উৎপত্তি থেকে। ডান হাতে হাতুড়ী নিয়ে বাঁহাতে বাটালী দিয়ে পাথরের উপর লিখতে হলে বামাবর্ত্ত লেখাই সুবিধা। কাগজে বা পাতার উপর লিখতে হলে বামদিক থেকে ডাইনে লেখাই সুবিধা। ফিনিসিয়, হিট্টাইট কীলক-লিপিগুলি বামাবর্ত্ত। গ্রীকলিপি প্রথমে বামাবর্ত্তই ছিল, পরে দক্ষিণাবর্ত্ত হয়েছে। সম্ভবতঃ কাগজ বা পাতায় লেখা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে, বাম থেকে ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত প্রচলিত হয়েছে। গণিতের সংখ্যা গণনা প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণাবর্ত্ত। রাশিচক্র গণনা খুব প্রাচীন। উহার ধারাও দক্ষিণাবর্ত্ত। ব্রাহ্মীলিপিও দক্ষিণাবর্ত্ত।

অশোক লিপির মধ্যে দুইখানি উত্তর পশ্চিম ভারতের খরোষ্ট্রি লিপিতে। আরামাইক বা ফিনিসিয় লিপি বামাবর্ত্ত। এই সূত্রে ধরে আগেকার ভাষাতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্রাহ্মীলিপির মূলে আরামাইক লিপি। আমরা সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছি, ব্রাহ্মীলিপিই

বহুকালের প্রাচীন। সুতরাং এই বিষয়ে তর্ককে পুনরুদ্ঘটিত করা উচিত হবে না।

অশোকীয় খরোষ্ঠী লিপি বামাবর্ত্ত হলেও উহার ভাষাটি স্থানীয় প্রাকৃত সংস্কৃত। দারিয়ুসের সময় ব্যবসায় ও রাজকার্য্যের জন্য ঐ আরামাইক লিপি গান্ধারে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকের ভাষা আরামাইক হয় নাই। পারসিক রাজ্যে পারসিক আর্য্য ভাষাই প্রচলিত ছিল। ডাঃ ডিরিঞ্জার বলেন খরোষ্ঠি লিপি আরামাইক থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তিনি নিজেই লিখেছেন, "It may be assumed that the Brahmi had some influence on the origin and evolution of Kharostri, specially (1) in regard to the Vocalisation of the script, the vowels being indicated by small circles, dashes, modifications of strokes and so forth which in appearance transforms the script into a syllabic writing (2) The addition of signs or sounds (such as bh, gh, dh), which do not exist in Aramaic and(3) the direction of writing in the later stage of Kharosthi (Alphabet p. 304).

ডাঃ ডিরিঞ্জারের এই উক্তিই তার ব্রাহ্মীর দ্বারা নেওয়া ঋণ সম্বন্ধে মতবাদ খণ্ডন করে। যদি ব্রাহ্মী লিপি এখানকার স্থানীয় প্রাচীন লিপি না হোত এবং ইহা যদি আরামাইকের পরবর্ত্তীই হ'ত, তাহলে খরোষ্ঠী লিপিতে এই সমস্ত অসুবিধার জন্য কোন চিহ্নের প্রয়োজন হ'ত না।

প্রকৃতপক্ষে ফিনিসিয় এ্যালফাবেটের মূল চিহ্নগুলি যে হিট্টাইট এবং সিন্ধুলিপি থেকেই বিবর্ত্তিত, তা' ভুলে গেলে হবে না। টেলর প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকগণ ব্রাহ্মীলিপির মধ্যে ফিনিসিয় alphabet এবং কয়েকটি অক্ষরের মিল দেখে, ফিনিসিয় লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

ফিনিসিয় alphabet প্রকৃতপক্ষে হিট্টাইট রেখাক্ষর থেকেই গৃহীত—ভাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং হিট্টাইট অক্ষরের সঙ্গে ইহার কোন কোনটির সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আমরা দেখছি হিট্টাহিট লিপি এবং ব্রাহ্মী—সিন্ধু লিপিরই ক্রমবিকাশ। সুতরাং alphabetএর কোন অক্ষরের সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির মিল থাকায় আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছু নাই। সিন্ধু লিপির সঙ্গে alphabetএর অক্ষর মিল প্রমাণ হলে উল্টা প্রমাণই এসে যায় যে alphabetএর মূলেই সিন্ধুলিপি ছিল। ফিনিসিয়গণ সিন্ধু উপত্যকা থেকে এ লিপি নিয়ে গিয়ে ব্যবসার সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বার করেছে। তাহাই পাশ্চাত্য alphabet।

## বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সন্তান

এই প্রস্তাবটিকে এগারোটি প্রমাণে বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা যাচ্ছে।

## লৌহ ও অশ্ব সিন্ধুযুগের পরবর্তী

১। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার স্তরবিভাগ দেখান হয়েছে। এই স্তরবিভাগে নৃতাত্ত্বিক ধারা গ্রহণ করা হয়েছে। আদিম যাযাবর অবস্থার পরে যখন মানুষ মাটির সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ পাতাল, তখনই তার নানা প্রয়োজনের সৃষ্টি হল। উহাই হল সভ্যতার যাত্রা আরম্ভ। প্রথমে কৌমগত গ্রাম্য সমাজ, তারপরে বহু কৌমের সমাবেশে বৃহত্তর গ্রাম্য সমাজ এবং তারপর নাগরিক সভ্যতা। এই নাগরিক সভ্যতা ছিল মিশ্র কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যিক সভ্যতা। তখন ছিল তাম্র ও ব্রোঞ্জ ধাতুর যুগ। এই সভ্যতার সময় মানুষের যা কিছু বর্ত্তমানের সভ্যতার উপকরণ তার সবগুলির কিছু না কিছু উন্মেষ হয়েছে। মানুষ, লিপির ব্যবহার, এবং জাতিতাত্ত্বিক লেন-দেন সুরু করেছে। এই লেন-দেনের সূত্র থেকেই মিতালী ও সংঘর্ষের সূত্রপাত। এর পরেই লৌহ

যুগ আরম্ভ হল। সিন্ধুর অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্ত্তনে শুষ্ক জলহীন দেশে পরিণত হল। সিন্ধুর প্রাচীন সভ্যতার নাগরিকগণ যাযাবর অবস্থায় পতিত হয়ে ইতস্ততঃ বাহির হয়ে পড়ল। তারা গেল সুমের, ক্রীট ও ইলামে। তারা ছড়িয়ে পড়ল সিন্ধু ও গঙ্গা ও গোদাবরীর উপত্যকায়। আরও গেল অক্ষু নদী ধরে কাশ্যপ সাগর এবং ভ্যান হ্রদের ধারে। এই সকল স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাহার সঙ্গে সিন্ধুর সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। তারপর লৌহ যুগের ব্যাপারটা হল সিন্ধুর বৈদিক সভ্যতা। এই সময় বৈদিকগণ অশ্ব, রথ এবং লৌহ অস্ত্রের বলে পূর্ব্ব ভারতের সুদূর সীমান্তে এবং পশ্চিমে এসিয়ার সীমান্তে এবং আফ্রিকার দ্বারদেশে জয়যাত্রায় বাহির হয়েছে। ইহাই হল সিন্ধুর দ্বিতীয়বারের অভিযান। কাশ্যপতীরের উর্ব্বরা ভূমিতে এবং মেসপটেমিয়ার উর্ব্বর অর্দ্ধচন্দ্রে আর্য্য ক্ষত্রিয়জাতি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে আর্য্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করল। এই দ্বিতীয়বারের উপনিবেশ—ইহাও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে লব্ধ ইতিহাস। নব্য প্রস্তর ও তাম্র যুগের পরেই লৌহ যুগের আরম্ভ। বৈদিক সভ্যতা যে লৌহ যুগের—তা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এই স্তরবিভাগ অনুসারে সিন্ধুসভ্যতা থেকেই বৈদিক সভ্যতার সৃষ্টি প্রমাণ হয়।

## হিট্টাইটাদি বৈদিক আর্য্য

২। নৃতাত্ত্বিক প্রমাণে আর্য্যদের সামাজিক আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হিকসোস হুরাইট, হিট্টাইট, মিটান্নী প্রভৃতি জাতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। এরা যে প্রকৃতই ভারতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন—ইহাতে কেহ দ্বিমত হন নাই। এই জাতিগুলি আকৃতি ও প্রকৃতিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশীয় আর্য্যজাতির লোক। এদেরই ভাষা এবং আচার ব্যবহার মূলতঃ ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়া ও মধ্যএসিয়ার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আর্য্যত্বের মূলই এরা, তবে

স্থানীয় লোকের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে এদের আকৃতি ও ভাষার বৈষম্য সৃষ্ট হয়েছে। এদের আবির্ভাব খৃষ্টীয়পূর্ব্ব বিংশশতকের খুব বেশী পূর্ব্বে নয়। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতার পরেই যে এদের উদ্ভব তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

## বৈদিক ভাষা ও লিপি সিন্ধুর ক্রমবিকাশ

৩। ভাষাতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের নিয়মে যে ক্রমবিকাশের ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বৈদিক ভাষা একটি সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থার ভাষা বলেই স্বীকার না করে উপায় নাই। এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সিন্ধুর ভাষা ছিল মূলে চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপি থেকে ভাবাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক অক্ষরের জন্ম। এই অক্ষরই পাওয়া গিয়েছে সিন্ধুর শীলমোহরে। তারপর এলামীয় লিপি ও ক্রীটীয়লিপি ও হিট্টাইট লিপি পাওয়া গিয়েছে। উহাও সিন্ধুলিপির সঙ্গে সাদৃশ্য-যুক্ত। এই সমস্ত লিপিতে ধ্বনির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তারপর বৈদিক ব্রাহ্মীলিপি ধ্বনির পূর্ণবিকাশ। ইহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বিকাশের ধারা অনুসারে সিন্ধুলিপির সন্তান বলেই ব্রাহ্মীলিপিকে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নস্তরের লিপির সভ্যতাই—সিন্ধুর সভ্যতা এবং তাহা যে বৈদিক স্তরের পরবর্ত্তীকালে সৃষ্টি তাহা কোন ক্রমেই প্রমাণ করতে যাওয়া চলে না।

## বৈদিক সভ্যতার চেয়ে সিন্ধুর বয়স বেশী

৪। সিন্ধুর সভ্যতার বয়স খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছরেরও পূর্ব্বকালীন। ঐতিহাসিক প্রমাণে, পৌরাণিক বংশলতিকার ধারায়, বেদব্যাসের তথা মহাভারতের যুগের অবস্থিতি খৃঃ পূঃ দুই হাজার বছরের উপর কোন

নতে আনা যায় না। এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতার বয়স বৈদিক সভ্যতায় চেয়ে অনেক বেশী।

## ফিনিসিয়গণ বেদের সমসাময়িক

৫। ঋগ্বেদে পণিদের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারাই ফিনিসিয় জাতি। ইহাদের ভূমধ্যসাগরের তীরে আবির্ভাব খৃঃ পূঃ ২০০০ বছরের কাছাকাছি সময়ে। সুতরাং বৈদিক আর্য্যরা, যারা এদের সমসাময়িক, তাদের সিন্ধু সভ্যতার খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বছরের আগে নিয়ে আসা যায় না।

## যজ্ঞসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রমাণ

৬। যজ্ঞ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে দেখা যায় সিন্ধু যজ্ঞের অবস্থা থেকে বৈদিক যজ্ঞের অবস্থাতে বিবর্ত্তিত হতে বহু সময় গিয়েছে। যজ্ঞের ক্রমবিকাশে ভাষার বিকাশ এবং নানা প্রকার বিদ্যার আবির্ভাব হয়েছে এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বৈদিক সভ্যতা যে সিন্ধুর পরবর্ত্তী তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

## ধর্ম্মসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রমাণ

৭। ধর্ম্মীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ আলোচনা করলে দেখা যায়, সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ভারতে পিতৃমাতৃপূজার সংস্কৃতির পরেই গ্রাম্য মাতৃদেবতা ও পিতৃদেবতার প্রতীকের আবির্ভাব। তারপরে যজ্ঞসংস্কৃতির অপ্রতীক প্রাকৃতিকশক্তির দেবতার আবির্ভাব এবং তার পরে সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মের আবির্ভাব। এই ধারার অনুসরণে বৈদিক সংস্কৃতিকে সিন্ধুর সংস্কৃতির পরবর্ত্তী না বলে পারা যায় না।

## সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের প্রমাণ

৮। সঙ্গীতের বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম অবস্থায় গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের নামে বর্ত্তমানে রাগরাগিনীর পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। গান্ধার, কম্বোজ, তক্ক প্রভৃতি রাগ এদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এরা বর্ত্তমানে কিম্বদন্তীর জাতি হলেও এদের সশরীরে অস্তিত্বের প্রমাণ ও এদের সঙ্গে ভারতীয় জাতিগুলির রক্তগত সম্বন্ধের কথা বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এরা এত প্রাচীন যে ইহারা কিম্বদন্তীর জাতিরূপে পরিণত হয়েছে। প্রাগ্বৈদিক এবং সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলের সঙ্গেই ইহাদের অস্তিত্ব জড়িত দেখা যায়। সিন্ধুর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে নৃত্য-পরা নারী, শিবনৃত্যপর মানুষ এবং বীণা ইত্যাদির এবং অন্যপ্রকার সমবেত নৃত্যের দৃশ্য, সিন্ধু জাতির সঙ্গে এই কিম্বদন্তীর জাতির সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে এদের সংস্কৃতির নিদর্শন এই অঞ্চলের কতকগুলি প্রাচীন জাতির মধ্যে আছে বলে লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য গন্ধর্ব, কিন্নরাদি কিম্বদন্তীর জাতিকে প্রাগ্‌বৈদিক গণ্য না করলে, এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তীকালে এদের পরিচয়, অলৌকিকত্বের স্থান গ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে যক্ষের বংশধরেরা হিকশোস, গন্ধর্বের বংশধরেরা মেদ, গাদার এবং গান্ধার ও কম্বোজ; পিশাচের বংশধরেরা পিশাচৈ, রাক্ষসের বংশধরেরা রাক্ষাণি, নাগের বংশধরেরা সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে।

## মহাদেবের সংস্কৃতির ধারা

৯। সিন্ধু সংস্কৃতিতে মহাদেবের প্রভাব অসীম। ইনি সমস্ত সিন্ধুঅঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান দেবতা। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গান্ধার, কম্বোজ বাহ্লিক, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মিটান্নী, উরারুতু, ইলাম, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ফিনিসিয়া, গ্রীসে—সর্ব্বত্র মহাদেবই বিরাজিত। ব্যাবিলন ও আসীরিয়াতেও এই দেবতাই অন্য নামে বিরাজিত। এই শিব, অরফিউস সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীসে গিয়েছেন এবং মিশরের আসিরিসও শিবেরই রূপান্তর। শিবসংস্কৃতিই সিন্ধুর প্রধান নিদর্শন। যেখানে যেখানে এই শিবসংস্কৃতি গিয়েছে, তাহা যে সিন্ধুরই সংস্কৃতির পরিচয়—তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিন্ধুর শিব বৈদিকোত্তরকালের তাত্বিক শিব নহেন। এই শিবপশুপতি যোগাসনে আসীন, ইঁহার উৎসবে হল্লা হয়, নেশার মত্ততা এবং বলিদান থাকে। সিরিয়ান শিবের মূর্ত্তি পাহাড়ে খোদাই অবস্থায় কাপ্পাডোসিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। ইনি বৃষভবাহন ত্রিশূলধারী এবং বজ্রধারী।

বজ্র আছে বলে অনেকে ইহাকে ইন্দ্র বলে ভুল করেছেন। ইনি বেদের রুদ্রের বর্ণনার সঙ্গে এক। মহাভারতেও বজ্রধারী শিবের বর্ণনা আছে। হেম চন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছেন যে এই শিবের বর্ণনার সঙ্গে সিন্ধুর শিবের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। বৈদিক রুদ্রের যজ্ঞে সোমপান, বলিদান এবং সারারাতি হল্লা চলত। গ্রীসে অর্ফিউস উৎসবেও তাই হোত। ইহাই আদি শিবের উৎসব। ইহা সিন্ধুর শিবের উৎসবেরই পরিচয়। বাংলাদেশে চৈত্র মাসে শিবের গাজন পূজা হয়। এই উৎসবে সঙ্গীত, বাদ্য, নেশা এবং বলিদান হয়। ইহাকে চৈত্রপূজা বলে। এই সময় কোন কোন স্থানে হাজরা গাছের নীচে বিপুল সংখ্যায় মেষ ও ছাগের বলিদান হয়ে থাকে। এই সময় ভক্তগণদ্বারা শিবপার্ব্বতীর বিবাহ বিষয়ে প্রতি গৃহে নৃত্য ও বাদ্যের সঙ্গে গান করা হয়। ইহাদের শিবের প্রতীক

স্বরূপ একটি পবিত্র নিদর্শন থাকে—উহাকে "পাটবাণ" বলে; ইহার অর্থ—বাণদেবের পাট অর্থাৎ শিবের আসন। ইহা যে এই সিন্ধু শিবের প্রাচীন উৎসবেরই পরিচয় তাতে সন্দেহ নাই। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরা আর্ক নামে একটি, জিনিষ তাদের দেবতার প্রতীক বলে পূজা করত। হিট্টাইটদের মন্দিরেও এইরূপ প্রতীক থাকত।

এই শিবের উৎসব অব্রাহ্মণদের মধ্যেই বেশী। সুতরাং ইহা যে বর্ণাশ্রম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বের প্রাগ্বৈদিকসংস্কৃতি, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বৈদিক যাজ্ঞিক সংস্কৃতির পূর্ব্বে যে শিব সংস্কৃতির ফল্গুধারা ভারত ও ভারতের বাইরে ব্যাপকভাবে চিহ্ন রেখে দিয়েছে, উহা সিন্ধু সংস্কৃতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং উহা বৈদিক সংস্কৃতির বিরাট প্লাবনেও একটুও নষ্ট হয়ে যায় নাই। বরঞ্চ ক্রমশঃ নানাপ্রকার উন্নত ধারায় বিকশিত হয়ে মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা বর্দ্ধন করেছে। জাতিসঞ্চরণের আলোচনায় এবং ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডে এই এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

## ননা বা নানী মাই-এর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতা

১০। সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে বহু প্রমাণই বর্ত্তমানের ভারতীয়ের এবং প্রাচীন মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার জাতিগুলির মধ্যে আছে। ইহা যথাস্থানে আরও ভাল করে আলোচনা করা হবে। এখন এমন একটি সংস্কৃতির বিষয় বলছি, যাহা সিন্ধুর কালের পূর্ব্ব থেকে এখন পর্যন্ত সিন্ধু অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। ইহার সঙ্গে পশ্চিম এসিয়া এবং ভারতের সম্বন্ধের ইতিহাস জড়িত। এইজন্য বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশী।

ননাদেবী সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বেলুচিস্তানের লাসবেলা ষ্টেটে, সমুদ্রের নিকট ননাদেবীর মন্দির।

ইঁহার প্রাচীন অধিবাসীদের দেওয়া নাম "নানামাই।"

বেলুচিস্তানের লাসবেলা গেজেটিয়ারের ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে যে মধ্য-এসিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্যপথের ধারেই এই হিংলাজ তীর্থ। ইহা হিঙ্গুলা নদীর ধারে। এই মন্দির ইউফ্রেটিস থেকে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিখ্যাত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রী উভয়েই এই দেবীর আশীর্ব্বাদের জন্য আসে। এই শ্রদ্ধার পাত্রী নানাদেবী কালডিয়ানদের কাছেও পূজিতা ছিলেন।

বোলানপাস গেজেটিয়ারে আছে, 'Speaking of the goddess of the shrine of Hinglaj, as is known to the Mahommedans as Bibi Nani, Mason writes," It is possible they—the Mahommedans preserved the ancient name Nanai—that of the goddess of the old Persian and Bactrians and now so well known. The Kacchis used to allot eight Kasos each harvest to the shrine of Bibi Nani, proceeds being used for the purchase of "sheep to be sacrificed, whenever a party of cultivators went to repair the water channel."

(Bolan Pass Gazeteer, p. 11.)

হিংলাজ তীর্থ পাণিনির সময় ছিল। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে হিঙ্গুলা নদীর নাম উল্লেখে, ইহা বোঝা যায়। ঋগ্বেদে মাতা অর্থে ননা শব্দের প্রয়োগ আছে। ( ঋ ৯।১, ২।৩ )

"আবার নিঘণ্টুতে 'বাকের' নাম তালিকায় আছে ননা শব্দ। ননা আর উমা যে একই দেবী, তার ঐতিহাসিক নজীর আছে। হুবিস্কের মুদ্রার পরিচয় লিপিতে দেবটিকে বলা হয়েছে উমেশ এবং দেবীকে ননা। দেবমূর্ত্তিটিকে শিবের মূর্ত্তি বলে সনাক্ত করা হয়েছে। "ননার পূজা ব্যাকট্রিয়ানা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আর্মেনিয়ার লাইকস উপত্যকায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রীসে দেবীকে নিয়ে যাম্ব

প্রাচ্যবণিকেরা। Artemisএর ভ্রমর লাঞ্ছন। Eppisas ও সুসাতে দেবীর ভ্রমরলাঞ্ছন প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দেশে দেবী ভ্রামরী।" ১৮৪

"সৌমারদের আরাধ্যা দেবীও ননা। সৌমারেরা প্রাচ্য দেশীয় লোক বলে অনুমান হয়। এরা ভারতের লোক হতে পারে। মেসপটেমিয়ার প্রত্নলিপিতে তাকে সব সময়েই যুদ্ধ করে সেনাদলের নেতৃরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পর্ব্বতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেবীর বাহন সিংহ, তার স্বামীর বাহন বৃষ।" ১৮৫

"দেবী অনাহিতই (পারসিক ও আর্ম্মানিয়ার মাতৃদেবতা) বাবিলনের ইস্তার, গ্রীকদের এথেনীও আর্টেমিস। সুমার এই দেবী নানাইয়া নামে পূজিত হতেন।" ১৮৬

মেকেঞ্জি লিখেছেন, "Lugal Zaggisi chose for his capital ancient Erech, the city of Anu and of his daughter, the goddess Nana, who afterwards was identified with Estar. Nana was worshipped as a goddess of vegetation and her relation to Anu was similiar to Belitsar to Ea at Eridu." "It was recorded afterwards that the statue of Nana of Erech which has been carried off by the Elamites 1635 years previously (ie at 2282 B C), was recovered and restored to the ancient summerian city)." ১৮৭

---

১৮৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৯৬ ও ২৩।

১৮৫ Pre Aryan eliments in Ind. Culture I. H. Q. Vol. 10 (14-16).

১৮৬ ইরাণী উপকথা, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৪৪।

১৮৭ M. O. B. p. 12, 485 ; Makenzie.

সুমেরের উরনিনা নগরের নাম ননা বা নানার নাম থেকেই হয়েছিল। সুমেরের "লাগাসের" পটেশীর নাম উরনিনা। লাগাসের ননা দেবীর নাম থেকেই এই নাম হয়েছে বলে মনে হয়। ইনি খুব প্রভাবশালিনী ছিলেন। লাগাসের এই পটেশ্বির ( পুরোহিত শাসক ) কাল নির্ণয় হয়েছে। ইহা খৃঃ পৃঃ ২৪৫০-২৪০০ )।

সুমের থেকে বাণিজ্যের পথ ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে বেলুচিস্থানের মাকরাণ জেলা, লাসবেলা জেলার ধার দিয়ে গান্ধার হয়ে, মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত। লাসবেলা অতি প্রাচীন দেবীস্থান। এই দেবীকে পার্শ্ববর্ত্তী সকল দেশের লোকেই এই পথে পূজা দিতে আসত। তাহার প্রমাণ তাঁর নাম ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি। সুতরাং তাঁকে পূজা দিয়েই নিশ্চয়ই লুগগল জাগগিশি কন্যার নাম—নানা রেখেছিল। ইহাই সাধারণ প্রথা ছিল—দেবতার নামে পুত্র-কন্যার নাম রাখা। এখানে পিতৃপূজার প্রাধান্য হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক নজিরও আছে। কালক্রমে নানা, উর্ব্বরা শক্তির বরদাত্রী এবং পরে সন্তানরক্ষিণী মহাশক্তি রূপে পূজিত হয়েছেন।

## আদি পিতা ও আদি মাতা গ্রাম্য স্তরের দেবতা

নানা দেবীর সংস্কৃতি সিন্ধুসভ্যতারও পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহা গ্রাম্য-স্তরের সংস্কৃতি। গ্রাম্যস্তরে ছিল আদি মাতা ও আদি পিতার পূজা। এই আদিপিতা বা আদিমাতার মূর্ত্তি ছিল না। কোন শিলা প্রতীকে গুহা-গহ্বরে, বা বৃক্ষতলে এই দেবতার অর্চ্চনা হোত। এই অর্চ্চনায় অগ্নি বা যজ্ঞ প্রয়োজন হত না। বেদীর উপর বলির দেহাংশ দ্বারা বা অন্যান্য উপচারে অর্ঘ্যদান করা হত। সিন্ধু যুগে অগ্নির প্রবর্ত্তন হয় কিন্তু সেখানেও যে অগ্নির মাধ্যমে যজ্ঞ দ্বারা মাতৃপূজা করা হোত—তার কোন ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুমেরেও যজ্ঞব্যবস্থায় অগ্নিতে পশুদেহ উৎসর্গ করে অর্ঘ্য দেওয়ার ব্যবস্থার সেরকম প্রমাণ নাই। তবে অগ্নিউপাসনা থাকার প্রমাণ আছে।

এই অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায় আদিপারসিক যজ্ঞ ব্যবস্থার মধ্যে। অগ্নিতে উপচার উৎসর্গ না করেই সেখানে সোমযাগ করা হোত। অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় বলে অগ্নিকে অপবিত্র করা হোত না।

বৈদিক যুগে অগ্নির মাধ্যমে হবির্যজ্ঞ আরম্ভ করা হয়। আসসুরে ও ব্যাবিলনে অগ্নিতে বলি উৎসর্গ করা হোত। বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে, তার গ্রাম্যস্তরের আদিমাতার কাছে নিবেদিত অর্ঘ্যোপচারের অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটি ইহুদীদের ইহোভার নিকট অর্ঘ্য ও বলিদানের নিয়মের মধ্যেও পাওয়া যায়।

## গ্রাম্যসভ্যতায় বিনা অগ্নিতে বলিদান

সুতরাং বিনা অগ্নিতে বলিদান ও অর্ঘ্যদানের সংস্কৃতি থেকে হবির্যজ্ঞের স্তরের তফাতের প্রথা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রথমটিই অধিকতর প্রাচীন। বর্ত্তমানেও পীঠগুলিতে এবং দেবী মন্দিরগুলিতে প্রাচীন ব্যবস্থাই বর্ত্তমান। হোম বা যজ্ঞ দেবীমন্দিরে আসল উপচারের মধ্যে নয়। কোথায়ও ইহার আচরণ করা হলেও উহা আনুসঙ্গিক গৌণ অর্চ্চনা মাত্র—পরবর্ত্তীকালে আমদানী—বলির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি আদিমাতা ও পিতার স্তর গ্রাম্যস্তরের এবং উহা প্রথম স্তর। এই সময় যাজ্ঞিক বলিদান ছিল না।

এই হিসাবে হিংলাজের দেবীস্থান গ্রাম্যস্তরের পীঠস্থান এবং এই দেবীস্থান সুমের সভ্যতারও পূর্ববর্ত্তী—তাতে সন্দেহ নাই। সুমের সভ্যতার সময়েও এই দেবীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং অনায়াসে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। এই দেবীর বিরাট এলাকায় বিস্তার হওয়ার প্রমাণ থেকেই সিদ্ধান্ত কয়া যায় যে এই দেবী সিন্ধুএলাকারই নানীমাই তথা হিঙ্গুলা মাই।

## মাতৃতন্ত্র

১১। ইতিপূর্ব্বেস্তর বিভাগের আলোচনায় দেখান হয়েছে যে প্রথম স্তরের গ্রাম্য সভ্যতার সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতন্ত্র

ভারতীয় সমাজের আদি অবস্থায় ছিল। সুমেরীয় এবং ইলামীয় সংস্কৃতির আদি ইতিহাস আলোচনা করলে ইহাই প্রমাণিত হবে। অন্য অধ্যায়ে সংস্কৃতির আলোচনায় ইহা উল্লেখ করা যাবে।

ভারতবর্ষের বৈদিক সংস্কৃতিটি সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রিক—নৃতাত্ত্বিকদের ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজের আদিমতম অবস্থায় যে মাতৃতন্ত্র ছিল—তাহাই প্রমাণিত হয়। বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে যে মাতৃতন্ত্র ছিল তার প্রমাণ বেদেই আছে।

উপেন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন, "বৈদিক আর্য্যদের সমাজের যে পরিচয় মিলে তা পিতৃতন্ত্র। কোন পুরুষমানুষের মাতৃনামে পরিচয় দেওয়াটিকে মাতৃপ্রাধন্যের পরিচয় বলে মনে করা হয়। এই রকম মাতৃনামের নিদর্শন আরণ্যক, উপনিষদ, এবং শ্রৌত সূত্রগুলিতেও পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে দীর্ঘতমা মামতেয় ঔচথ্য নামে একজন ঋষির পরিচয় আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ঐতরেয় মহিদাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। সাংখ্যায়ন আরণ্যকে জাতুকর্ণ কাত্যায়নীপুত্র নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বোধায়ন শ্রৌতসূত্রে ঔপমন্যকীপুত্র নাম আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কাণ্বশাখায় কৌরব্যায়নীপুত্র। মাধ্যন্দিন শাখার ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্রেয়ীপুত্র, আর্তভাগীপুত্র, আলম্বীপুত্র, আলম্বায়নীপুত্র, কার্ণকেয়ীপুত্র, কশ্যপীবালার্ক্যমাঠবীপুত্র, কৌৎসীপুত্র, ক্রৌঞ্চিকী পুত্র, গার্গীপুত্র (এই নামে তিনজন আচার্য্য ছিলেন), গৌতমীপুত্র, জায়ন্তীপুত্র প্রাশ্নীপুত্র, পারাশরী, কৌণ্ডিনীপুত্র, পারাশরীপুত্র, পৈঙ্গীপুত্র, বাড়েয়ীপুত্র, বৌগীপুত্র, ভারদ্বাজী পুত্র (একাধিক আচার্য্যকে ভারদ্বাজীপুত্র বলা হয়েছে), ভালুকীপুত্র মাণ্ডুকীপুত্র, মাণ্ডুকায়নীপুত্র, মৌষিকীপুত্র, বাৎসী মাণ্ডবীপুত্র, বার্কারুনীপুত্র, বার্ষগামীপুত্র, বৈদভৃতীপুত্র, রাথীতবীপুত্র, শাণ্ডিলীপুত্র, শালঙ্কায়নীপুত্র, শৌনকীপুত্র, সাঙ্কীবীপুত্র, সাস্কৃতিপুত্র, শৌঙ্গীপুত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐতিরেয় মহীদাস, দেবকীপুত্র, কৃষ্ণ এবং সত্যকাম জাবাল—তিনটি নাম পাওয়া যায়।

দেবমণ্ডলেও আদিত্য ও দৈত্য মাতৃনামের পরিচায়ক শ্রুতিগ্রন্থে দেখা যায়। অম্বিকাকে প্রথমে রুদ্রের ভগ্নী বলা হয়েছে এবং পরে বলা হয়েছে স্ত্রী।

ভগ্নী বিবাহ মাতৃতন্ত্র-জনদের সমাজে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগিনী বিবাহের যে সব কাহিনী আছে সেগুলি বিচার করে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেছেন যে বহিরার্য্যদের মধ্যে মাতৃক্রম সার্ব্বজনীন ছিল। মহাভারতে আছে আরট্ট, বাহিক জনএর লোকদের সম্পত্তির ভাগীদার ভাগিনেয়রা পুত্রেরা নয়। মহাভারতে পাণ্ডুপুত্রদের বিশেষ করে তৃতীয় পাণ্ডবের এই মাতৃনাম প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকের ঘসুণ্ডি শিলালেখে দেখা যায় অশ্বমেধ যজ্ঞকারী সর্বতাত রাজা নিজেকে পারাশরীপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের ২ জন সাতবাহন রাজার নাম—গৌতমীপুত্র সাতকর্নী ও বাশিষ্ঠীপুত্র। ভারহুতের স্তম্ভ গাত্রলিপিতে পুষ্যমিত্র বংশীয় একব্যক্তি কৌশিকীপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নাগার্জ্জুনীকোণ্ডা স্তূপগাত্রলিপিতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা শান্তিমলকে বাশিষ্ঠীপুত্র বলা হয়েছে। অন্যত্র মাঠবীপুত্র বীরপুরুষদত্তের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দের ভিটাতে প্রাপ্ত সিলে" "মহারাজ গৌতমীপুত্রস্য শ্রী শিবমেঘস্য" উৎকীর্ণ আছে।" ১৮৮

বাঙালী হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে পূর্ণ মাত্রায় পিতৃ তন্ত্র প্রকাশিত, কিন্তু তা'সত্ত্বেও বর্ত্তমানের সামাজিক প্রথাগুলির মধ্যে মাতৃতন্ত্রতার চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। কে পি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমাদের নিজ সমাজের বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে একভার্য্যাবিবাহ, যাহাকে ইংরাজীতে Junior Levirate বলে, তাহা এককালে উত্তর ভারতে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে

১৮৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা, উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ১৬, ২৩।

( প্রায় দুই হাজার বছর আগে ) প্রচলিত ছিল—উহা ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইয়া তার বদলে বৌদিদি ও দেওরের মধ্যে ঠাট্টার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। বৈদিক কালের লোকে অবাধে এই প্রথা ব্যবহার করত ; এই জন্য স্বামীর নামে এদের ব্যবহৃত যাহা সাধারণ শব্দ ছিল তাহা স্বামীর সেই সমস্ত ভাইদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।" (দ্বিবর=দেবর)। ১৮৯

ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা প্রাচীন স্মৃতিকারগণ দিয়েছেন। পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র—এমন কি পাণ্ডবগণও ক্ষেত্রজ পুত্র। বলিরাজার মহিষীর গর্ভে দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ পুত্র—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ইত্যাদি সুপরিচিত কাহিনী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষেত্রজ পুত্র একদম অচল। সমাজের প্রথম অবস্থায় মাতৃতান্ত্রিকতার ইহাই প্রমাণ।

দেওর বিবাহ বা Junior levirate প্রথাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সহ্য করে না। ইহাও মাতৃতন্ত্রের পরিচয়। পাণ্ডবগণের প্রসিদ্ধ প্রথা পঞ্চপতিত্ব—ইহাও মাতৃতান্ত্রিক প্রথার পরিচয়। এই প্রথা হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় এখনও সুপ্রচলিত।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, পিতৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সেইজন্য ক্ষেত্রজ পুত্র দোষের কারণ নয়, কিন্তু সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে ওঠে এবং পুরুষের প্রভাবে সমাজ ক্রমশঃ পিতৃতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, তখন স্ত্রী, পুরুষের নিকট ঐকান্তিক হয়ে পড়ে। ঐ ঐকান্তিক পরিবারের পুত্রই হয় উত্তরাধিকারী এবং সন্তান নিজ ঔরসজাত না হলে ঐ পুরুষের সম্পত্তি, সন্তান চিহ্নিত না হলে, স্বভাবতঃই ঐ অধিকার দাবী করতে পারে না। ইহাই পিতৃতন্ত্রের মূল কারণ।

মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাতে এই পিতৃতন্ত্রের যৌনশৃঙ্খলাকে কোন কোন উৎসব উপলক্ষে বা ধর্ম্ম মন্দিরে অর্ঘ্যদান উপলক্ষে শ্লথ করা হয়। আমাদের দেশে বসন্তোৎসব বা

১৮৯ Prehisaric culure of India, Jones com volume 1948 p. 35, K. P. Chattopadhya.

হোলির উৎসব, অদুর অতীতে এই ব্যাপারের পরিচয় দান করে। দেবদাসীপ্রথাটি উহারই নিদর্শন। এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা—উৎসব উপলক্ষে সমাজ অন্ততঃ একদিনের জন্যও সহ্য করে।

প্রাচীন বাংলার দুর্গোৎসবে নবমীর খেউড় ও আসামে বাসর উদ্‌যাপন, তাথেলী উৎসব ও দেবীপূজার উৎসবে অবাধ স্ত্রী স্পর্শ এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই পরিচয়।

ঘরজামাই প্রথা বাঙ্গালী সমাজে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে এই প্রথা প্রবল। ইহা মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই চিহ্ন। কুলকরা প্রথাটি, যাহা উচ্চ কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা, এবং ঐ কন্যাকে স্বগৃহে পোষণটিও মাতৃতান্ত্রিক প্রথার সুদূর সমর্থন।

প্রাচীন সমাজে বারবণিতা ঘৃণিতা ছিল না। ইহার কারণ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামী থাকা বা না থাকা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন ছিল। বৌদ্ধযুগের প্রতিভাবান চিকিৎসক জীবক এইরূপ এক সম্মানিতা বার-বণিতার পুত্র।

ডি এন মজুমদার লিখেছেন, মাতৃগতকুলের নিয়মে মায়ের পারিবারিক পদবী সন্তানদের উপর বর্ত্তায়, কারণ তারা মায়ের সঙ্গে বাস করে এবং মামা তাদের সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক। সেখানে স্বামীরা শুধু অতিথি, তাদের ছেলেদের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না।

বাঙালী সমাজে মাতৃগত কুলের চিহ্ন, সম্বন্ধবাচকশব্দ ও আচার ব্যবহারের মধ্যে জীবিত আছে। অতুল কৃষ্ণ সুর দেখিয়েছেন যে কতকগুলি সম্বন্ধের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা, কথা-কওয়া বা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ আছে। এই নিষেধ বিধির মধ্যে মাতৃতন্ত্রের নিদর্শন আছে।

(১) ভাসুর ও মামাশ্বশুর এবং বধূর মধ্যে অস্পৃশ্য সম্বন্ধ। ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে উপবাসী করে শুদ্ধ হতে হবে।

(২) জামাই বাড়ী যাওয়া নিষিদ্ধ। বাঙালী শ্বাশুড়ী তার জামাই বাড়ী কখনই যেতে পারবে না।

(৩) নাম নেওয়া নিষিদ্ধ। স্বামীর নাম, ভাসুরের নাম, মামা-শ্বশুরের নাম এবং বধূর সকল বয়োজ্যৈষ্ঠ সকল রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যক্তির নাম।

তারপর ঠাট্টা, রহস্য প্রভৃতি করার সম্বন্ধেও যে রকম অবাধ অধিকার আছে, তাতেও অনায়াসে বলা যায় যে বাঙালীদের মধ্যে আদিম দলগতবিবাহ বা এক স্ত্রীর বহুস্বামিত্ব প্রথা লুক্কায়িত আছে। নায়ারদের মাতৃগত কুলের বহুস্বামী গ্রহণ ইহার বর্ত্তমান উদাহরণ।

মাতৃগত কুলের দলীয় বিবাহের ইহা ক্রমবিকাশ। বাঙালী সমাজে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসবে বা বিবাহে মামাকেই প্রধান কর্ত্তা সাজতে হয়। "মাতুল ব্যাভার" একটা বিশেষ প্রথা, যাহার মধ্যে এই মাতৃতন্ত্রের নিদর্শন জীবিত আছে। শালীর বিবাহে পূর্ব্বতন জামাইকে কাপড় উপহার না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না বলে প্রথা আছে। বিবাহের ৮দিন মধ্যে দ্বিরাগমন হলে, বড় জামাইবাবু দরজা পার হবার আগে শালীকে স্পর্শ করার নিয়ম আছে। যদি ৮দিন পার হয়ে যায়, তবে আর উহার দরকার হয় না। ভাসুর সম্বন্ধে বধূর যে স্পর্শ নিষেধ উহার মূলে জুনিয়র লেভিরেট প্রথা ছিল—ডাঃ লোয়ি দেখিয়েছেন। এই প্রথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যৈষ্ঠের বিধবাকে গ্রহণ করে, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠের বিধবাকে গ্রহণ করতে পারে না। উড়িয়াদের মধ্যে এই প্রথা এখনও প্রচলিত। শালীর সঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রথা—"সরোরেট"। মাণিক চন্দ্রের গানে আছে যে বাঙালী বিবাহে শালীকে যৌতুকস্বরূপ দেওয়ার নিয়ম ছিল।

দলগত বিবাহের ইহাও প্রমাণ যে দাদা দিদি, মা ও বাবা দ্বারা এক গোত্রেরই বয়োজ্যেষ্ঠকে বুঝান হয়। এই নিয়মের অনুকরণে শ্বাশুড়ী, মামী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদেরও মা সম্বোধনে বিশেষিত করা হয়। এতে সন্দেহ নাই যে ইহা সমাজের প্রথম অবস্থার দলগত বিবাহের প্রমাণ।

বাঙালী সমাজে মাতৃতন্ত্রের আর একটি যুক্তি এই পূর্ব্বপুরুষ

পূজার যে অনুষ্ঠান "শ্রাদ্ধ" বলে পরিচিত—তাতে মাতৃগতকুলের সম্বন্ধীয়গণই অত্যন্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত। "শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গুরু এবং মাতামহ, মামা, ভাগ্নে, দৌহিত্র, জামাতা, মাসতুত পিসতুত ভাই প্রভৃতি কন্যাগত সম্বন্ধযুক্তদেরই আদর বেশী।" (আচার্য্য ক্ষিতি মোহন সেন)

উক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান পিতৃতন্ত্রের এবং বৈদিক পিতৃতন্ত্রের মূলে মাতৃতন্ত্র ছিল। বাঙ্গালী সমাজের কথা যাহা বলা গেল—ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই অনুরূপ প্রথা বর্ত্তমান। এই মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেন মাতৃদেবতা। ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। গ্রাম্য সমাজে মাতৃদেবতাই প্রধানা ছিলেন। নানাদেবী, কামাক্ষ্যাদেবী প্রভৃতি ভারতের ৫১টা পীঠের যে মাতৃদেবতা, তাঁরা সকলেই সিন্ধুযুগীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নিদর্শন। এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরও করা হবে। বৈদিকযুগেও মন্ত্রদ্রষ্টা নারী-ঋষির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম প্রমাণ। সিন্ধুর সংস্কৃতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। হরাপ্পার শীলমোহরে মাতৃদেবতার নিকট বলির চিত্র দেখা যায়। এ ছাড়া নানীমাই—এই সিন্ধু সমাজেরই সমকালীন গ্রাম্যসংস্কৃতি।

ইরাণী সমাজের আদিম অবস্থায় মাতৃপ্রথাই ছিল। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর "ইরাণী ইতিকথায়" লিখেছেন, "পশ্চিম এসিয়ার একটি অতি প্রাচীন প্রথা ছিল—ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ। পরবর্ত্তীকালে পারসীকেরা স্থানীয় অধিবাসীদের এই প্রথাটি গ্রহণ করেছিল। মাতা ও পুত্রের বিবাহ একটি অতি প্রাচীন প্রথা, যদিও এই প্রথার উল্লেখ খুব বেশী পাওয়া যায় না। মাতৃকবংশক্রমে উত্তরাধিকার নিরূপণ ব্যবস্থা, ইলাম ও মিশরের প্রাচীন সমাজে দেখা যায়, সেই ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবতঃ ইরাণেই।" ১৯০

সুমেরেও মাতৃতান্ত্রিক প্রথা ছিল এবং ব্যাবিলোনীয়ায় ও ইহুদীদের

১৯০ ইরানী উপকথা, পৃঃ ১৭, শচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যেও এই প্রথার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়। এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। সিন্ধুর সংস্কৃতি আলোচনায় যথাস্থানে দেখান হবে যে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায় এবং মিশরে মাতৃতান্ত্রিক প্রথার সন্ধিকালের ইতিহাস যৌনকলঙ্কের কাহিনীতে পূর্ণ। সিন্ধুর সমাজের পরবর্ত্তী সমাজই মধ্য এসিয়া এবং পশ্চিম এসিয়ার জাতিগুলির সমাজ। ইহাদের সমাজের মাতৃতান্ত্রিকতার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গিয়েছে। বৈদিক ভারতেরও আদিম অবস্থায় যে মাতৃতন্ত্র ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজ যে এই আদিম সিন্ধুর মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

# বর্ণাহুক্রমিক স্থচী

## ভ